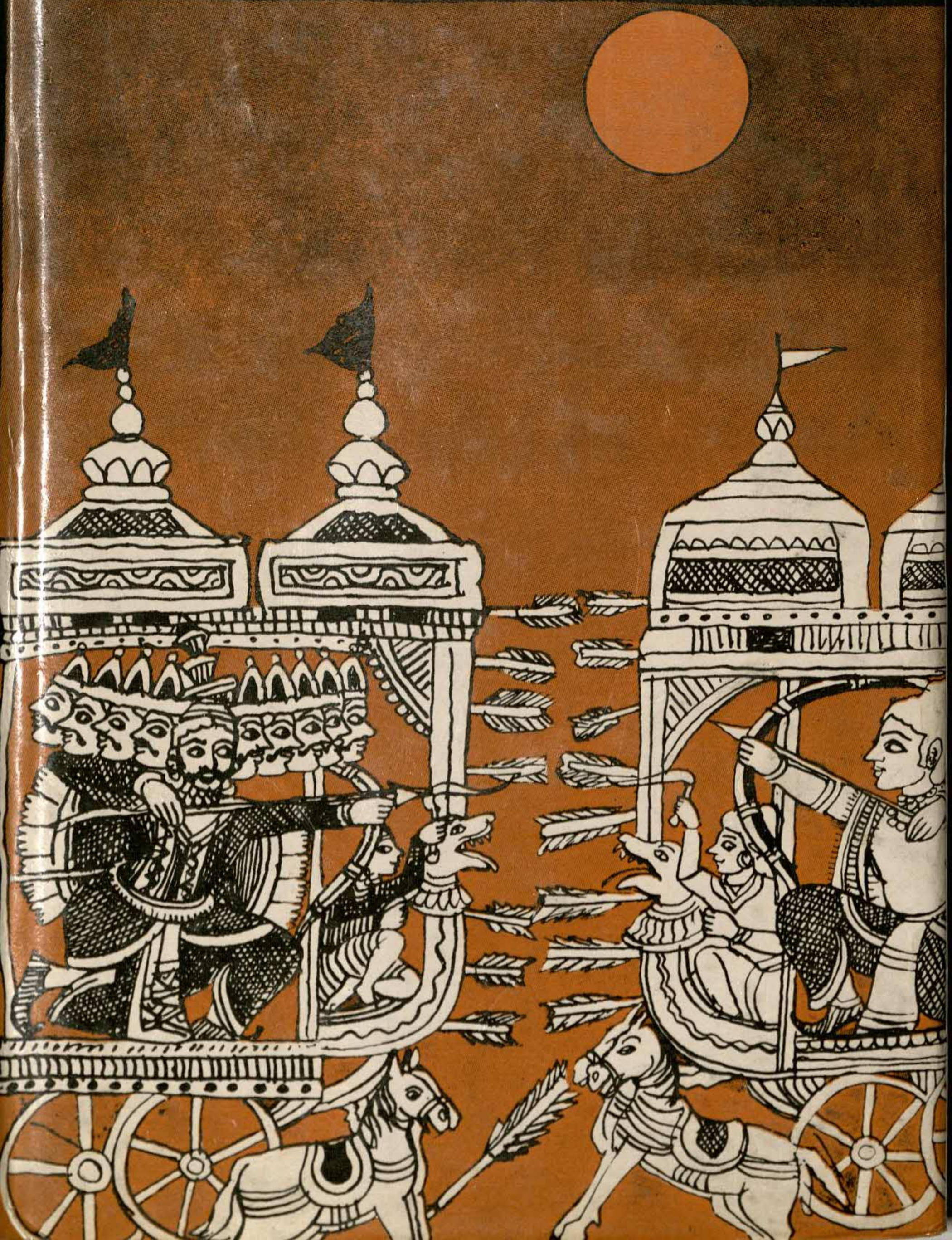
প্রসঙ্গ রামায়ণ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রসঙ্গ রামায়ণ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শশধর
প্রকাশনী

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশিকা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯১

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীঅজিত গুপ্ত

মূল্য—২৫. (পঁচিশ টাকা)

মুদ্রণ : অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন, ভবানীপুর
কলিকাতা-২৫

PRASANGA RAMAYANA

(A Discussion on the Ramayana)

by

HIRANMAY BANDYOPADHYA

SASADHAR PRAKASHANI

10/2B, Ramanath Majumder Street,

Calcutta-700 009

Published by : Rama Banerjee
Sasadhar Prakashani
10/2B, Ramanath Majumder Street,
Calcutta-9

First Edition :
7th. December 1984

Price : 25·00 (Rupees Twentyfive only)

ভূমিকা

মহাকবি বাল্মীকি রচিত কাব্য রামায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যের আদিকাব্যের গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত নয়, তা নানভাবে একটি মহৎকাব্য। তার সাহিত্যিক গুণ, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য, তার মহৎনৈতিক আদর্শ তাকে অনন্যসাধারণ গ্রন্থরূপে চিহ্নিত করেছে। সর্বোপরি তার নায়ক রাম এমন একটি উচ্চ আদর্শ প্রচার করে তাঁর নিজের আচারণে তা প্রতিফলিত করেছেন যার ফলে তিনি একাধারে আদর্শ পুত্র, আদর্শ অগ্রজ, আদর্শ পতি, এবং আদর্শ রাজা হিসাবে সর্বকালীন স্বীকৃতি পেয়েছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে রামায়ণের এই মহত্বই তার নানা বিতর্কজালে জড়িয়ে পড়বার কারণ হয়েছে। পশ্চিমের সমালোচক উন্নাসিক মনোভাব প্রণোদিত হয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, রামায়ণ বুদ্ধের পরে রচিত হয়েছে এবং হোমার রচিত ইলিয়ডের অনুসরণ করেছে। রামের চরিত্রের মহত্ব বুদ্ধ-ভক্তদের তাঁকে বুদ্ধ হতে অভিন্ন বলে দাবী করতে উৎসাহিত করেছে। শুধু তাই নয়, বুদ্ধ যে বংশকে গৌরবমণ্ডিত করেছেন তাকে ইক্ষাকুবংশের সহিত যুক্ত করতে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহকে সিদ্ধ বলে প্রচারিত করেছেন, এমন কি সীতাকে রামের ভগিনী বলে স্থাপন করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। এইভাবে রামায়ণকে ঘিরে নানা জটিল বিতর্ক গড়ে উঠেছে।

এই বিতর্কই আমার মনকে আকর্ষণ করে, আদিকাব্য পুঙ্খানু-পুঙ্খ রূপে পড়ে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করে তাদের মীমাংসা খুঁজতে উৎসাহিত করেছে। সংগৃহীত তথ্যগুলি বিচার করে

যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তাই এই গ্রন্থে স্থাপন করা হয়েছে। আনুসঙ্গিক ভাবে রামায়ণের বিভিন্ন দিকের একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি। ফলে রামায়ণের ঐতিহাসিকতার প্রশ্ন ও আলোচনা স্থাপিত হয়েছে।

বিরাট রামায়ণকাব্য যত পড়েছি ততই আদিকবির প্রতি শ্রদ্ধা বৰ্দ্ধিত হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আদিকবি হয়েও তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা রাখেন। এমন কি মহাকবি কালিদাসের উপর তাঁর প্রভাব কত ব্যাপক ছিল তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। তাই এই বিষয়টিও গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং এটি আমার পক্ষে রামায়ণরূপ অমৃতসাগর পরিক্রমনের ব্যক্তিগত অভিযান। ফলে যে নানা হৃদয়হরণ রত্নের আবিষ্কার করেছি তার আস্বাদ পাঠককে দেবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হল। কতখানি সফল হয়েছি তা বিচারের ভার পাঠকের ওপর।

গ্রন্থখানি প্রকাশনের সমস্যা আমি সহজে সমাধান করতে পারি নি। ফলে তা বেশ কিছুদিন পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পড়ে ছিল। এমন সময় ভাগ্যের নির্দেশে শশধর প্রকাশনীর উপদেষ্টা শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কাছ হতে সেটি নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে তিনি সেটি প্রকাশ করবার বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। ফলে পাণ্ডুলিপির সদ্গতি হল। এই সব কারণে আমি অমিয়বাবুর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর মহৎ সাহিত্য প্রচারে উৎসাহ দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমস্নেহাস্পদ

শ্রীমান প্রবালকান্তি হাজরা

ও

শ্রীমান পার্থসারথি দাশকে

মাষ্টার মহাশয়ের

সাদর উপহার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক কথা

(১)

দুই আদিকাব্য

সূর্যের কথা মনে উদয় হলে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের কথাও মনে হয়। তাই সংস্কৃত ভাষায় তাদের যুক্ত করে বলা হয় 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ'। ঠিক তেমন রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের নামটি নিত্য সংযুক্ত আকারে মনে উদয় হয়।

এমন যে ঘটে থাকে তা অকারণে নয়। তাদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে যা তাদের পরস্পরের কাছে টানে। উভয় গ্রন্থই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আদি কাব্যগ্রন্থ। তার পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য কেবল বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বেদ এবং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে শ্রুতি যা বেদেরই প্রতিশব্দ ছিল, তা একদিকে। আর অন্য দিকে ছিল ছয়টি বেদাঙ্গ। রামায়ণ ও মহাভারত দিয়েই সংস্কৃত সাহিত্যের সূত্রপাত। সংস্কৃত সাহিত্যে তারাই প্রথম কাব্যে রচিত কাহিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দুটি গ্রন্থই প্রাচীন কালের রসসাহিত্যের প্রথম ধারক। এদের আমরা ভারতের দুই আদিকাব্য বলতে পারি।

ভারতীয় সংস্কৃতির একই পরিবেশে রচিত হওয়ায় এবং একই প্রকৃতির হওয়ায়, এই দুই আদিকাব্যের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য মিলে যায়।

উভয়েরই মূল কাহিনী বৈদিক যুগের পরিবেশে স্থাপিত। সে সময় দার্শনিক চিন্তা মূল উপনিষদগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখনও হিন্দু ষড়দর্শনের জন্ম হয় নি। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও আবির্ভাব হয় নি। কারণ, এই দুই ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের জন্ম হয় সে যুগের পরবর্তী কালে।

বৈদিক ধর্মরীতি এবং বৈদিক সমাজ বিন্যাস তখনও প্রচলিত ছিল। স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ এবং যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠানই ধর্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত ছিল। যজ্ঞ করে আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং স্বর্গপ্রাপ্তি ছিল সেকালে অপবর্গ বা পুরুষার্থ। ভক্তিবাদের তখনও জন্ম হয় নি। কাজেই পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের যে সাড়ম্বর প্রতিমা পূজারীতি বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে, তার আবির্ভাব হয় নি। তখনকার সমাজ বিন্যাস বর্ণ ও তাদের আশ্রমধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রম স্বীকৃত হত। জীবিকার প্রকৃতি অনুসারে চারটি বর্ণে মানুষকে ভাগ করা হত ঃ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের প্রত্যেকের জীবিকা কি হবে, তা নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ পালন করাই ছিল প্রতি বর্ণের স্বধর্ম।

অপরদিকে ব্যক্তিমানুষের জীবনকে চারটি অংশে ভাগ করা হত ঃ ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও যতি। এগুলি মানবজীবনের স্বাভাবিক ভাগকে ভিত্তি করে পরিকল্পিত হয়েছিল। সেই ভাগগুলি হল বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং জরা। জীবনের যেমন বিকাশ আছে, তেমন ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া আছে। এই স্বাভাবিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চারটি আশ্রম পরিকল্পিত হয়েছিল। বাল্যে জীবনের প্রস্তুতির জন্য ব্রহ্মচর্য আশ্রম। তখন গুরুর গৃহে তাঁর সঙ্গে বাস করে বিদ্যাচর্চাই ধর্ম। বিদ্যাচর্চা সমাপ্ত হলে, সংসারে প্রত্যাবর্তন করে গৃহী হতে হত। তাই এই আশ্রমের নাম

গার্হস্থ্য আশ্রম। তারপর সন্তানেরা বড় হয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হলে, সংসার ত্যাগ করে কোনও আশ্রমে গিয়ে বাস করবার নির্দেশ ছিল এবং সেই কারণে এই আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ আশ্রম।

শেষের আশ্রমের জীবনযাপন রীতি আরও কঠোর ছিল। তখন একাকী পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বন করে ভিক্ষাজীবী হয়ে আমরণ জীবন যাপন করতে হত। এই আশ্রমের নাম যতি আশ্রম। মরণের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে কৃচ্ছ্রসাধনের পরাকাষ্ঠা দেখাবার নির্দেশ ছিল বলেই তার এই নাম। তার আর এক নাম প্রব্রজন; কারণ, কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করা নিষিদ্ধ ছিল। এই আশ্রমে মানুষের অনাগারিক অবস্থায় বা অনিকেত অবস্থায় জীবন যাপন করতে হত। উভয়েরই এক অর্থ। এই আশ্রমে মানুষের নির্দিষ্ট আগার বা নিকেতন থাকবে না। সুতরাং শেষ আশ্রমে সকল মানুষ ভিক্ষু বা শ্রমণের জীবন যাপন করত। তাই সে যুগে শ্রমণ থাকত।

রামায়ণ বা মহাভারতের মূল কাহিনী এই পরিবেশে স্থাপিত। বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম প্রতি মানুষের বর্ণের ভিত্তিতে কর্তব্য বা ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিত। তবে কাহিনী দুটিতে পরবর্তী কালের পরিবেশের উল্লেখ যে পাওয়া যায় না, তা নয়। উভয় গ্রন্থেই পৌরাণিক যুগের দেবদেবীর সহিত সংযুক্ত নানা কাহিনী স্থান পেয়েছে। উভয় গ্রন্থেই মূল চরিত্রকে বৈদিক যুগের বিষ্ণু নয়, পৌরাণিক যুগের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, বৈকুণ্ঠনিবাসী বিষ্ণুকে অবতার রূপে স্থাপন করা হয়েছে। এই অসঙ্গতির নিশ্চয় একটা ব্যাখ্যা মিলবে। যথাস্থানে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচিত হবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে মূল কাহিনীটি বৈদিক যুগের পরিবেশে স্থাপিত এবং যাঁদের উপর অবতারত্ব আরোপ করা হয়েছে, সেখানে তাঁরা ঐতিহাসিক মানুষের ভূমিকাই পালন করেছেন।

(২)

রামায়ণ সম্পর্কিত নানা বিতর্ক

স্থতরাং তাদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী। উভয় কাহিনী একই পরিবেশে স্থাপিত ; উভয় কাহিনীর প্রধান চরিত্রে এমন নানা মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছে যে উভয়েই তার ফলে অবতার পদে উন্নীত হয়েছেন ; উভয় কাহিনী একই কাব্য রীতিতে রচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের এই আত্যন্তিক সাদৃশ্যই রামায়ণ সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে এই দুই আদিকাব্যের মধ্যে কোনটি প্রথম রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর গ্রন্থ। অবশ্য ঐতিহ্য অনুসারে রামায়ণের কাহিনী ত্রেতাযুগে সংঘটিত এবং মহাভারতের কাহিনী তার পরবর্তী দ্বাপর যুগে সংঘটিত। তবু পণ্ডিতদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্ক আছে।

শুধু তাই নয়, রামায়ণকে ঘিরে নানা সূত্রে আরও কতকগুলি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এখনই উল্লিখিত হয়েছে যে রামায়ণের মধ্যে দুটি বিভিন্ন কালের পরিবেশের একত্র অবস্থিতি লক্ষিত হয়। তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে রামায়ণের মূল রূপ পরে পরিবর্তিত হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন এসে পড়ে। সেই প্রসঙ্গে রামায়ণে পরবর্তীকালে নূতন অংশের সংযোজন ঘটেছিল কিনা এবং তা ঘটে থাকলে কোন অংশ সংযোজিত হয়েছিল, সেই প্রশ্ন এসে পড়ে।

অনুরূপ ভাবে রামের চরিত্রের মহত্ব বৌদ্ধ সাহিত্যের যাঁরা লেখক তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং গৌতম বুদ্ধের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা এমন কি একত্ব স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ফলে বৌদ্ধ জাতকগুলিতে রামায়ণের মূল কাহিনীর কিছু পরিবর্তন

সংঘটিত হয়। সেই প্রসঙ্গে রামায়ণ সম্বন্ধে দুটি অতিরিক্ত বিতর্কের বিষয় উদ্ভূত হয়েছে। প্রথমটি হল বৌদ্ধ জাতকে রামায়ণের কাহিনীর যে রূপান্তর ঘটেছে তার তাৎপর্য কি হবে সেই প্রশ্ন। প্রধানত এই রূপান্তরকে ভিত্তি করেই আর একটি প্রশ্ন গড়ে উঠেছে যা রামায়ণের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। এই ভাবে রামায়ণকে ঘিরে আরও কিছু বিতর্ক গড়ে উঠেছে। সেগুলিও আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়ে। এই বিতর্কের বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনায় একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে।

(৩)
রামায়ণে সংযোজন হয়েছে কিনা

এখনই উল্লেখ করা হয়েছে যে উভয় গ্রন্থেরই আলোচিত বিষয় সম্পর্কে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। উভয় গ্রন্থের মূলকাহিনী বৈদিক যুগের পরিবেশে রচিত এবং উভয় গ্রন্থের নায়ক ঐতিহাসিক মানুষ রূপে চিত্রিত। অথচ দেখি উভয় গ্রন্থে বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে পৌরাণিক যুগে যে সব দেবতার আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের নানা সূত্রে বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। বৈদিক যুগের মন্ত্রের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মায় রূপান্তরিত হয়েছেন। বৈদিক যুগের ত্রিবিক্রম বিষ্ণু, যিনি তিন পদক্ষেপে সমগ্র আকাশ পরিক্রমণ করেন, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হয়েছেন। বৈদিক যুগের রুদ্রের অনুসরণে শিবের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। ব্রহ্মার ভূমিকা সৃষ্টির, বিষ্ণুর ভূমিকা স্থিতি বা পোষণের এবং শিবের ভূমিকা সংহারের। এঁদের একত্র করলে ত্রিমূর্তিকে পাই। পৃথক ভাবে ধরলে তিনটি পৃথক দেবতা পাই। তাঁদের উপর মনুষ্যধর্ম আরোপ করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে। তাঁদের জন্য পৃথক আবাসস্থান পরিকল্পিত

হয়েছে। তাঁরা কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আবির্ভূত হয়ে কাহিনী কোন দিকে যাবে তা ঠিক করে দিয়েছেন। এই ভাবে বৈদিক যুগের পরিবেশের মধ্যে পৌরাণিক যুগের উপাদান অনু-প্রবেশ হয়েছে।

এই অসঙ্গতির যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা এই হওয়া উচিত যে উভয় গ্রন্থের আদিরূপ পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রথম রূপ যা ছিল তার সহিত নূতন বিষয় সংযুক্ত হয়ে, গ্রন্থের আকার শুধু পরিবর্দ্ধিত হয় নি, তার রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। মহাভারতের ক্ষেত্রে এই সংযোজন অতিবেশী মাত্রায় ঘটেছে। তার প্রমাণ মহাভারতের মধ্যেই তার অনুক্রমণিকা পর্বে মিলবে। সেখানে উল্লেখ আছে যে উপাখ্যান সহ মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল এক লক্ষ শ্লোক (১); আর উপাখ্যান বাদ দিয়ে তার শ্লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ২৪,০০০ (২)। এই মূল অংশটি 'ভারত' নামে পরিচিত ছিল। (৩) এইভাবে বহুকাল ধরে সংযোজনের ফলে তা ভারি হয়ে গেল বলে এবং তাতে নানা মহৎ বিষয় আলোচিত হয়েছে বলে তার নাম হল 'মহাভারত'। (৪) তার বিরাট আকারই ইঙ্গিত করে যে তা সংযোজন দ্বারা অত্যন্ত বেশী পরিমাণে পুষ্টিলাভ করেছে। সুতরাং মহাভারত সংযোজনের ফলে বর্তমান বিরাট আকার ধারণ করেছে। সেই কারণে গবেষকদের ধারণা মহাভারতে বহু লেখকের রচনার একত্র সমাবেশ ঘটেছে এবং সেই কারণে তার বাঁধন বেশ আলগা।

তুলনায় রামায়ণ আকারে অনেক ছোট। পরিণত আকারেই

১। মহাভারত। ১। ১। ১০১—১০২

২। মহাভারত। ১। ১। ১০২

৩। উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ। ১। ১। ১০৩

৪। মহত্বাচ্চ ভারতত্বাচ্চ মহাভারত উচ্যতে। ১। ১। ২৭৪

তার শ্লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২৪,০০০। বোম্বাই এর সংকলনে এই কথার উল্লেখ আছে। (৫) তার মধ্যেও নানা উপাখ্যান আশ্রয় পেয়েছে এবং পৌরাণিক যুগের দেবতাদের ভূমিকার উল্লেখ আছে। তবে এই ধরনের সংযোজন রামায়ণের ভাগ্যে কম ঘটেছে। মহাভারতের ক্ষেত্রে অতি বেশী মাত্রায় ঘটেছে। এমন কি মূল কাহিনীর সঙ্গে পরোক্ষভাবেও সংযোগ করা যায় না এমন অনেক বিষয় একটি সমগ্র পর্বকেও দখল করে বসেছে। যেমন শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্ব। এই ছুটি পর্বের আলোচ্য বিষয় হল নানা তথ্য, নীতি কথা, উপদেশ ইত্যাদি।

সেই কারণে রামায়ণ গ্রন্থটি আরও সুসংবদ্ধ আকার নিয়েছে। তার রচনারীতিরও একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। তার ভাষা সুন্দর ; তার মধ্যে নৈসর্গিক শোভার বহু চিত্তহারী বর্ণনা পাওয়া যায় এবং বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলির সংলাপের ভিতর দিয়ে চিত্রণে প্রচুর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই কারণেই তা মূলত একই কবির রচনা বলে গ্রহণ করা যায়। সেই কারণেই তা আদি কবি বাল্মীকির একক চেষ্টায় রচিত আদিকাব্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তা সত্বেও দেখা যায় রামায়ণ গ্রন্থে যে সংযোজন ঘটেছে, তার পরিমাণ কম নয়। অনেক অবাস্তব এবং অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী তার বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডের অনেকখানি জায়গা দখল করে বসেছে। সেই কারণে কারও কারও ধারণা এই ছুটি কাণ্ডই পরে সংযুক্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামায়ণের বর্তমান বিন্যাস প্রাচীনকালের বিন্যাস হতে পৃথক হয়ে গেছে। তার প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়। ভবভূতি রচিত 'উত্তররাম চরিত' নাটকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

৫। চতুর্বিংশতি সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।

প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্ মহাত্মনঃ।

তারপর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে: "বালকাণ্ডস্যান্তিকেঽধ্যায়ে অয়ং শ্লোকঃ।" অর্থাৎ রামায়ণের বালকাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে এই শ্লোক আছে। সুতরাং বোঝা যায় ভবভূতির সময় রামায়ণ কাণ্ড এবং কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। বর্তমান অবস্থায় তা কাণ্ড এবং কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়ের পরিবর্তে সর্গে বিভক্ত। সুতরাং পুনর্বিন্যাস যে ঘটেছিল তা বেশ বোঝা যায়।

(৪)

জাতকে রামায়ণের কাহিনীর রূপান্তর

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ছুটি আদিকাব্যে যতগুলি মহৎ চরিত্রের মানুষের পরিচয় আমরা পাই, তাঁদের মধ্যে রাম আমাদের সব থেকে বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। মহাভারতের মধ্যে যাঁরা আমাদের বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, তাঁদের মধ্যে পড়েন পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারী, দুর্যোধনসখা কর্ণ, পার্থসারথি কৃষ্ণ, স্বয়ং যুধিষ্ঠির এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। রামায়ণে যাঁরা মহান বলে চিহ্নিত হতে পারেন, তাঁদের মধ্যে আছেন রাম, ভরত, লক্ষ্মণ এবং সীতা। এতগুলি চরিত্রের মধ্যে রামের মধ্যে যতগুলি মহৎ গুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছে অতগুলি আর কোনও চরিত্র মিলবে না। এ বিষয়ে রাম অনন্যসাধারণ।

রামের পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় চোদ্দ বছর বনবাস গমনের সঙ্গে শান্তনুপুত্র দেবব্রতের আজীবন কৌমার্য গ্রহণ এবং সিংহাসনের দাবী ত্যাগের বেশ তুলনা চলে। সে বিষয় হয়-ত ভীষ্মের আত্মত্যাগ আরও চূড়ান্ত; কিন্তু রাম শুধু আত্মত্যাগী নন। কর্ণের বীর্য আছে বন্ধু বাৎসল্য আছে; অর্জুনের বীর্য আছে জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য আছে। রামও অনুরূপগুণে ভূষিত; তার

অতিরিক্ত আরও গুণ আছে। যুধিষ্ঠিরের ধর্মের প্রতি আনুগত্য আছে; কিন্তু ব্যক্তিত্বের অভাবে তিনি যেন রামের পাশে নিষ্প্রভ হয়ে যান। একমাত্র যাঁর সঙ্গে রামের প্রতিযোগিতা আসতে পারে তিনি হলেন কৃষ্ণ। সেখানেও রাম যেন জিতে যান মনে হয়। কৃষ্ণের প্রজ্ঞা, কৃষ্ণের কূটবুদ্ধি, কৃষ্ণের বন্ধুবাৎসল্য—এ সবই মহৎ গুণ। ওদিকে রামের পত্নীপ্রেম, প্রজার প্রতি বাৎসল্য এবং কর্তব্যপালনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাঁকে যেন আরও মহিমা-মণ্ডিত করে। কৃষ্ণের মুখে ভগবদ্গীতা স্থাপিত না হলে, তিনি প্রতিযোগিতায় রামের কাছাকাছি আসতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

সে যাই হোক রামের চরিত্রগুণ সেকালের মানুষের বিশেষ ভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে তাঁর সুখে-দুঃখে উদ্বেগহীন মনোভাব সম্ভবত স্বয়ং গৌতমবুদ্ধর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই দেখি রামের এই সুপ্রাচীন খ্যাতি বুদ্ধের ভক্তদেরও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে নানা সময়ে রচিত নানা জাতকের কাহিনীতে রামের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। জাতকের এই কাহিনীগুলি রামের সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। কোনওটি পিতার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর রামের ধীর আচরণ, অবিচলতা ও অনুদ্বেগের বিষয় উল্লেখ করেছে। কোনওটিতে যে বংশকে রাম নিজ কীর্তি দিয়ে মহিমামণ্ডিত করেছেন সেই ইক্ষাকু বংশের সহিত বুদ্ধ যে বংশে জন্মেছিলেন সেই শাক্য বংশকে সংযুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। কোথাও রামের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা হেতু রামও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের গৌতমবুদ্ধ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে বুদ্ধ, তাঁর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ শিষ্যবর্গ পূর্ববর্তী এক জন্মে রাম, তাঁর আত্মীয় এবং বন্ধুরূপে যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শেষের দাবীটি স্থাপিত হয়েছে দশরথ জাতকে। এই কাহিনীতে

গৌতম বুদ্ধের মুখেই বলা হয়েছে যে সেই পূর্ববর্তী জন্মে শুদ্ধোধন দশরথ রূপে জন্মগ্রহণ করেন, মাতা মায়া দেবী কৌশল্যা নামে পরিচিত ছিলেন, গৌতমের পত্নী গোপা সীতা রূপে রামের সহধর্মিণী হয়েছিলেন, ভরত ছিলেন বুদ্ধর প্রিয় শিষ্য আনন্দের পূর্বরূপ, লক্ষ্মণ ছিলেন আর একজন প্রিয় শিষ্য সারিপুত্রের পূর্বরূপ, বুদ্ধের ভক্তগণ ছিলেন রামের সভাসদ এবং রামরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং বুদ্ধ।

আরও কতকগুলি বৌদ্ধ জাতক আছে যাতে অনুরূপভাবে রামায়ণের কাহিনীর কিছু কিছু উল্লেখ আছে। সেই কাহিনী-গুলিতে মূল রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীর কিছু মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে। যেমন একাধিক জাতকে সীতাকে রামের ভগিনীরূপে স্থাপন করা হয়েছে। তার তাৎপর্য দাঁড়ায় রাম ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন। আবার কোনও কোনও জাতকে রাবণ যে সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় বন্দিনী অবস্থায় রেখেছিলেন এবং তারপর রাম সুগ্রীবের বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন তার আদৌ উল্লেখ নাই। অর্থাৎ রামায়ণের কাহিনীর একটি বড় অংশ জাতকে বাদ পড়ে গেছে।

এই অনুল্লেখকে ভিত্তি করে একাধিক পাশ্চাত্য ভারত-তত্ত্ববিৎ মূল রামায়ণের মৌলিকতা এবং ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন জার্মাণ পণ্ডিত ওয়েবার। যেহেতু একটি বিশেষ জাতকে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কাহিনী উল্লেখ নাই, তিনি এই অংশকে কল্পিত কাহিনী বলেছেন। অর্থাৎ তার কোনও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নাই। দ্বিতীয়ত বলেছেন যে সীতা হরণের কাহিনী গ্রীক কবি হোমার রচিত 'ইলিয়াড'-এর অনুকরণে লিখিত। তাঁর ধারণায় ভারতীয় কবির কল্পনাশক্তি এমন উর্বর নয় যে এই ধরণের কাহিনী স্বাধীন ভাবে রচনা করবার ক্ষমতা রাখবেন। সুতরাং তা গ্রীক সাহিত্য হতে ধার করা।

এই পরিস্থিতিতে রামায়ণ সম্পর্কে দুটি পরস্পর সংযুক্ত প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথম প্রশ্ন হল সীতা কি রামের ভগিনী ছিলেন? তার সঙ্গে সংযুক্ত প্রশ্ন হল সীতা হরণের কাহিনী কি হোমারের কাহিনী অবলম্বনে রচিত না তা একটি মৌলিক কাহিনী? এই দুটি প্রশ্নের আমাদের মীমাংসা খুঁজতে হবে।

(৫)

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা

রামায়ণ ও মহাভারতের পরিবেশ এক হলেও এবং তাদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও তাদের ভাগ্যে ভিন্ন ফল ঘটেছে। অনেকটা এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলার মত। উভয়েই নিজেকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে দাবী করে। ঐতিহাসিকগণ মহাভারতের কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন; রামায়ণকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। তার প্রধান কারণ কয়েকজন পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিৎ এ বিষয় প্রতিকূল মন্তব্য রেখে গেছেন।

জাকবি বলেন রামায়ণের কাহিনী একটি বৈদিক কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত; তার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। ম্যাকডোনেল বলেন রামের বনবাসের কাহিনীটি ঐতিহাসিক ঘটনা; কিন্তু রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ এবং রাম কর্তৃক তার উদ্ধার ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; তা একটি বৈদিক রূপকথার কাব্যরূপ। সব থেকে প্রতিকূল মন্তব্য করে গেছেন জার্মাণ ভারততত্ত্ববিৎ ওয়েবার (৬)। তিনি বলেছেন রামায়ণের কাহিনীর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে তিনি মোটামুটি দুটি যুক্তি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত তার প্রেরণা ছিল ততটা তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা নয়, যতটা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত উন্নাসিক মনোভাব।

৬। Weber।

ওয়েবার তাঁর প্রতিপাদ্যটি স্থাপন করেছেন জাতকগাথার অন্তর্ভুক্ত দশরথ জাতকে বর্ণিত রামের যে কাহিনী পাওয়া যায় তাকে ভিত্তি করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই জাতকে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাতে সীতা হরণ এবং রাবণের সহিত যুদ্ধের আদৌ উল্লেখ নাই। আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তাতে বলা হয়েছে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রাজা দশরথের সন্তান। তাঁদের মাতার মৃত্যুর পর দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করেন। ভরত এই দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র। কৈকেয়ীর প্রথমা পত্নীর সন্তানদের উপর বিমাতৃসুলভ বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করে, দশরথ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বনে গিয়ে বাস করতে বলেন। পিতার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ ও সীতাকে রাম প্রথমে রাজধানীতে ফিরিয়ে পাঠালেন; কিন্তু নিজে আরও তিন বছর পর ফিরলেন এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

ওয়েবারের ধারণা মূল রামায়ণ রচিত হয় বুদ্ধের জন্মের পর। সুতরাং বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী হতেই তার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। অথচ দেখা যায় দশরথ জাতকে সীতাহরণের কাহিনীর আদৌ উল্লেখ নাই। সুতরাং মূল রামায়ণে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা কল্পিত কাহিনী। কাজেই তা ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারে না। এই ধরনের কাহিনী স্বাধীনভাবে কল্পনা করবার ক্ষমতা প্রাচীন ভারতীয় কবির ছিল না। সুতরাং তা হোমারের কাহিনীর অনুসরণে রচিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষে আলেকজাণ্ডার ভারতে অভিযান করে পাঞ্জাব অঞ্চল জয় করেন। তার ফলে গ্রীক সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটায় অনুকরণের সুযোগ মিলে যায়। সুতরাং রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। একই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত

করেন যে রামায়ণের কাহিনী ভারতে গ্রীকদের আগমনের পরে রচিত হয়।

এই সব প্রতিকূল মন্তব্যের ভিত্তিতেই রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীকে ইতিহাস বলে স্বীকার করা হয় না। এই ভাবে মহাভারতের ক্ষেত্রে যে সৌভাগ্য ঘটেছিল তা হতে রামায়ণ বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং রামায়ণকে ঘিরে একটি বিশেষ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে রামায়ণের কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। রাম আদর্শ রাজা ছিলেন বলে অতিপ্রাচীন কাল হতে ভারতে একটি প্রবল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কোনও রাজ্যে শাসনরীতি উৎকৃষ্ট মানে উন্নীত হলে তাকে রামরাজ্যের সহিত তুলনা করা হয়। এই প্রবল এবং প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত ধারনার কি কোনও ভিত্তি নাই? এই প্রশ্নের একটি সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া দরকার। সুতরাং রামায়ণের ঐতিহাসিকতাও একটি মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়ে।

(৬)

রামায়ণের সাহিত্যিক গুণ

রামায়ণ আদিকবি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের আদিকাব্য হলেও তা সাহিত্যিক গুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রায় সমকালীন এবং সমপ্রকৃতির রচনা হলেও মহাভারত এ বিষয় অনেক নিকৃষ্ট। অবশ্য উভয় গ্রন্থই পরবর্তীকালে সাহিত্যিকদের উপজীব্য হয়েছে। মূল কাহিনী এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত বহু উপাখ্যান পরবর্তীকালে কাব্য বা নাট্য রচনায় লেখকদের প্রেরণা দিয়েছে। এ বিষয় মহাভারতের গুরুত্ব বেশী; কারণ, রামায়ণের তুলনায় মহাভারতে অনেক বেশী সংখ্যক উপাখ্যান সংযুক্ত হয়েছে। ফলে সাহিত্য সাধকদের ব্যবহারের যোগ্য বেশী কাহিনী তার ভাণ্ডারে মিলে যায়।

তবু আর একদিক থেকে রামায়ণের ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ।

এই কাব্যেই প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহারযোগ্য ছন্দের প্রবর্তন হয়। তার পূর্বে বৈদিক সাহিত্যে সূক্তগুলি রচনার জন্য অনেক ছন্দ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাদের মধ্যে দুয়েকটিকে কিছু পরিবর্তিত আকারে বাল্মীকি রচিত আদিকাব্যে প্রথম ব্যবহার করা হয়। সবগুলিই অক্ষরমাত্রিক ছন্দ। তাদের মধ্যে শ্লোক নামে ছন্দটি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই শ্লোকছন্দের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করেই ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটিকে হত্যা করার কাহিনী গড়ে উঠেছে। সেই কাহিনীটির সহিত সকলে অল্প বিস্তর পরিচিত। কাহিনীটি হল এই: বাল্মীকি ঋষি একদিন তাঁর আশ্রমের সংলগ্ন তমসা নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন এক ব্যাধ শরনিক্ষেপ করে ক্রীড়ারত অবস্থায় ক্রৌঞ্চ দম্পতীর একটিকে হত্যা করল। জীবিত ক্রৌঞ্চটিকে মৃত সঙ্গীর জন্য বিলাপ করতে দেখে তাঁর মন এমন গভীর করুণায় অভিভূত হল যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একটি দুই পদে গঠিত শ্লোক তাঁর মুখ হতে নির্গত হল। তাই হল নাকি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম রচিত শ্লোক। কাহিনীটি যেমন মনকে স্পর্শ করে, তেমন তা একটি গভীর তাৎপর্য বহন করে। কবিতার প্রেরণা যে হৃদয়ের অনুভূতি তা স্পষ্টভাবে তা ইঙ্গিত করে। বাল্মীকির শোক তাই শ্লোকের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল। (৭)

৭। কাহিনী রামায়ণের বালকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হয়েছে। যে শ্লোকটি বাল্মীকির মুখ হতে নির্গত হয়েছিল, তা এই:

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ ১।২।১৮

এতে আট অক্ষরের চার পাদ ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে ভাবে তাকে দেখি তা ষোল অক্ষরের দুটি পাদে বিন্যস্ত। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান অংশ এই দুই পাদের শ্লোকে রচিত। বাল্মীকিই এই ছন্দের নাম দিয়েছিলেন শ্লোক।

এই শ্লোক ছন্দ প্রকৃতপক্ষে বেদে ব্যবহৃত অনুষ্টুপ ছন্দের অনুসরণে রচিত। বৈদিক অনুষ্টুপ ছন্দে চারটি পাদ আছে এবং প্রতিপাদে আটটি অক্ষর আছে। তাকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে শ্লোক ছন্দ গড়ে উঠেছে। রামায়ণে আরও দুটি দীর্ঘতর ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছিল। সেবিষয় যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

দ্বিতীয়ত, রামায়ণের কাব্যগুণের এত উৎকর্ষ যে পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশে তা বিশেষ সহায়তা করেছিল। রামায়ণের বিভিন্ন অংশে নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা, বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা, দুঃখ-শোকে আহত মানুষের মন কেমন ভাবে আন্দোলিত হয় তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। উপমা অর্থালঙ্কারের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। রামায়ণে উপমার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তাই রামায়ণের সাহিত্যিক গুণ পরবর্তীকালের কবিদের বিশেষ প্রভাবান্বিত করেছিল। কালিদাস যে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তা মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনায় রামায়ণের সাহিত্যিক গুণ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাগ্যে আদিকাব্যই একটি মহৎ কাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই কারণেই পরবর্তীকালের কবিদের উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় রামায়ণের সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আদিকবি বাল্মীকি শুধু উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন না, চরিত্র অঙ্কনেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন চরিত্রগুলির পরস্পর সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি সেগুলিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দশরথ ও কৈকেয়ী, রাম ও সীতা,

লক্ষ্মণ ও ভরত, বিভীষণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পর সংলাপের মধ্য দিয়ে এমন জীবন্ত রূপে ফুটে উঠেছেন যে তাঁদের রূপ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মনে হয়।

শুধু তাই নয়, তাঁর বর্ণিত কাহিনী নাট্যগুণেও বিশেষ সমৃদ্ধ। মুখের কথায় অন্তরের চিত্রটি যেমন ফুটে ওঠে, শুধু আচরণ দিয়ে তেমন ফুটে ওঠে না। সেই কারণেই বোধ হয় এই সংলাপ রীতির ব্যবহার। এই কথোপকথনের মধ্য দিয়েই মূল চরিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছে। কৈকেয়ীর সহিত দশরথের দীর্ঘ আলাপ একদিকে যেমন দশরথের হতাশা ফুটিয়ে তুলেছে, অপরদিকে তেমন কৈকেয়ীর নির্লজ্জ স্বার্থপরতাকে উদ্ঘাটিত করেছে। বৃদ্ধ রাজা যে তরুণী ভার্যাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসতেন, তাঁর আচরণ তাঁকে রাজার নয়নে একান্ত ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। কৈকেয়ীর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে তিনি হতাশ হয়েছেন। অনুরূপ ভাবে কৈকেয়ীর সহিত রামের আলাপ রামের মহত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। বিমাতার স্বার্থপরতা প্রভাবিত নির্লজ্জ যুক্তিহীন প্রস্তাবকে তিনি বিনা দ্বিধায় উদার ভাবে মেনে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে রামের সহিত ভরতের আলাপ পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমের প্রতিযোগিতায় পরস্পরের সমান করে গড়ে তুলেছে। এই প্রতিযোগিতায় এক অপরকে হারাতে পারেন নি। সীতার সঙ্গে রাবণের বাদানুবাদে রাবণের নীচতা এবং সীতার রামের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা হেতু রাবণের প্রতি সুগভীর ঘৃণা দৃপ্ত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। এই সংলাপগুলি এমন দক্ষতার সহিত রচিত যে শুধু তাদের অবলম্বন করেই সুন্দর অভিনয় করা চলে।

অতিরিক্তভাবে রামায়ণের চরিত্রগুলিতে এমন বহু মহৎ গুণের সমাবেশ হয়েছে যে তাদের প্রতি পাঠক বা শ্রোতার সুগভীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়। রামের সত্যনিষ্ঠা, গভীর পত্নীপ্রেম, আন্তরিক

ভ্রাতৃস্নেহ, অপ্রতিরোধনীয় বীর্য এবং প্রজাপালনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাঁকে এমন এক অনন্যসাধারণ মানুষ রূপে চিহ্নিত করেছে যে পরবর্তীকালে জনগণের তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা সুগভীর ভক্তিতে পরিণত হয়ে তাঁকে ঈশ্বরের অবতার পদে স্থাপন করেছে। অনুরূপ ভাবে লক্ষ্মণ ও ভরতের অগ্রজের প্রতি সর্বাত্মক আনুগত্য আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও বলা হয়ে থাকে লক্ষ্মণের মত ভাই পাওয়া যায় না, ভরতও এ বিষয়ে কম যান না। তাঁর মত নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী ভাই পাওয়াও ঐকান্তিক সৌভাগ্যের বিষয়। অগ্রজের প্রতি আনুগত্যের প্রতিযোগিতায় ভরত ও লক্ষ্মণের মধ্যে কে বিজয়ী হবেন তা ঠিক করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে সীতার মত মহীয়সী নারীর দৃষ্টান্তও একান্তই দুর্লভ। তাঁর চরিত্রের মধ্যে দুটি বিপরীত গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। একদিকে তিনি পতির প্রতি এমন সুগভীর প্রেম বহন করেন যে তাঁকে ছায়ার মত অনুগমন করেছেন; অপরদিকে স্বামী অসঙ্গত যুক্তিবিরোধী আচরণ করলে তিনি তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করতেন না। আত্মসম্মান সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। তাঁর সহিত তুলনাযোগ্য নারী চরিত্র বিশ্বের সাহিত্যে পাওয়া যাবে না।

পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে হনুমানের চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। তাঁর আচরণ তাঁকে আদর্শ সেবকের স্থানে স্থাপিত করেছে। তাই ভারতের জনসাধারণ তাঁর মূর্তি মন্দিরে স্থাপন করে তাঁকে দেবতার সম্মান দেখিয়ে থাকে। বিভীষণও একটি অসাধারণ চরিত্র। অবশ্য আত্মপক্ষ ত্যাগ করে তিনি শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিয়েছিলেন বলে স্থায়ীভাবে কলঙ্কলিপ্ত হয়েছেন। তবে তাঁর আচরণকে সমর্থন করবার মত অনেক যুক্তিও তাঁর মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। সেদিক হতে এই চরিত্রটিও বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং এই চরিত্রগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না থাকলে

রামায়ণের পরিচয় পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই চরিত্রগুলি কাব্য হিসাবে রামায়ণকে শুধু সমৃদ্ধ করেনি, তার নৈতিক প্রভাব রীতিমত পরিবর্দ্ধিত করেছে। তাই রামায়ণ পাঠে শুধু সাহিত্যিক রস আস্বাদন করে আনন্দ পাওয়া যায় না, অতিরিক্ত ভাবে তা মানুষের নীতিবোধকে সঞ্জীবিত করে। সুতরাং এই চরিত্রগুলির আলোচনাও বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকার রাখে।

(৭)

রামায়ণের প্রভাব

এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারতের সহিত সূর্য ও চন্দ্রের তুলনা দিয়ে। সেই প্রসঙ্গে বলা যায় সূর্য এবং চন্দ্র যেমন মানবজাতির নানা কল্যাণসাধনে নানা ভাবে নিযুক্ত, তেমন এই দুই আদিকাব্য অতিপ্রাচীন কাল হতে ভারতবাসীর নানা কল্যাণ সাধন করে এসেছে। সূর্য ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রিত সকল শ্রেণীর প্রাণীদের পুষ্টি দিয়ে প্রাণপ্রবাহকে প্রবাহিত রেখেছে। বৈদিক ঋষি যে সূর্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন 'সূর্য আত্মা জগতঃ' তা খুবই সত্য। অনুরূপভাবে চন্দ্রের চার সপ্তাহে আকাশ পরিক্রমণ এবং দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি সেকালের মানুষকে সময় সম্বন্ধে ধারণা করতে শিখিয়েছে। সম্ভবত সৌর বৎসর হতে চান্দ্রমাস আগে উদ্ভাবিত হয়েছে। তার জোয়ার ভাটা এখনও নদীবক্ষে জলযানের নাব্যতার সহায়তা করে। তেমন এই দুটি আদিকাব্য ভারতবাসীকে উৎকৃষ্ট কাব্যের আস্বাদ দিয়ে তার মনোরঞ্জন করে এসেছে। আনুষঙ্গিক ভাবে আঞ্চলিক সাহিত্যকে তার রূপান্তর পুষ্ট করেছে। তাদের অন্তর্ভুক্ত উপাখ্যানগুলি এখনও বর্তমানকালের সাহিত্যিকদের একটি প্রধান উপজীব্য উপকরণ।

এই দুটি প্রাচীন গ্রন্থের কল্যাণসাধনের ভূমিকা শুধু সাহিত্যের

ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; তা আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। সূর্য ও চন্দ্র যেমন অন্ধকার অপসৃত করে পথ আলোকিত করে, এই গ্রন্থদুটিও তেমন সংসার জীবনে ন্যায়ের পথ, ধর্মের পথ নির্দেশ করে ভারতবাসীর নৈতিক চেতনাকে স্মরণাতীত কাল ধরে পুষ্ট করে এসেছে। তারা ভারতবাসীর নৈতিক মূল্যবোধকে রীতিমত প্রভাবিত করেছে। সত্যভাষণ, প্রতিশ্রুতি পালন, অহিংসা এবং অধ্যাত্ম সম্পদের প্রতি আকর্ষণ তাই ভারতের মানুষের জীবনকে এখনও মহিমামণ্ডিত করে।

সুতরাং ভারতীয় সমাজে রামায়ণের সামগ্রিক ভূমিকার একটি পরিচয় দেবারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রামায়ণের ভারতবাসীর উপর নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে যে প্রভাব ক্রিয়াশীল আছে তার বিবরণ তাতে থাকবে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসাবে তার মূলরূপে বা আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত রূপে তা সংস্কৃত সাহিত্য বা আঞ্চলিক সাহিত্যগুলিকে কেমন পুষ্ট করেছে এবং রামায়ণের মূল চরিত্রগুলি তাঁদের আচরণ এবং মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কি ভাবে ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধন করেছে, তার বিবরণ তাতে থাকবে।

(৮)

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়

এই প্রাথমিক আলোচনার ফলে আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশের পথ প্রস্তুত হয়ে গেছে। এখানে যে বিষয়গুলি আলোচিত হবে তাদের একটি বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত তালিকা স্থাপন করা যেতে পারে। তা বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য ক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট পরিচয় দেবে।

আমাদের প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়ের একটি তালিকা নীচে স্থাপিত হল:

১। রামায়ণ আদিকাব্য কিনা? রামায়ণ প্রাচীনতর গ্রন্থ

না মহাভারত প্রাচীনতর গ্রন্থ ? যদিও ঐতিহ্য অনুসারে রামায়ণের ঘটনা ত্রেতাযুগে ঘটেছিল এবং মহাভারতের যুদ্ধ পরবর্তী দ্বাপর যুগে ঘটেছিল, গবেষকদের মধ্যে এই প্রশ্নটি নানা কারণে একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয় সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য একত্র স্থাপন করে তাদের সামগ্রিক মূল্যের ভিত্তিতে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি যুক্তিসম্মত মীমাংসায় আসার চেষ্টা হবে।

২। রামায়ণে সংযোজন ঘটেছিল কিনা এবং তা ঘটে থাকলে তার আদিরূপ কি ছিল।

রামায়ণে যে সংযোজন ঘটেছিল সে বিষয় কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং প্রধান আলোচ্য বিষয় রামায়ণের কোন অংশ পরে সংযুক্ত হয়েছিল তার সন্ধান করা। সেই অংশগুলি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হলে রামায়ণের আদিরূপ কি ছিল, তা বাহির করতে অসুবিধা হবে না।

৩। বৌদ্ধজাতকে রামায়ণের মূল কাহিনীর যে রূপান্তর ঘটেছে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য।

বৌদ্ধ লেখকদের রামচরিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রামকে এবং তাঁর বংশকে গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করবার ইচ্ছা হতে বৌদ্ধ জাতকে রামায়ণ সম্পর্কিত কাহিনীগুলির উৎপত্তি ঘটে। ঘটনাচক্রে এই ইচ্ছার প্রভাবে রামায়ণের মূল কাহিনীর মৌলিক অংশে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এই কাহিনী-গুলিকে ভিত্তি করে রামায়ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং সত্যের অনুরোধে এই কাহিনীগুলির উৎপত্তির কারণ এবং সেগুলি মূল কাহিনীর যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য এই প্রশ্নের একটি সন্তোষজনক মীমাংসার প্রয়োজন আছে।

৪। রামায়ণের ঐতিহাসিকতা অর্থাৎ রামকাহিনী ঐতিহাসিক

ঘটনা কিনা।

রাম যে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র তা স্মরণাতীত কাল হতে ভারতবাসী বিশ্বাস করে আসছে। তাঁকে ঘিরে একটি জনশ্রুতিও গড়ে উঠেছে যে রামরাজ্য ছিল আদর্শ রাজ্য। রামায়ণকার তাকে ইতিহাস বলে প্রচার করেছেন। মহাভারতেও রামকাহিনীর উল্লেখ আছে এবং সেখানেও তাকে ইতিহাস বলে দাবী করা হয়েছে। তা সত্বেও বর্তমান কালে ঐতিহাসিক গ্রন্থে রামায়ণের কাহিনীকে ইতিহাস বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। সেট কতখানি যুক্তিযুক্ত এই পরিবেশে রামায়ণের প্রসঙ্গে তা একটি মৌলিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রশ্ন স্বভাবতই রামায়ণ সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রাধিকার পাবার দাবী রাখে।

৫। রাম কাহিনীর সাহিত্যিক গুণ।

রামায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যে আদিকবির আদিগ্রন্থ হওয়া সত্বেও বহু উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক গুণের অধিকারী। সম্ভবতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাস ব্যতীত অন্য কোনও সাহিত্যিক তাঁর সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হবার অধিকার রাখেন না। রামায়ণের এই বিশেষ গুণের একটি পরিচয় না দিলে গ্রন্থটির আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে না।

৬। রামায়ণের মূল চরিত্রগুলির আলোচনা।

রামায়ণের মূল চরিত্রগুলি দু' দিক হতে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত, চরিত্রগুলি সংলাপের মধ্য দিয়ে এমন দক্ষতার সহিত চিত্রিত হয়েছে যে তাদের ভারি সজীব মনে হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের আশ্রয় করে এমন বহু চারিত্রিক গুণের সমাবেশ ঘটেছে যা ভারতের মানুষের নীতিবোধকে পুষ্টি দান করে এসেছে। এই দুই কারণে তাদের সহিত নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন আছে।

৭। ভারতীয় সমাজের উপর রামায়ণের প্রভাব।

রামায়ণ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ (৮) নয় তা সম্ভবতঃ ভারতীয় সমাজকে স্মরণাতীত কাল হতে নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। সে প্রভাব বর্তমান কালেও ক্রিয়াশীল আছে। সাহিত্যে, শিল্পে, লোকসংস্কৃতিতে তার প্রভাব ছড়িয়ে আছে। ভারতের মানুষের চরিত্র গঠনে তা একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে।

এ বিষয় মহাভারত ব্যতীত তার সমকক্ষ আর কোন প্রাচীন গ্রন্থ বিশ্বে কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এ গুণটি রামায়ণের একটি মূল বৈশিষ্ট্য। সেই কারণে এ বিষয় একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা গ্রন্থের শেষে স্থাপিত হবে।

●

৮। রামায়ণকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে দাবী করলে কিছু আপত্তি উঠতে পারে। বেদের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, বেদাঙ্গগুলিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তবে সেগুলি বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হয় বলে রামায়ণকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামায়ণ আদিকাব্য কিনা

(১)

মহাভারতের প্রাচীনতার সপক্ষে যুক্তি

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের মূলকাহিনীর পরিবেশ বৈদিক যুগের পরিবেশ। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমাজের মানুষ কর্মের প্রকৃতি অনুসারে চার ভাগে বিভক্ত ছিল ; আর ব্যক্তির জীবন তার স্বাভাবিক বিভাগকে ভিত্তি করে চারটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল ঃ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং যতি। চারটি বর্ণ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও অধ্যাপনা করত। ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ করত। বৈশ্য কৃষি ও বাণিজ্য করত। শূদ্র অন্য বর্ণগুলির সেবা করত। যজ্ঞ অনুষ্ঠানই ছিল ধর্ম। বর্তমান কালের মত বিগ্রহ স্থাপন করে পূজার রীতি তখনও প্রবর্তিত হয় নি।

আমরা লক্ষ্য করব রামায়ণ ও মহাভারতের মূলকাহিনী দুটি এই সামাজিক পরিবেশেই স্থাপিত। এই কারণেই খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রধানত তাকে ভিত্তি করেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে রামায়ণ প্রাচীনতর না মহাভারত প্রাচীনতর। অতিরিক্ত ভাবে জার্মান ভারততত্ত্ববিৎ ওয়েবারের এক প্রতিকূল মন্তব্যও এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উৎসাহ দিয়েছে। তিনি বলে গেছেন যে রামায়ণের কাহিনী আদৌ ঘটেনি এবং সীতা হরণের কাহিনী হোমার রচিত ইলিয়াডের অনুকরণে রচিত, সুতরাং তা আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পর রচিত। সুতরাং এই বিতর্ক বর্তমান কালের পণ্ডিতদের চিন্তায় সম্প্রতি প্রবল আকার ধারণ করেছে।

মহাভারত যে প্রাচীনতর এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ নাই।

রামায়ণের মধ্যেই মন্তব্য পাওয়া যায় যে তার লেখক বাল্মীকি এটি রচনা করেছিলেন এবং এটি সংস্কৃত সাহিত্যে রচিত আদিকাব্য। (১) এই দাবীর বিরুদ্ধে প্রাচীন কালে কোনও প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় নি। জনশ্রুতি অনুসারে বাল্মীকিকে আদিকবি বলেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সে যাই হোক যখন দাবী করা হয়েছে যে মহাভারত রামায়ণ হতে প্রাচীনতর তখন এই প্রশ্নটির একটি মীমাংসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্তমান অধ্যায়ে এই প্রশ্নটি সবিস্তার আলোচিত হবে।

যাঁরা দাবী করেন মহাভারত প্রাচীনতর, তাঁরা মূলত দুটি যুক্তি ব্যবহার করেন। প্রথম যুক্তি হল রামায়ণের রচনা মহাভারতের রচনা হতে সাহিত্যিক গুণে বেশী সমৃদ্ধ। সুতরাং তাঁরা বলেন, রামায়ণ যে পরে রচিত হয়েছিল, তা প্রমাণ হয়ে যায়। দ্বিতীয় যুক্তিটি বেশ বিস্ময়কর। তা আমাদের বদ্ধমূল ধারণাকে রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তা বলে যে রামায়ণের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং অপরদিকে বিরাট মহাভারত গ্রন্থে বুদ্ধের বিষয় কোনও উল্লেখ নাই; সুতরাং প্রমাণিত হয়ে যায় রামায়ণ বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে রচিত। কাজেই মহাভারত প্রাচীনতর গ্রন্থ।

প্রথম যুক্তিটি বিশেষ সবল নয় এবং অল্প কথায় তার সত্যতা নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। একথা অনস্বীকার্য যে রামায়ণের কাহিনীর সাহিত্যিক উৎকর্ষ মহাভারত হতে অনেক বেশী। নিঃসন্দেহে বলা যায় আদিকবি বাল্মীকি কবিতা রচনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তা বলে তা প্রমাণ করে না যে রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী কালের রচনা। কারণ, সাধারণত রচনার উৎকর্ষ কালানুক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয় বিশেষ লেখকের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর বাল্যকালের রচনা অপরিণত ছিল। সেই কারণে সেই রচনার সঙ্গে তিনি যখন খ্যাতির শিখরে উঠে-

(১) আদিকাব্যমিদং চার্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্। উত্তরকাণ্ড। ২২৮।১০৭

ছিলেন সেই সময়ের রচনার সঙ্গে তুলনায় তা নিকৃষ্ট ঠেকবে। মহাকবি কালিদাসের ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। তাঁর প্রথম রচনা 'ঋতুসংহারের' সঙ্গে তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'মেঘদূতের' কোনও তুলনাই হতে পারে না। এঁদের ক্ষেত্রে কোন রচনা আগে বা পরে লেখা হয়েছিল, তা জানা না থাকলেও অনায়াসে রচনার উৎকর্ষের ভিত্তিতে বলে দেওয়া যায় কোন রচনা প্রাচীনতর। রবীন্দ্রনাথের 'শৈশবসঙ্গীত' বা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' যে 'গীতাঞ্জলির' থেকে প্রাচীনতর তা অনায়াসে বলে দেওয়া যায়।

একটি সমগ্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু রচনার উৎকর্ষের ভিত্তিতে কোন কবি আগে লিখেছেন বা কোন কবি পরে লিখেছেন, তা বলা যায় না। কারণ, কোনও বিশেষ কবি তাঁর নিজস্ব প্রতিভার গুণে প্রাচীনতর কালে জন্মগ্রহণ করেও পরবর্তী কালের কবি হতে উৎকৃষ্টতর সাহিত্য রচনার শক্তি রাখেন। বাংলা সাহিত্যে নান্নুরের কবি চণ্ডীদাসের রচনা সাহিত্যিক গুণে প্রায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' বলা হয়েছে শ্রীচৈতন্য তাঁর কবিতা পাঠে আনন্দ পেতেন। প্রাচীন হয়েও তাঁর কত খ্যাতি। সুতরাং বিশেষ কবির রচনা উৎকৃষ্টতর হলে তা যে পরবর্তীকালের হবে, এমন অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কালিদাসের রচনার মান যে ভারবীর রচনা হতে উৎকৃষ্টতর এই তথ্যকে ভিত্তি করে এমন অনুমান সঙ্গত হবে না যে তিনি ভারবীর পরবর্তীকালের মানুষ। প্রতিভাধর ব্যক্তি যে কোনও যুগে জন্মগ্রহণ করতে পারেন।

দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রামায়ণের যে শ্লোকটি এই যুক্তির ভিত্তি, তা হল এই ঃ

বুদ্ধ্যানয়ৈবং বিধয়া চরন্তং সুনাস্তিকং ধর্মপথাদপেতম্।
যথা হি চোর ঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি॥ (২)

২। অযোধ্যাকাণ্ড। ৬০৯। ৩৩—৩৪

এটি অযোধ্যাকাণ্ড হতে উদ্ধৃত। দশরথ রামকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা ঘোষণা করবার পর কৈকেয়ী পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে সে ব্যবস্থা রহিত করিয়ে দিয়ে দুটি নূতন ব্যবস্থা আদায় করে নিলেন। প্রথম ব্যবস্থা হল রাম চতুর্দ্দশ বৎসর বনে গিয়ে বাস করবেন এবং দ্বিতীয় হল কৈকেয়ীর পুত্র ভরত তাঁর স্থলে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হবেন। দশরথ এ বিষয় কোনও স্পষ্ট নির্দেশ না দেওয়ায় কৈকেয়ী রামকে সেখানে ডাকিয়ে আনালেন এবং তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাম বিনা দ্বিধায় পিতাকে প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়তা করবার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মনির্বাসনে সম্মত হলেন। রাম নির্বাসিত হবার পর দশরথ প্রিয় পুত্রের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন। তখন বশিষ্ঠ ভরতকে মাতুলালয় হতে ডেকে পাঠিয়ে রামের অনুপস্থিতিতে সিংহাসন অধিকার করতে উপদেশ দিলেন। কারণ, রাজাবিহীন রাজ্য বিপদ ডেকে আনে।

ভরত কিন্তু তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠেরই সিংহাসনে অধিকার। সুতরাং রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তিনি ঠিক করলেন রামকে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে স্থাপিত করবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সদলে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে রামের সহিত দেখা করলেন এবং পিতার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত থাকতে কনিষ্ঠের রাজপদ অধিকার করা উচিত নয়। রাম কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল। পিতার কাছে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তিনি চোদ্দ বছর বনে বাস করবেন এবং ভরতের উচিত পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করা।

এই পরিবেশে জাবালি মুনি এসে রামকে কিছু উপদেশ দিলেন।

তা একান্তই বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন রীতিমত স্বার্থপর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি বললেন, কেহ কারও বন্ধু নয়, মানুষ একাকী সংসারে আসে একাকী চলে যায়। মেধাবী মানুষ অনেক বিধান দিয়ে গেছেন যেমন দান কর, ত্যাগ কর, তপস্যা কর ; কিন্তু তাঁদের কথায় বিশ্বাস রাখা উচিত নয়। তাঁরা অনেক যুক্তিহীন কথা বলেন। যেমন মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দেবার নির্দেশ আছে ; কিন্তু যে মরে গেছে তার কিছু খাবার প্রয়োজন আছে কি ? অতএব 'প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু' ; যা প্রত্যক্ষ পাও তাই গ্রহণ কর ভবিষ্যতের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর। (৩)

এই কথাগুলি এমন স্বার্থপর, নীতিস্পর্শবিহীন এবং শাস্ত্রের প্রতি এমন অবজ্ঞাসূচক যে রামকে তা রীতিমত আঘাত করেছিল। তিনি একটি উচ্চ আদর্শ পোষণ করতেন। তাঁর জীবনদর্শন বলে সত্যপালন, সত্যভাষণ প্রভৃতি গুণগুলি এমন মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে তার উপর সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। 'সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ'। (৪) এই প্রসঙ্গেই তিনি উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছিলেন।

এই পরিবেশ মনে রাখলে রামের মন্তব্যের প্রকৃত অর্থগ্রহণ করা সহজ হবে। জাবালি মুনির দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমত অতি নীচ ; কারণ, তা স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেয় এবং স্বার্থসাধনের জন্য নীতিবিরুদ্ধ কাজ করতে উপদেশ দেয়। দ্বিতীয়ত, তিনি শাস্ত্রকারদের অবজ্ঞা করেন, শাস্ত্রবিরোধী উপদেশ দেন, সুতরাং তিনি নাস্তিক। তাই তিনি জাবালিকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন যে যিনি এইরূপ সঙ্কুচিত বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হন তাঁকে চোরের সমস্থানীয় গণ্য করতে হবে এবং নাস্তিকও তার সগোত্র সেই কথা বুঝতে

৩। এই প্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টাধিক শততম সর্গ দ্রষ্টব্য।

৪। অযোধ্যাকান্ড। ১০৯।১০

হবে। এখানে 'বুদ্ধ' ও 'তথাগত' উভয় পদই নাস্তিকের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে 'যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধঃ'। অর্থাৎ তাকে পরস্ব অপহরণকারী চোর বলে গণ্য করতে হবে? এখানে 'বুদ্ধ' শব্দটি কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। অনুরূপ ভাবে 'তথাগত' অর্থে 'সেই পথেরই পথিক' ধরতে হবে। পদদুটির অভিধা অর্থ গ্রহণ করেই ব্যাখ্যা করতে হবে। ঐতিহাসিক মানুষ বুদ্ধের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা একান্তই অসঙ্গত হবে। সুতরাং এই যুক্তির আদৌ কোনও ভিত্তি নাই; একটি অপব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে তা গড়ে তোলা হয়েছে। রামায়ণে গৌতম বুদ্ধের আদৌ উল্লেখ নাই। যে প্রসঙ্গে কথাগুলি বলা হয়েছে তা স্মরণ রাখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামায়ণ-বিশেষজ্ঞ সি ভি বৈদ্য তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে এই শ্লোকটি বাংলায় রক্ষিত রামায়ণের সংকলনে স্থান পায়নি। (৫) সেখানে বর্জিত হলেও এটা প্রমাণিত হয় না যে মূলরামায়ণে তা ছিল না। বরং থাকাই সম্ভব। রামের নীতি সচেতন মন যে জাবালির উপদেশে অত্যন্ত আঘাত পাবে এবং ফলে তিনি কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করবেন এমন ঘটাই স্বাভাবিক। তার ভ্রান্ত অর্থ করার জন্যই এমন যুক্তির উৎপত্তি হয়েছে।

(২)

রামায়ণের প্রাচীনতার সমর্থনে যুক্তি

এখন রামায়ণ যে প্রাচীনতর গ্রন্থ এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি স্থাপন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমত দুটি জনশ্রুতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

৫। C. V. Vaidya, The Riddle of the Ramayana.

একটি জনশ্রুতি আছে রামায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যের আদিকাব্য। রামায়ণের মধ্যেই এই জনশ্রুতির সমর্থন পাওয়া যায়। রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের শেষে বলা হয়েছে 'আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্'। অর্থাৎ এই আদিকাব্য পুরাকালে বাল্মীকি ঋষি কর্তৃক রচিত হয়েছিল। রামায়ণের এই দাবীকে স্মরণাতীত কাল হতে প্রচারিত জনশ্রুতি সমর্থন করে। এক্ষেত্রে তার যে একটি বাস্তব ভিত্তি ছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

দ্বিতীয়ত, আর একটি জনশ্রুতি আছে যে রামের আবির্ভাব ঘটেছিল ত্রেতাযুগে এবং মহাভারতের মূল চরিত্র কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল দ্বাপর যুগে। হিন্দুদের ধারণা অনুসারে ভারতীয় ইতিহাসকে চারটি যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে : সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। এ চারটি যুগ সম্বন্ধে মহাভারতে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বে হনুমান ভীমকে এই বিবরণ দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে। (৬) সেখানে প্রত্যেক যুগের লক্ষণগুলি সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

সেখানে বলা হয়েছে যে সত্যযুগে চারটি বেদ ছিল না। সে যুগে ব্যাধি ছিল না ; হিংসা-দ্বেষ-ভয়-সন্তাপ মানুষকে পীড়া দিত না। তখন ন্যায়ধর্ম পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ত্রেতাযুগে ন্যায়ধর্ম এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছিল। তখনই যজ্ঞক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছিল। দ্বাপরযুগে ন্যায়ধর্ম অর্দ্ধেক হ্রাস পেয়েছিল। সেই সময় বেদ চার ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। শেষে আসবে কলিযুগ। তখন নীতিবোধ তিন-চতুর্থ অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। বেদের অনুষ্ঠানাদি লোপ পাবে।

বোঝাই যায় নীতিবোধের ক্রমিক ক্ষয়ের ভিত্তিতেই এই যুগ-বিভাগ বিন্যস্ত হয়েছে। সে যাই হোক, ত্রেতা ও দ্বাপরের যে

৬। মহাভারতের বনপর্ব ১৪৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে, তা রামায়ণের প্রাচীনতার দাবীকে সমর্থন করে বলে মনে হয়। ত্রেতাযুগে যজ্ঞরীতি আরম্ভ হয়েছে বলা হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, তখন ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি রচিত হতে সুরু করেছে। আরও বলা হয়েছে দ্বাপর যুগে বেদ চার ভাগে বিন্যস্ত হয়েছিল। মহাভারতের কবি ব্যাস যে বেদকে চার ভাগে বিন্যস্ত করেছিলেন, তা স্বীকৃত। সেই কারণে তাঁকে বেদব্যাস বলা হয়। সুতরাং মহাভারতের ঘটনাকে দ্বাপর যুগে স্থাপন করা যায়। সুতরাং এই জনশ্রুতি অনুসারে রামায়ণের ঘটনা যখন ঘটে তখন বৈদিক যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে; কারণ, বলা হয়েছে যে ত্রেতাযুগে যজ্ঞধর্ম অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। সুতরাং বেদের সূক্তগুলি রচিত হতে সুরু হয়েছে। মহাভারতের ঘটনার সময় বেদগুলি পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছে ধরতে হবে। কারণ, তা না হলে ব্যাসদেবের বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করার প্রশ্ন ওঠে না।

সুতরাং এই তথ্যগুলি ইঙ্গিত করে যে রামায়ণ প্রাচীনতর গ্রন্থ। তার সমর্থন কিছু প্রমাণ মহাভারতের মধ্যেই পাওয়া যায়। আমরা দেখি রামায়ণের মধ্যে কোথাও চারটি বেদের উল্লেখ নাই। অপর পক্ষে মহাভারতে তার উল্লেখ আছে। মহাভারতের এই প্রাসঙ্গিক অধ্যায়েই তার প্রমাণ মিলবে। তার অতিরিক্ত ভাবে মহাভারতের মধ্যেই রামায়ণ যে প্রাচীনতর গ্রন্থ তার কিছু প্রমাণ মিলবে।

(৩)

মহাভারতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ

এই প্রসঙ্গে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে। রামায়ণের কোথাও মহাভারতের মূল কাহিনী সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। অপরদিকে মহাভারতের একাধিক স্থানে রামের

কাহিনী সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠির কর্তৃক রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উঠলে সেই প্রসঙ্গে রাম যে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। আরও বড় কথা হল, মহাভারতে রামায়ণের মূল কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে।

এটি পাওয়া যায় মহাভারতের বনপর্বে। তার পরিবেশ হল এই। দ্বিতীয়বার পাশা খেলায় হেরে যুধিষ্ঠির বারো বছরের জন্য সপরিবারে বনবাসে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর চার ভ্রাতা ও দ্রৌপদী। জয়দ্রথ তাঁদের সেখানে দেখতে যান। পাণ্ডব ভ্রাতাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে যান। তখন মার্কণ্ডেয় ঋষি এসে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনার জন্য প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে কোশলরাজ রামের ভাগ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। এই সূত্রে তিনি সমগ্র রামায়ণের কাহিনী যুধিষ্ঠিরের নিকট স্থাপন করেন। সেই কাহিনী বনপর্বের অনেকখানি স্থান দখল করে আছে। তাকে রামায়ণ উপাখ্যান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বনপর্বের ২৭৭তম অধ্যায় হতে ২৯০তম অধ্যায় জুড়ে তা বর্ণিত হয়েছে। এই উপাখ্যানে রামের যে কাহিনী স্থাপিত হয়েছে তা মূল রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে মিলে যায়। কেবল একটি স্থানে সামান্য পার্থক্য আছে, যাকে গৌণ বলে ধরে নেওয়া যায়। সে বিষয় কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মূল কাহিনীতে আছে রাবণকে বধ করবার পর রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন এবং তারপর তাঁকে সীতাকে এনে রামের নিকট স্থাপন করবার নির্দেশ দিলেন। সীতা আসলে রাম তাঁর সহিত এমন নিষ্ঠুর আচরণ করলেন যা তাঁর অতীতের আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। তিনি সীতাকে বললেন, শত্রু কর্তৃক তিনি পঞ্চবটী বন হতে অপহৃতা হয়েছিলেন। সেই অপমানের

প্রতিকার তিনি করেছেন শত্রুকে যুদ্ধে নিহত করে। এখন দীর্ঘকাল শত্রুর আশ্রয়ে সীতার বাস হেতু তাঁর চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। তাই তাঁকে গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই কথাগুলি তিনি অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই পরিস্থিতিতে 'চরিত্র সন্দেহ হেতু' সীতা তাঁর নিকট 'নেত্রকে আতুর করে এমন দীপের মত'। সুতরাং সীতাকে তিনি গ্রহণ করবেন না, সীতা যেদিকে খুশী চলে যেতে পারেন।

স্বভাবতই সীতা তখন অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। রামের যে পরিচয় তিনি আগে পেয়েছিলেন তাতে তিনি জানতেন রাম পত্নীগত-প্রাণ আদর্শ স্বামী। এমন কুসংস্কার যে তাঁদের দুঃখে অর্জিত পুনর্মিলনে বাধা সৃষ্টি করবে, তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাই এই অপমানকর আচরণে আহত হয়ে তিনি রামকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন যে রাম অমার্জিত মানুষের মত তাঁর সহিত আচরণ করছেন ; কাজেই তিনি চিতায় আত্মোৎসর্গ করবেন। (৭)

তারপর রামায়ণে যা পাই তা যুদ্ধকাণ্ডের ৩৮তম সর্গে বর্ণিত হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই অংশটি পরবর্তীকালের সংযোজন। সেখানে বলা হয়েছে, সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করবার পর ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন। রাম তখন তাঁর পরিচয় জানাতে বললেন, তিনি নিজে একজন মানুষ, যিনি আবির্ভূত হলেন তিনি কে ? ব্রহ্মা তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, রাম সামান্য মানুষ নয়, তিনি বিষ্ণুর অবতার এবং সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। তাই শুনে সীতাকে রাম গ্রহণ করলেন। রামায়ণ যখন প্রথম লিখিত হয়, তখন নিশ্চয় রাম বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃতিলাভ করেন নি।

তুলনায় মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানে যা পাই তা অনেক সঙ্গতিপূর্ণ। সেখানে বলা হয়েছে যে রাম সীতাকে যুদ্ধবিজয়ের

৭। যুদ্ধকাণ্ড। ১১৬। ১৮।

পর তাঁর ওপর কলঙ্ক আরোপন করে, গ্রহণ করতে অসম্মত হলে, সীতা বললেন, তিনি অপাপবিদ্ধা। আরও বললেন, তিনি যদি সত্যই পাপ আচরণ করে থাকেন, তাহলে বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি তাঁর প্রাণ হরণ করে নিক। তখন অন্তরীক্ষে তাদের বাণী শোনা গেল যে মৈথিলী অপাপা এবং রামের তাঁকে বর্জন করা যুক্তিসম্মত নয়। (৮) সুতরাং মহাভারতে কথিত উপাখ্যান অনুসারে সীতার অগ্নিপরীক্ষা আদৌ হয় নি; আকাশ হতে বাণী ঘোষিত হয়েছিল যে তিনি অপাপা। চিতায় প্রবেশ করে অগ্নি কর্তৃক অক্ষতভাবে তিনি প্রত্যর্পিত হন নি। অগ্নিতে দগ্ধ না হওয়া থেকে আকাশবাণীর সাহায্যে সীতার চরিত্রের নির্মলতা প্রমাণে কল্পনার বিস্তার অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সম্ভবত রামায়ণের আদিরূপেও সেই ধরনের কথাই ছিল এবং তার ভিত্তিতেই মহাভারতের আখ্যায়িকা রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মূল কাহিনীর স্থলে ব্রহ্মার আবির্ভাবের কাহিনী স্থাপিত হওয়ায় এই অসঙ্গতি এসে পড়েছে।

মহাভারতে বর্ণিত আখ্যায়িকা যে মূল রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছিল, তার কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। ভাণ্ডারকর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের খ্যাতিবান অধ্যক্ষ মহাভারতের এক প্রামাণ্য সংকলন গ্রন্থ রচনা করতে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। তিনি মহাভারতে বর্ণিত রামায়ণের উপাখ্যানে ৮৬ ক্ষেত্রে মূল রামায়ণের রচনার সহিত তার ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। (৯) সেই কারণে তিনি এই অনুমান করেছেন যে মহাভারতের রামোপাখ্যান মূল রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ভারত তত্ত্ববিৎ জাকোবিও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। (১০) সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে মহাভারতের এই অংশ যখন রচিত হয় তার বহু পূর্বে বাল্মীকির রামায়ণ রচিত হয়েছিল।

(৪)

রামায়ণের কাহিনীর পরিবেশ প্রাচীনতর

আরও একটি যুক্তি এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যায়। তা একক ভাবে খুব সবল না হতে পারে ; তবে অন্য যুক্তিগুলির সঙ্গে যুক্ত হলে তার নির্ভরযোগ্যতা বর্দ্ধিত হবে বলে মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে রামায়ণ ও মহাভারতে যে সংস্কৃতির আমরা পরিচয় পাই তা মূলত একই। সংযোজিত অংশগুলি বাদ দিলে যা পাই, তাতে দেখা যায় তখনও বৈদিক যুগের সংস্কৃতি বর্তমান ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম তখনও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করত। অরণ্যে কুলপতির তত্ত্বাবধানে আশ্রম থাকত। সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, স্বাধ্যায় পাঠ হত, দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হত। তবু কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয় যা ইঙ্গিত করে যে রামায়ণে বর্ণিত সংস্কৃতি তুলনায় প্রাচীনতর ছিল। এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে।

ঋগ্‌বেদের কালে অনেক মহিলা ঋষি ঋগ্‌বেদের অন্তর্ভুক্ত সূক্ত রচনা করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অপালা, ঘোষা ও বাক্ অন্যতম। সুতরাং অনুমান করা যায় তাঁদেরও আশ্রম ছিল। সেখানে স্বাধ্যায় পাঠ হত, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত এবং বেদের মন্ত্র রচিত হত। এই পরিবেশে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে মহাভারতের কোথাও মহিলার তত্ত্বাবধানে স্থাপিত আশ্রমের উল্লেখ পাই না ; রামায়ণে কিন্তু পাই। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের শেষে পম্পা সরোবরের

পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটিকা—

৮। অপাপা মৈথিলী রাজন্ সংগচ্ছ সহ ভার্যয়া।
মহাভারত। বনপর্ব। ১১৬।১৮

৯। V. S. Sukthamkar, Critical Studies in the Mahabharata, P. 401.

১০। Jacobi, Das Ramayana—Geschiste und Inhalt.

নিকট শবরীর আশ্রমের উল্লেখ পাই। রাবণ পঞ্চবটী বন হতে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁর সন্ধানে ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে এই আশ্রমটি আবিষ্কার করেন। এখানে পূর্বে মাতঙ্গ ঋষির শিষ্যদের বাস ছিল। শবরী ছিলেন তাঁদের পরিচারিকা। তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে, শবরীই সেই আশ্রম পরিচালনা করতেন। সুতরাং তাঁকে এই আশ্রমের মহিলা অধিষ্ঠাত্রী বলে ধরা যায়। কাজেই প্রমাণিত হয় যে আদি বৈদিক যুগের যে ঐতিহ্য ছিল যে মহিলারাও আশ্রম পরিচালনা করতেন, তা রামায়ণের যুগেও অপরিবর্তিত ছিল। এটি রামায়ণ যে তুলনায় প্রাচীনতর গ্রন্থ তার সপক্ষে একটি প্রবল যুক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে। আমরা জানি বৈদিক যুগের মানুষ চারটি বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতের বিজিত আদিবাসীদের বিজেতা আর্যগণ শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিল। বর্ণ হিসাবে তাদের ধর্ম অন্য তিনটি উচ্চবর্ণের সেবাকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তবু মনে হয় শূদ্রদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ বৈদিক যুগের প্রথম দিকে কঠোর ভাবে তাদের উপর আরোপ করা হত না। অর্থাৎ শূদ্র মাত্রেই অন্য বর্ণভুক্ত মানুষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করত না। এই নিয়ম শিথিলভাবে পালিত হত। শূদ্রবর্ণের মানুষও রাজপদে অধিষ্ঠিত হতে পারত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ঋগ্‌বেদে যদু ও তুর্বশ নামে দুই দাস রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১১)

আমরা দেখি রামায়ণের কাহিনীতেও শূদ্রজাতীয় রাজার উল্লেখ আছে। অযোধ্যাকাণ্ডের ৫০ ও ৫১তম সর্গে নিষাদরাজ গুহের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ বনগমনের পথে রাম যখন

১১। ঋগ্‌বেদ। ১০। ৬২। ১০

গঙ্গা পার হয়ে শৃঙ্গবেরপুরে এলেন সেখানে স্থানীয় রাজা গুহ তাঁকে স্বাগত জানাতে এলেন। তাঁর সঙ্গে রামের নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। তাই অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা করবার ভার তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন। বনবাসকালে রাম প্রাসাদে বাস বর্জন করেছিলেন বলে অতিথিদের রাত্রিযাপনের জন্য তিনি পর্ণকুটীর নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যায় রামায়ণের কাহিনী রচনার সময় শূদ্রও রাজা হতে পারতেন। সুতরাং এ বিষয় আদি বৈদিকযুগের ঐতিহ্য তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। মহাভারতে কিন্তু কোনও দাস রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে সত্যবতীর পিতার কথা এসে পড়ে। তিনি ধীবরদের সর্দার ছিলেন, তিনি রাজোচিত ভূমিকা পালন করে দেশ শাসনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন বলে উল্লেখ নাই। এই পার্থক্য ইঙ্গিত করে যে মহাভারতের কাহিনীর পরিবেশ রামায়ণের কাহিনীর পরিবেশ হতে অপ্রাচীন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে যা ইঙ্গিত করে যে রামায়ণের কালে ভারত উপমহাদেশে আর্যসংস্কৃতি যতখানি বিস্তার লাভ করেছিল, মহাভারতের কালে তা হতে অনেক বেশী বিস্তার লাভ করেছিল। দেখা যায় রামায়ণে যে অঞ্চলগুলির বিশেষ উল্লেখ আছে সেগুলি সবই উত্তর ভারতে অবস্থিত। পূর্বে একেবারে শেষ প্রান্তে যে রাজ্যের উল্লেখ পাই তা হল বিদেহ। এই বিদেহের রাজা ছিলেন জনক। তা বর্তমান উত্তর বিহারে অবস্থিত ছিল।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অনেকগুলি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গান্ধার ছিল সব থেকে দূরে অবস্থিত। বর্তমানে উত্তর কাশ্মীর, পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি জুড়ে যে ভূখণ্ড আছে তাকে নিয়ে গান্ধার রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তার অব্যবহিত পূর্বে অবস্থিত ছিল মদ্ররাজ্য। তা চন্দ্রভাগা (বর্তমানে চেনাব নামে পরিচিত) এবং

ইরাবতী (বর্তমানে রাভি নামে পরিচিত) এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল। কেকয় রাজ্য অবস্থিত ছিল তার পূর্বে। তা বিপাশা (বর্তমান নাম বিয়াস) এবং শতদ্রু (বর্তমান নাম সাটলেজ) এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন কৈকেয়ী। তার পূর্বে অবস্থিত ছিল কোশল রাজ্য। তার বর্তমান নাম আউধ। তার রাজধানী অযোধ্যা সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই নদীর বর্তমান নাম ঘর্ঘরা।

রামের বনে গমনের পর দশরথের পুত্রশোকে যখন মৃত্যু হয়, তখন ভরত শত্রুঘ্নের সহিত কেকয় রাজ্যে তাঁর মাতুলালয়ে বাস করছিলেন। তখন বশিষ্ঠ তাঁকে তাড়াতাড়ি অযোধ্যায় ফিরে আসতে নির্দেশ পাঠালেন। তখন ভরত যে পথে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন অযোধ্যাকাণ্ডের ৭১তম সর্গে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ স্থাপিত হয়েছে। পথে তাঁর যে নদীগুলি পার হতে হয় তাদের নাম সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় তিনি প্রথমে শতদ্রু নদী অতিক্রম করেন। তারপর তিনি সরস্বতী নদী পার হন, তারপর যমুনা, তারপর গঙ্গা এবং সর্বশেষে গোমতী নদী অতিক্রম করে অযোধ্যায় উপস্থিত হন। সুতরাং গান্ধার হতে বিদেহের মধ্যে তখন আর্যসংস্কৃতির বিস্তার সীমিত ছিল মনে হয়। এই অঞ্চলে আর্যরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল ধরে নেওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সরস্বতী নদীর উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি সরস্বতী নদী বৈদিক যুগে একটি বিখ্যাত স্রোতস্বিনী ছিল। ঋগ্‌বেদে তার একাধিক স্থানে নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এক জায়গায় সিন্ধু, সরস্বতী ও সরযূকে 'মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (১২) ঋগ্‌বেদের নদী সূক্তে উনিশটি

১২। ঋগ্‌বেদ। ১০।৬৪।৯

নদীর নাম উল্লেখ আছে। তাতেও সরস্বতীর নাম আছে। (১৩) সুতরাং বোঝা যায় বৈদিক যুগে এই সরস্বতী একটি বড় নদী ছিল। তার নাম মনুসংহিতাতেও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সরস্বতী এবং তার উপনদী দৃশদ্বতীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে ব্রহ্মাবর্ত বলা হত। (১৪) তা সিন্ধুর সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয়ে কচ্ছ সাগরে পতিত হয়েছিল। এ বিষয় কিছু মতানৈক্য আছে। আর একটি মত হল তা সমুদ্রের নিকটে এসে সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হয়েছিল। অর্থাৎ তা সিন্ধুনদের উপনদী ছিল। সে যাই হোক, পরবর্তীকালে তার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। সুতরাং রামায়ণে তার উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রামায়ণের কালে যে তা প্রবাহিত ছিল তা রামায়ণ কাহিনীর রচনাকালের প্রাচীনতার ইঙ্গিত করে।

আর্যগণ যে অঞ্চলে তখন আধিপত্য বিস্তার করেছিল তাকে উপরে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এইভাবে চিহ্নিত করা যায়। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে গান্ধার ও পশ্চিমে বিদেহ এবং দক্ষিণে গঙ্গা। এই অঞ্চলে নানা বিখ্যাত ঋষিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অনেকগুলি আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌতমের আশ্রম বিদেহ রাজ্যে অবস্থিত ছিল। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম ছিল বর্তমান ঋষিকুণ্ড নামক স্থানে। তা পশ্চিম ভাগলপুরে অবস্থিত। বাল্মীকির আশ্রম প্রয়াগের বিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। বিশ্বামিত্রের আশ্রম কোশী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল ; বর্তমান বক্সারের তা নিকটে ছিল।

অপর পক্ষে দক্ষিণ ভারতে বিখ্যাত ঋষিদের কোনও আশ্রমের বিশেষ উল্লেখ পাই না। তার একমাত্র ব্যতিক্রম হল অগস্ত্যঋষির আশ্রম। তা অবস্থিত ছিল বর্তমানে যাকে নাসিক বলি তার

১৩। ঋগ্‌বেদ। ১০।৭৫

১৪। মনুসংহিতা। ২।১৭

সন্নিহিত একস্থানে। জনশ্রুতি অনুসারে তিনিই প্রথম বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে আশ্রম স্থাপন করেন। নাসিকের সন্নিহিত অঞ্চলই সেকালে জনস্থান নামে পরিচিত ছিল। পঞ্চবটী তার অন্তর্ভুক্ত। ঠিক বলতে কি গঙ্গা ও যমুনার দক্ষিণের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। এই অঞ্চল গঙ্গার দক্ষিণ হতে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তা পূর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভরদ্বাজ মুনির উপদেশ অনুসারে রাম বনবাস জীবন যাপন করতে প্রথমে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে বাস করেন। চিত্রকূট দণ্ডকারণ্যের উত্তর সীমানায় অবস্থিত ছিল।

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যারা বাস করত তারা নরখাদক ছিল। আমরা রামায়ণে পাই যে রাম যখন চিত্রকূটে বাস করছিলেন তখন আশ্রমবাসী ঋষিদের উপর তারা এমন অত্যাচার করত যে তাঁরা এ অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে লাগলেন। তারা ঋষিদের হত্যা করে ভক্ষণও করত। ভরত চিত্রকূট পর্বতে এসে রামের সঙ্গে দেখা করবার পর রামও ঠিক করলেন যে তিনিও চিত্রকূট ত্যাগ করে আরও দক্ষিণে যাবেন। সেইজন্য তিনি লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁর সহিত দেখা করেন। অগস্ত্যের উপদেশ নিয়েই রাম পঞ্চবটী বনে বাস করতে আরম্ভ করেন। সেই প্রসঙ্গে অগস্ত্য বলেছিলেন রাম যে অঞ্চলে থাকবেন সন্নিহিত আশ্রমবাসী ঋষিরা এই আদিবাসীদের অত্যাচার হতে নিরাপদ থাকবেন। (১৫)

যারা এই ভাবে ঋষিদের উপর অত্যাচার করত তাদের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ চিত্রকূটবাসী ঋষিদের নেতার মুখে পাওয়া যায়। (১৬) ভরত চিত্রকূট ছেড়ে চলে যাবার পর তাঁরা রামের নিকট অনুযোগ

১৫। অপি চাত্র বসন্ রাম তাপসান্ পালয়িষ্যসি। অরণ্যকাণ্ড। ১৩।২০

১৬। অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৬ সর্গ।

করেন যে রামের আগমনের পর তাঁদের উপর এখানকার অধিবাসীদের অত্যাচার বেড়ে গেছে। তাই তাঁরা এই স্থান ত্যাগ করতে চান। রামকে তাঁরা সঙ্গে যেতে বলেন। রামের চিত্রকূট ত্যাগের তাও একটি কারণ। এখানে বলা হয়েছে রাবণের সহিত সম্পর্কিত খর নামে এক রাক্ষসের নেতৃত্বে তারা ঋষিদের উপর এইভাবে অত্যাচার করে। সম্ভবতঃ তারা এই অঞ্চলের আদিবাসী ছিল এবং বৈদিক যজ্ঞক্রিয়া পছন্দ করত না এবং রাবণের তাদের উপর আধিপত্য ছিল; খর রাবণের প্রতিনিধি হিসাবেই তাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করত।

তুলনায় দেখা যায় মহাভারতের কালে আর্য সংস্কৃতি ভারতের পূর্বদিকে এবং দাক্ষিণাত্যে বেশ বিস্তার লাভ করেছে। তার কিছু পরিচয় মহাভারতের সভাপর্বে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন ঠিক করেন, তখন তার প্রস্তুতির জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর ভ্রাতৃগণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। সেখানে উল্লেখ আছে ভীম তাম্রলিপ্ত ও বঙ্গ জয় করেন। (১৭) ওদিকে অর্জুন একেবারে পূর্বপ্রান্তে অভিযান চালিয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ অর্থাৎ বর্তমান আসাম জয় করেন। (১৮) সুতরাং অনুমান করা যায়, তখন বর্তমান আসাম পর্যন্ত পূর্বদিকে আর্যসংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণাঞ্চলে সহদেব কলিঙ্গ, পাণ্ড্য ও কেরল জয় করেন। (১৯) সুতরাং দাক্ষিণাত্যেও আর্যসংস্কৃতি কেরল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। অর্থাৎ সমগ্র ভারত উপমহাদেশে তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। রামায়ণে তা নেই।

১৭। মহাভারত, সভাপর্ব, ত্রিংশ অধ্যায়।

১৮। মহাভারত, সভাপর্ব, সপ্তবিংশ অধ্যায়।

১৯। মহাভারত, সভাপর্ব, একত্রিংশ অধ্যায়।

আমরা জানি প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত এক বিখ্যাত বন্দর ছিল। রামায়ণে তার উল্লেখ না থাকায় এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে রামায়ণের যুগে তা স্থাপিত হয়নি। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার হল যে রামায়ণে রাক্ষস জাতিরা যে ঋষিদের যজ্ঞ কর্মে রীতিমত বিঘ্ন ঘটাত তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ বিষয় ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতের কাহিনীতে এই ধরনের উৎপীড়নের কথা বিশেষ শোনা যায় না। দু একটি রাক্ষসের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন হিড়িম্ব এবং বক রাক্ষস। তারা যে নরখাদক ছিল তার উল্লেখ আছে; কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটানর কোনও অভিযোগ ছিল না। মনে হয় তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান আর্যেতর জাতিরা একরকম স্বীকার করে নিয়েছে।

উপরে রামায়ণ ও মহাভারত— এই দুটি আদি কাব্যের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর সে বিষয় সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য সবিস্তারে স্থাপিত হয়েছে। রামায়ণ যে প্রাচীনতর গ্রন্থ তার সমর্থক বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটি তথ্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন রামায়ণের কালে সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল; কিন্তু মহাভারতে তার কোনও উল্লেখ নাই। যেমন রামায়ণের যুগে আর্যসংস্কৃতি দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিস্তার ঘটেনি। যেমন মহাভারতে সমগ্র রামায়ণ কাহিনীর উল্লেখ আছে; কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের কাহিনীর কোনও উল্লেখ নাই। এই তথ্যের ভিত্তিতে বিনা দ্বিধায় এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে রামায়ণ প্রাচীনতর গ্রন্থ। সুতরাং রামায়ণ যে আদি কবি বাল্মীকি রচিত আদিকাব্য তার সেই খ্যাতি অক্ষুন্ন থেকে যায়।

(৫)

রামায়ণের কাহিনীর কাল

এই প্রসঙ্গে রামায়ণের কাহিনীর ঘটনা কোন সময় ঘটেছিল সেই প্রশ্নের একটি মীমাংসা করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য তার আগে একটি প্রশ্ন রয়ে যায় যে রামায়ণের কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। আলোচনার সুবিধার জন্য সে প্রশ্নটি পরে উত্থাপন করা হবে। বর্তমানে সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর সাপেক্ষ ভাবে রামায়ণের সম্ভাব্য কালের প্রশ্নটির মীমাংসা করে নেওয়া যেতে পারে।

এ বিষয় কিছু সুবিধা আছে। উভয় গ্রন্থ এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে বর্তমান অধ্যায়টি এই প্রশ্ন আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহাভারতের মূলকাহিনী যে ঐতিহাসিক ঘটনা সে বিষয় ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সেই কারণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধেও কিছু নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। তার ভিত্তিতে আমাদের আলোচনা স্বরু হতে পারে।

একটি প্রবাদ আছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল একেবারে দ্বাপর যুগের শেষে এবং ঠিক তার পরেই কলিযুগ আরম্ভ হয়। জ্যোতিষাচর্যগণের হিসাব মতে কলিযুগ আরম্ভ হয় খৃষ্টপূর্ব ৩১০২ অব্দে। তার ভিত্তিতে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখও একই। প্রাচীনকালের বিখ্যাত জ্যোতিষ আর্যভট্ট গণনা করে বলেছেন যে ঐ তারিখেই কলিযুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্তমানে ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে যে সব নূতন তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে তাদের সঙ্গে ঐ তারিখ সঙ্গতি রক্ষা করে না। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সিন্ধু উপত্যকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে দুটি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ আবিস্কৃত হয়। সহর দুটি মাটির তলায় চাপা

পড়েছিল। প্রধানত এই দুটি স্থানে যে নিদর্শনগুলি প্রত্নতাত্ত্বিকদের হস্তগত হয়েছে তার ভিত্তিতে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দীতে সিন্ধু উপত্যকায় এক উচ্চমানের নগর ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

এই সংস্কৃতির প্রকৃতি আর্যসংস্কৃতি হতে পৃথক এবং উচ্চতর মানের ছিল। আর্যগণ নগর জীবনে অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু তারা যে নগর নির্মাণ করত তা একটি উন্নত জীবনযাত্রা-রীতির পরিচয় দেয়। তাদের নগরে সুবিন্যস্ত রাস্তা থাকত, জল নিষ্কাশনের জন্য ভূমির অভ্যন্তরে পয়োনালীর ব্যবস্থা থাকত, এমন কি জনসাধারণের জন্য স্নানাগার নির্মিত করা হত। তারা তুলা হতে উৎপাদিত সুতা দিয়ে বস্ত্র বয়ন করতে জানত। তুলনায় আর্য সংস্কৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল। তারা কৃষি ও গরু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা অশ্ব ব্যবহার করত। অরণ্যে তারা আশ্রম স্থাপন করত এবং গ্রামের পরিবেশে জনপদ গড়ে তুলত। তারা পশমের বস্ত্র বয়ন করত। এই সব তথ্যকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সিন্ধু উপত্যকায় অতি প্রাচীন কালে এক নগর-ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। আর্যগণ তাদের থেকে এক নিকৃষ্ট সংস্কৃতির ধারক। তারা পরবর্তী কালে বাহির হতে ভারতে এসে এই প্রাচীনতর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ভারতে বসতি স্থাপন করে।

এইসব নূতন তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর আরম্ভে আর্যজাতি বাহির হতে এসে এই প্রাচীনতর অধিবাসীদের পরাস্ত করে ধীরে ধীরে ভারতে বসতি বিস্তার করে। (২০) এই সূত্রে এমন একটি দলিল পাওয়া গেছে যা আর্যদের ভারতে আগমনের, তথা ঋগ্বেদ রচনার কাল নির্ণয় করতে সাহায্য করে। দলিলটি এই :

২০। এই প্রসঙ্গে Pigott এর Prehistoric India দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে হিটাইট নামে এক জাতি মেসোপোটেমিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে মিট্টানি নামে আর এক জাতির বাস ছিল। উভয় দেশের মানুষই ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করত। এই দুই রাজ্যের রাজার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং তা পোড়ামাটিতে রক্ষিত হয়েছিল। এই দলিলে কয়েকটি ঋগ্‌বেদের দেবতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয়। এই দলিলটির তারিখ খৃষ্টপূর্ব ১৩৮০।

সুতরাং এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্দর্শ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের মানুষ ঋগ্‌বেদের দেবতাদের সহিত পরিচিত ছিল। সুতরাং ঋগ্‌বেদের প্রথম অংশের রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী বলে ধার্য করা যায়। বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর আছে ঃ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। এই শাখা-প্রশাখাগুলিসহ বিরাট বৈদিক সাহিত্যের বিকাশ লাভ করতে অন্তত পাঁচশত বৎসর লেগেছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় প্রাচীন উপনিষদগুলি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস নামে এক ঋষির কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন। (২১) ইনি যে মহাভারতের প্রধান চরিত্র পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয় সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই; কারণ তিনিও দেবকীর পুত্র। সুতরাং অনুমান করা যায় কৃষ্ণ খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। এই অনুমান অন্য সূত্র হতে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তার দ্বারা সমর্থিত হয়।

বিখ্যাত ভারত তত্ত্ববিৎ পার্জিটার পুরাণগুলিতে বিভিন্ন রাজ-

২১। ছান্দোগ্য উপনিষদ। ৩।১৭।৬।

বংশের রাজাদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ৯৫০ অব্দে সংঘটিত হয়েছিল। (২২) অপর দিকে ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ব্রাহ্মণাদি শ্রুতির অঙ্গীভূত গ্রন্থে যে রাজবংশাবলীর বিবরণ আছে, তাকে ভিত্তি করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। (২৩) সুতরাং এই দুই পথে গবেষণাই আমাদের উপরের প্রতিপাদ্য সমর্থন করবে।

মহাভারতের ঘটনা যদি খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ঘটে থাকে, রামায়ণের ঘটনা তারও পূর্বে ঘটেছিল ধরতে হবে। উপরের দীর্ঘ আলোচনায় যে তথ্য স্থাপিত হয়েছে তার তাৎপর্য হল রামায়ণের কাহিনীর পরিবেশ মহাভারতের কাহিনীর পরিবেশ হতে প্রাচীনতর। রামায়ণের যুগে আর্যসংস্কৃতি ভারতের উত্তর অংশেই সম্পূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করেনি। মহাভারতের যুগে তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

বৈদিক সাহিত্যে সোজাসুজি রামের উল্লেখ না থাকলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিদেহরাজ জনকের দার্শনিক ঋষি যাজ্ঞবল্কের সহিত ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতার বিবরণ পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন ওঠে এই জনকই কি সীতার পিতা ছিলেন? রামায়ণের বালকাণ্ডের ৭১তম সর্গে জনক দশরথের নিকট তাঁর বংশের পরিচয় দিয়েছেন। নিমি হতে বিদেহের রাজবংশের উৎপত্তি। তাঁর পুত্রের নাম ছিল জনক। এই বংশেই তাঁর কুড়ি পুরুষ পরে সীতার পিতা জনকের জন্ম হয়। সুতরাং একই বংশে দুই জনকের আবিষ্কার হওয়ায় একটি বিভ্রান্তিকর অবস্থার

২২। Dynasties of the Kali Yuga, F. E. Pargiter।

২৩। Political History of Ancient India, H. C. Raychaudhuri।

সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, এই দুই জনকের কোন জন যাজ্ঞবল্ক্যের সমসাময়িক ছিলেন। কুড়ি পুরুষের ব্যবধান গাণিতিক হিসাবে ৫০০ বছর অতিক্রম করে। তাহলে নিমির পুত্র জনকের জন্মতারিখ খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে স্থাপন করতে হয়। অথচ আমরা দেখেছি ঋগ্বেদেরই তখন সবে রচনা আরম্ভ হয়েছে। উপনিষদ ত বৈদিক সাহিত্যের শেষের অংশের রচনা। কাজেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে রাজা দার্শনিক আলোচনার ব্যবস্থা করতেন বলে উল্লেখ আছে এবং যিনি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রিয় শিষ্য হয়েছিলেন তিনি নিমির পুত্র জনক হতে পারেন না। আমাদের কাজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় ইনি রামায়ণে বর্ণিত সীতার পিতা জনক। তার আর একটি সমর্থক প্রমাণ মিলবে। সীতার পিতা জনককে রাজর্ষি বলা হত। তিনি রাজা হয়েও আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় মনোনিবেশ করতেন বোঝা যায়। সুতরাং যে রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দার্শনিক আলোচনা করতেন তাঁকেই রাজর্ষি নামে ভূষিত করা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে জনকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁকে সীতার পিতা জনক রূপে চিহ্নিত করলে অযৌক্তিক হবে না।

এই সিদ্ধান্তের দুটি তাৎপর্য আছে। প্রথমত, তা দেখায় রামায়ণের অন্যতম চরিত্র রাজর্ষি জনক বৃহদারণ্যক উপনিষদ রচনাকালে বর্তমান ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তা প্রমাণ করে রামায়ণের এই চরিত্রটি ঐতিহাসিক চরিত্র।

সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে উপনিষদের যুগেই রামায়ণ তথা মহাভারতের কাহিনী সংঘটিত হয়েছিল। আমরা আগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে রামায়ণের কাহিনী মহাভারতের কাহিনী হতে প্রাচীনতর। সুতরাং রামায়ণের কাহিনীকে মহাভারতের কাহিনী হতে অন্তত একশত বৎসর পূর্বে স্থাপন করতে

হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বলা হয়ে থাকে যে রামায়ণের কাহিনী ত্রেতাযুগে ঘটেছিল এবং মহাভারতের কাহিনী দ্বাপর যুগে ঘটেছিল। আমরা একটি অতিরিক্ত তথ্য পাই যে ত্রেতা যুগে একটি মাত্র বেদ ছিল এবং দ্বাপর যুগে বেদ চার ভাগে বিন্যস্ত হয়। যিনি বেদের বিন্যাস করেন সেই ব্যাস ঋষি মহাভারতের কাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র।

এই প্রসঙ্গে আদিকাব্য রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্ত করে নেওয়া যেতে পারে। একটি ঐতিহাসিক কিংবদন্তী আছে যে পরীক্ষিতের রাজত্বকালে বেদব্যাস বেদগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। তা হলে ধরতে হয় মহাভারতের জন্মকাল খৃষ্ট পূর্ব দশম শতাব্দী। অবশ্য মহাভারত সংযোজন দ্বারা পুষ্টি সঞ্চয় করে কয়েকশত বৎসর ধরে গড়ে উঠেছিল। তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে বিষয় করে যে মূলকাহিনীটি আছে তা আরম্ভকালেই রচিত হয়েছিল। সত্যবতীর কানীন পুত্র ব্যাস যে সমগ্র মহাভারত রচনা করেছিলেন তা ধরে নেওয়া বাস্তব বলে মনে হয় না। কারণ, আমরা পূর্বে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ঘটেছিল; অথচ এমন তথ্য পাওয়া যায় যা ইঙ্গিত করে যে মহাভারতের বিরাট অংশ তার পরে রচিত হয়েছিল।

সেই তথ্যটি হল এই। যাস্ক রচিত নিরুক্তে স্বায়ম্ভুব মনুর উল্লেখ আছে। যাস্ককে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং সংহিতাকার মনুকে যাস্কের সমসাময়িক ধরা যেতে পারে। মহাভারতে মনুসংহিতা হতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে মনে হয়। সেই অংশগুলি তা হলে মনুসংহিতার পরে রচিত হয়েছে ধরা যায়। তবে তা হতে একথা প্রমাণিত হয় না যে মহাভারতের প্রথম রচিত অংশটি মনুর পরে রচিত। বিরাট মহাভারত গ্রন্থ শত শত বৎসর জুড়ে সংযোজনের ফলে গড়ে উঠে তার বর্তমান আকার ধারণ

করেছে। সংযোজনের সাহায্যে যে মহাভারত ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করেছে তা মহাভারতের বিভিন্ন অবস্থায় যে বিভিন্ন নাম ছিল তাঁর দ্বারা সূচিত হয়। একেবারে আদি রূপে তার নাম ছিল 'জয়'। পরবর্তীকালে ভারতবংশের কাহিনী বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হলে তার নাম হয় 'ভারত'। আরও পরে যখন তার সঙ্গে বিভিন্ন উপাখ্যান এবং ধর্মশাস্ত্র আলোচনা যুক্ত হয়ে তা বর্তমান বিরাট আকার ধারণ করে তখন তার নাম হয় 'মহাভারত'। সুতরাং এমনও হতে পারে যে মহাভারতের আদি মূল অংশ যা 'জয়' নামে অভিহিত ছিল, তা পাণ্ডবদের সমসাময়িক ঋষি ব্যাস রচনা করে থাকতে পারেন।

রামায়ণ সম্পর্কে দাবী করা হয় তা আদিকবি বাল্মীকি দ্বারা রচিত। তিনি যে রামের সমসাময়িক ছিলেন তার প্রমাণ রামায়ণেই আছে। রাম যে সীতা সহ বাল্মীকির আশ্রমে গিয়েছিলেন তারও উল্লেখ আছে। সে ক্ষেত্রে রামায়ণের ঘটনার অব্যবহিত পরেই যে তার মূল অংশ রচিত হয়েছিল, তা ধরে নেওয়া অসঙ্গত হবে না। অবশ্য রামায়ণেও সংযোজন ঘটেছিল। তাতেও অনেক উপাখ্যান সংযুক্ত হয়েছে। এই সংযোজিত অংশগুলি রামায়ণের ঘটনার বহুকাল পরে সংযুক্ত হয়ে থাকবে। তবে মূল অংশ বাল্মীকি রচিত এবং তা রামায়ণের ঘটনার সময়েই রচিত হয়েছিল ধরে নেওয়া যায়।

সে ক্ষেত্রে মহাভারতের মূল অংশ (যা 'জয়' নামে অভিহিত ছিল) যদি খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়ে থাকে, তা হলে রামায়ণের মূল অংশ আরও একশত বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল ধরতে হবে। কারণ, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে রামায়ণের কাহিনী মহাভারতের কাহিনীর শত বৎসর আগে ঘটেছিল।

পশ্চিমের ভারত তত্ত্ববিদগণ কিন্তু রামায়ণের রচনা কালকে এত পেছনে ঠেলতে সম্মত নন। যিনি এ বিষয় সব থেকে অনুকূল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তিনি হলেন জাকবি। তিনি বলেন রামায়ণের রচনাকালকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে স্থাপন করা যায়। (২৪) তাঁর এই প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধে আমরা তিনটি নির্ভর-যোগ্য তথ্যের উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, রামায়ণের ঘটনাকে বৃহদারণ্যক উপনিষদের রচনাকালের সমসাময়িক ধরা যায়। কারণ বিদেহ রাজ জনকের তাতে উল্লেখ আছে এবং খুব সম্ভব তিনিই সীতার পিতা ছিলেন। দ্বিতীয়ত, রামায়ণের মূল অংশ আদিকবি বাল্মীকি রচিত বলে জনশ্রুতি আছে। তৃতীয়ত, রামায়ণের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হতে পাই বাল্মীকি রামের সমসাময়িক ছিলেন। এক্ষেত্রে রামায়ণের আদিরূপের রচনাকালকে খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্থাপন করা যায়।

২৪। Jacobi, A History of Indin's Literature, Vol. I P. 516—17

তৃতীয় অধ্যায়

রামায়ণের সংযোজিত অংশ

(১)

রামায়ণে সংযোজনের প্রমাণ

পূর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আংশিক ভাবে রামায়ণে সংযোজন ঘটেছিল কিনা, সেই প্রশ্নের সহিত জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায়, তার এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আমরা পূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে মহাভারতে ব্যাপক আকারে সংযোজন হয়েছিল। ঠিক বলতে কি তা সংযোজনকে আশ্রয় করেই তার বর্তমান বিরাট আকার লাভ করেছে। সে সংযোজন মূল অংশ রচনার পর হতেই সুরু হয় এবং পুরাণগুলি রচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এই সংযোজন প্রক্রিয়া চলে। মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে সংযোজন কম পরিমাণে মূল রচনার সহিত যুক্ত হয়েছে। সেই কারণেই তার আকার তুলনায় ছোট। মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা আশি হাজারের অধিক, আর রামায়ণের শ্লোক সংখ্যা চব্বিশ হাজার। তবু রামায়ণের মধ্যে সংযোজনের পরিমাণ কম নয়।

রামায়ণে যে সংযোজন হয়েছিল, তার প্রমাণ রামায়ণের মধ্যেই পাওয়া যায়। যে সব বিভিন্ন তথ্য এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায়, সেগুলি যথাস্থানে আলোচিত হবে। তবে প্রথমেই একটি তথ্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সংস্কৃত রামায়ণের দুটি পৃথক সংকলন পাওয়া যায়ঃ বোম্বাই এর সংকলন এবং গৌড়ের, অর্থাৎ বাংলাদেশের সংকলন। বোম্বাই সংকলনের শ্লোক সংখ্যা

২৪,৫২৮ ; কিন্তু গৌড়ীয় সংকলনের শ্লোক সংখ্যা হল ১৯,৭৯৩। বোম্বাই এর সংকলনে সাতটি কাণ্ড আছে। গৌড়ের সংকলনে আদিকাণ্ড বা বালকাণ্ড আছে ; কিন্তু উত্তরকাণ্ড নাই। অভয়ঙ্করের মতে হস্তলিখিত পুঁথিতে আদিকাণ্ড ছিল, কিন্তু খুব সম্ভব পরে হারিয়ে গেছে। মনে হয় তাঁর অনুমান সত্য ; কারণ, গৌড়ীয় সংকলনের বালকাণ্ডে যা হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে যে রামায়ণের মোট শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০। অর্থাৎ বোম্বাই সংকলনে উত্তরকাণ্ড নিয়ে যে শ্লোকসংখ্যা দেখান হয়েছে তার সমান।

সে যাই হোক আদি ও উত্তরকাণ্ড আদৌ ছিল কিনা, এ বিষয় সন্দেহ জাগায় এমন মন্তব্য রামায়ণেই পাওয়া যায়। উত্তরকাণ্ডের শেষে আছে, রামের প্রশ্নের উত্তরে কুশ ও লব এই কথা বলছেন :

সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশ সহস্রকম্।
উপাখ্যানশতংচৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা ॥
আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গ শতানি চ।
কাণ্ডানি ষট্ কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা ॥ (১)

অর্থাৎ তপস্বী ভার্গব কর্তৃক একশত উপাখ্যান সহ চব্বিশ সহস্র শ্লোক রচনা করেছিলেন। আদি প্রভৃতি এবং উত্তরকাণ্ডসহ সেই মহাত্মা ছয়টি কাণ্ড এবং পাঁচশত সর্গ রচনা করেছিলেন। বাল্মীকি ভৃগুর পুত্র বলে তাঁর আর এক নাম ভার্গব।

সুতরাং এখানে বলা হয়েছে যে বাল্মীকি যে আদিকাব্য রচনা করেছিলেন তার আদি হতে উত্তর পর্যন্ত ছয়টি কাণ্ড আছে, একশত উপাখ্যান আছে, পাঁচশত সর্গ আছে এবং চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে। তা হলে এই হিসাবে সাতটি কাণ্ড ত মিলল না। এ দিকে

১। উত্তরকাণ্ড। ৯৪। ২৬—২৭

পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে যে রামায়ণ ছয়টি কাণ্ডে সমাপ্ত। (২) বলা হয়েছে 'চতুর্বিংশতি সহস্রং ষট্ কাণ্ডপরিচিহ্নিতম্'। সুতরাং হিসাবে একটি কাণ্ড কম পড়ে যাচ্ছে।

সে যাই হোক বর্তমানে রামায়ণকে যে অবস্থায় পাই তার মধ্যে কতকগুলি অসঙ্গতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামায়ণ কাহিনী আদিকবি বাল্মীকি কর্তৃক রচিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতিও আছে, রামায়ণের মধ্যেও তা দাবী করা হয়েছে। তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সূচিত করে যে তা এক শক্তিমান কবির একক চেষ্টায় রচিত। সে ক্ষেত্রে মূল কাহিনীতেই তা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু আমরা দেখি বহু কাহিনী তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। সাতটি কাণ্ডের মধ্যে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডে উপাখ্যানের অত্যন্ত বেশী পরিমাণ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অথচ দেখা যায় অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডে উপাখ্যান বিশেষ নাই। রামায়ণের আদিরূপে এগুলি না থাকাই সম্ভব। এদিকে মূল রামায়ণে ছয়টির বেশী কাণ্ড ছিল কিনা, তা সন্দেহের বিষয়। এক্ষেত্রে সপ্তম কাণ্ড যা উত্তরকাণ্ড নামে চিহ্নিত তা আদিরূপে ছিল না বলে মনে হবে।

দ্বিতীয়ত দেখি রামায়ণের মূল চরিত্র রাম একজন অনন্য-সাধারণ মানুষ। একটি মহৎ আদর্শদ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত। সত্যের প্রতি তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। তাঁর চরিত্রের মধ্যে বহুগুণের সমাবেশ ঘটেছে। বীর্য, পত্নীপ্রেম, কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা, প্রজারঞ্জনে অনুরাগ—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সর্বত্র তিনি একটি অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক মানুষ রূপেই চিত্রিত। অথচ নানা কৌশলে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে রামায়ণের নানা অংশে নানা সংযোজন অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ফলে গ্রন্থের মধ্যে একটি মৌলিক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে।

২। পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড, ৩৭ অধ্যায়

বালকাণ্ডের প্রথমেই তার প্রমাণ মিলবে। তার ষোড়শ সর্গে পাই দেবতারা রাবণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছেন যে তিনি দশরথের বংশে রামরূপে অবতীর্ণ হয়ে রাবণকে বধের ব্যবস্থা করুন। স্বয়ং বিষ্ণুকে কেন নরদেহ ধারণ করতে হবে তার কারণ হিসাবে এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী স্থাপিত হয়েছে। ব্রহ্মা নাকি রাবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এই বর দিয়ে ফেলেছিলেন যে রাবণকে নর ও বানর ভিন্ন অন্য কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সত্তা বধ করবার ক্ষমতা রাখবেন না। কাজেই কোনও দেবতা তাঁকে দেবতারূপে বধ করতে পারবেন না। সেই কারণেই বিষ্ণুকে মানুষরূপে সংসারে অবতীর্ণ হতে হবে।

সুতরাং দেবতাদের রাবণের অত্যাচার হতে পরিত্রাণ করবার জন্য বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে সম্মত হলেন। রাবণের বধে সাহায্যের জন্য অন্য দেবতারাও বানরদের নেতারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এইভাবে সূর্যের পুত্র সুগ্রীবরূপে অবতীর্ণ হলেন এবং ইন্দ্রের পুত্র বালীরূপে অবতীর্ণ হলেন। রাবণের সহিত যুদ্ধ করতে সৈন্যের প্রয়োজন। তাই অন্য দেবতাগণ অপ্সরা, গন্ধর্বী, ঋক্ষ, কিন্নরী এবং বানরীতে পুত্র উৎপাদন করলেন। এই সঙ্কর পুত্রগণই যথাসময় সুগ্রীবের বাহিনী গড়ে তুলেছিল এবং যথাসময় রাবণের সহিত যুদ্ধে রামের সহায়তা করেছিল। এই সব ব্যবস্থাই রাবণ বধের প্রস্তুতি হিসাবে। বলা বাহুল্য এই কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য দশরথ পুত্র রামকে বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

শুধু তাই নয়, রামায়ণের নানা স্থানে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের আবির্ভাব ঘটেছে এবং নানা সূত্রে রামকে অবতাররূপে স্থাপন করবার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেই চলবে। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে আছে যে রাবণের সহিত যুদ্ধের অবসান ঘটলে রাম যখন সীতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন,

তখন সীতা ক্ষোভে এবং অভিমানে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই সময় মহাদেব এবং ব্রহ্মাসহ দেবগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন রাম তাঁদের আত্ম-পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি দশরথের পুত্র একজন মানুষ। (আত্মানং মানুষং মন্যে) আপনারা কে? উত্তরে ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গীদের পরিচয় দিয়ে তারপর প্রতিবাদ করে বললেন, রাম মানুষ নয়; তিনি হলেন স্বয়ং বিষ্ণু এবং সীতা হলেন লক্ষ্মী। (৩)

এইভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিনটি দেবতার ভূমিকাও রামায়ণের একটি বড় অংশ জুড়ে বসেছে। আমরা জানি রামায়ণের কাহিনীর পরিবেশ বৈদিক সংস্কৃতি। তখন যে দেবতাগুলি স্বীকৃত হতেন তাঁরা নানা প্রাকৃতিক শক্তির আধার। এই শক্তিগুলির উপর মানবোচিত আচরণ আরোপ করে তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হত। তাঁদের ওপর মানবরূপ আরোপিত হত না। তাঁদের অধিষ্ঠান পৃথিবীতে বা অন্তরীক্ষে বা ঊর্দ্ধাকাশে; কারণ তাঁরা মূলে নানা প্রাকৃতিক শক্তি। পরবর্তী কালে পৌরাণিক যুগে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ভিত্তিক ধর্ম বর্জিত হয়ে বিশেষ বিশেষ দেবতার বিগ্রহ স্থাপন করে নানা সেবামূলক আচরণের দ্বারা তাঁদের পূজা নিষ্পন্ন হত। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তাঁরা সকলেই মানুষের গুণ দ্বারা ভূষিত। তাঁরা মানুষের মত ঘর-সংসার করেন। তাঁরা ভিন্ন যুগের দেবতা। এ যুগে যজ্ঞ নয়, বিশেষ দেবতার পূজা করে তাঁর কাছে নানা প্রার্থনা জানান হয়। এই ধরনের সংযোজনের ফলে রামায়ণের মধ্যে একটি অসঙ্গতি এসে পড়েছে। বৈদিক যুগের পরিবেশের সঙ্গে যেন পৌরাণিক যুগের পরিবেশ মিশ্রিত হয়ে গেছে। এই অসঙ্গতি কেমন করে ঘটল তা বুঝতে, বিভিন্ন বৈদিক দেবতার স্থানে হিন্দুর চিন্তায় কি ভাবে

৩। রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড। ১১৭ সর্গ।

পৌরাণিক দেবতার আবির্ভাব হল, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

(২)

রামায়ণের কাহিনীর দুটি স্তর

ভারতে হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। তার প্রথম রূপটি পাওয়া যায় বেদের যুগে। তখন বেদের ঋষি প্রকৃতির মধ্যে যেখানে কোনও শক্তি বা সৌন্দর্যের বিকাশ দেখেছেন, সেখানে তার ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। এইভাবে অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এসেছেন। তাঁদের উদ্দেশে বেদের সংহিতা অংশে নানা সূক্ত রচিত হয়েছে। সেগুলি প্রধানত আর্ত ও অর্থার্থী মনোভাব প্রণোদিত। অর্থাৎ বিশেষ দেবতার মহিমা কীর্তন করে তাঁর কাছে বিপদ হতে ত্রাণ বা বাসনা পূরনের প্রার্থনা নিবেদনই এই সূক্তগুলির বিষয়। অগ্নিতে ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দিয়ে তাঁদের আহ্বান করে সেকালে এই সূক্তগুলি পঠিত হত বা আবৃত্তি করা হত বা সুরসংযোগে গাওয়া হত। বৈদিক যুগে তাই ছিল ধর্মের আনুষ্ঠানিক রূপ।

কিন্তু ঋগ্‌বেদ শুধু স্তোত্র রচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তাতে দার্শনিক চিন্তারও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। যে প্রশ্নটি ঋষির মনে উদয় হয়েছিল তা হল এতগুলি দেবতা কি সকলেই সমান? কেউ বড় নেই যার কাছে হবি উৎসর্গ করা বেশী সার্থক হবে? তখন ঋষি বললেন 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঋষির মনে একটি অতিদেবতার কল্পনা এসেছে। কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ তা আবিষ্কারের চেষ্টায় তাঁরা এই সম্মানে ভূষিত করবার জন্য বরুণকে নির্বাচিত করেছেন। কারণ, তাঁর সুমহতী

প্রজ্ঞা আছে (৪), তিনি সমস্ত ভুবন সমূহের ধারক এবং আমরা তাঁর ক্রোড়ে আশ্রিত। (৫)

কিন্তু ঋষি এই পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি বিশ্বের মূল শক্তির অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন। সেই পথেই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিশ্বদেবতার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। তখন সকল দেবতাকে একসঙ্গে করে তাঁদের জন্য স্তুতি রচিত হয়েছে। এই চিন্তার পথে তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন দেবতা ত বহু নয়, দেবতা একই; আমরা একই দেবতাকে ভিন্ন নাম দিয়ে ডাকি। তিনি বলেছেন, একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। (৬) ইনি এক হলেও তাঁকে বহুভাবে বর্ণনা করা হয়; এঁকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলে।

বেদের ঋষি আরও এগিয়ে গেছেন। তাঁর ধারণা মূল সত্তা শুধু বিভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশ হননি, তিনি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে আছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অনেকগুলি সূক্তে আমরা এই তত্ত্বের আলোচনা পাই। সেখানে দেখি বিশ্বের মৌলিক সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। একটি চিন্তা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী সত্তারূপে কল্পনা করেছে। তা সর্বেশ্বরবাদের অভিমুখে গেছে। অন্য চিন্তাটি একেশ্বরবাদের দিকে প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তা একটি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ঈশ্বরের আবিষ্কার করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকর্মা সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। (৭) সেখানে বলা হয়েছে, তিনি দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি বিধাতা, তিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা ইত্যাদি। এই ধারাটিই

৪। ঋগ্বেদ। ৫।৮৫।৩

৫। ঋগ্বেদ। ৮।৫২।২

৬। ঋগ্বেদ। ১।৬৪।৪৬

৭। ঋগ্বেদ। ১০।৮২

পরবর্তী কালে পরের যুগে ভক্তিবাদী দর্শনগুলিতে বিকাশ লাভ করে।

অপর চিন্তাটি বৈদিক যুগেই উপনিষদের আশ্রয়ে বিকাশ লাভ করে ব্রহ্মতত্ত্বে পরিণত হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ঋগ্‌বেদে একেশ্বরবাদের অভিমুখী যে চিন্তাধারা পাই তার কিন্তু বিকাশ লাভ করতে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শ্রুতির যুগে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তার পরবর্তী-কালে ষড়্‌দর্শনের যুগেও জ্ঞানমার্গই মুক্তির উপায় বলে বিবেচিত হওয়ায় একেশ্বরবাদের বিকাশ লাভ করবার সুযোগ ঘটেনি। তারও পরে হিন্দুর মনে ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে তাঁর প্রতি ভক্তি নিবেদনের আকৃতি অবশেষে প্রবল হয়ে উঠল। এই অনুকূল পরিবেশ পেয়ে ঋগ্‌বেদে উদ্ভূত একেশ্বরবাদের বীজ হতে হিন্দুধর্মে প্রথমে একেশ্বরবাদ এবং তারও পরে অবতারবাদের বিকাশ লাভের সুযোগ ঘটে।

এই পথে প্রথম পদক্ষেপ হল ত্রিমূর্তির পরিকল্পনা। সৃষ্টির প্রসঙ্গে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের তিনটি মৌলিক ভূমিকা স্বীকৃত হয়ঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়। এই তিন ভূমিকার জন্য তিনটি পৃথক ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট শক্তির পরিকল্পনা হিন্দুর চিন্তায় আবির্ভূত হয়। এই পথেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন মূল দেবতার আবির্ভাব হয়। সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই পরিকল্পনা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ভক্তিবাদের পথে পরের পদক্ষেপ হিসাবে দেখি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর পৃথক দেবতা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

আমরা লক্ষ্য করতে পারি এই তিন দেবতাকেই তিনটি বৈদিক যুগের দেবতার রূপান্তর ঘটিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। বেদে ব্রহ্মা নামে কোনো দেবতা নাই, কিন্তু ব্রহ্মণস্পতি নামে এক বৈদিক

দেবতা আছেন। বেদের সংহিতা অংশে ব্রহ্ম অর্থে বোঝাত মন্ত্র। পরবর্তীকালে উপনিষদে বিশ্বের মূল সত্তাকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হত। ব্রহ্মণস্পতি হলেন মন্ত্রের দেবতা। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে ব্রহ্মণস্পতি মন্ত্রসমূহের অধিপতি। (৮) মনে হয় এই ব্রহ্মণস্পতিই ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা ব্রহ্মাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর কল্পিত রূপটির উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর চারটি মাথা কল্পিত হয়েছে; তাঁর আর এক নাম চতুরানন। বৈদিক সূক্তগুলি চারটি বেদে বিন্যস্ত হয়েছিল আমরা জানি। সেই চার বেদের প্রতীকরূপে তাঁর চারটি আনন পরিকল্পিত। ব্রহ্মারূপে তাঁর ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে গেল। ত্রিমূর্তির প্রথম দেবতা হিসাবে তিনি বিশ্বের স্রষ্টারূপে চিহ্নিত হলেন।

ঋগ্‌বেদে সূর্য একটি মূল দেবতা। তাঁকে সবিতাও বলা হয়, বিষ্ণুরূপেও চিহ্নিত করা হয়। প্রাত্যহিক আকাশ পরিক্রমণে সূর্য তিনটি স্থানে অধিষ্ঠিত হন। প্রাতঃকালে তিনি পূর্বগগনে উদিত হন, মধ্যাহ্নে তিনি আকাশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করেন এবং সায়াহ্নে তিনি পশ্চিম গগনে এসে অস্তগমন করেন। সুতরাং কল্পনা করা হয় তিনি তিন পদক্ষেপে সমগ্র আকাশ পথ অতিক্রম করেন। তাঁর এই ভূমিকায় তাঁকে বিষ্ণু নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি দীর্ঘ পদক্ষেপে এই পথ অতিক্রম করেন বলে তাঁর নাম হয়েছে 'বিষ্ণু উরুক্রমা'। (৯) এই বিষ্ণুই পরবর্তীকালে ত্রিমূর্তির দ্বিতীয় দেবতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর নাম অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

তারপর আসেন তৃতীয় দেবতা মহেশ্বর। মনে হয় বেদের দেবতা রুদ্রেরই তিনি রূপান্তর। রুদ্র রোষপরায়ণ দেবতা। কাজেই যে দেবতাকে সৃষ্টিকে ধ্বংস করবার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তাঁর সঙ্গে

৮। ঋগ্‌বেদ। ২। ২৩। ১

৯। বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। ঋগ্‌বেদ। ১। ২২। ৬৭

রুদ্রের চরিত্র সঙ্গতি রক্ষা করে। কিন্তু ভক্তিবাদের যুগে তাঁর চরিত্রের কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। তাঁকে শিব বলা হয়; কারণ তিনি অল্পে সন্তুষ্ট। সামান্য বিল্বপত্র দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায়। তাঁকে শৈবশাস্ত্রে পশুপতি বলা হয়েছে। পশু অর্থে এখানে মানবাত্মা। তাদের সংসার বন্ধন হতে তিনি মুক্তি দেন বলে তিনি পশুপতি। অতিরিক্তভাবে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর অঙ্গীভূত যে শক্তি আছে তাকে পৃথক ভাবে নারী দেবতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের ঘনিষ্ঠতা সূচিত করতে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি পরিকল্পিত যার প্রতীক হল গৌরীপট্ট সম্বলিত শিবলিঙ্গ।

অনেকের ধারণা হরাপ্পা সংস্কৃতি হতে শিব ও শক্তিরূপী যুগ্মদেবতার ধারণা গড়ে উঠেছে। তার ভিত্তি হল হরাপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে যে পোড়ামাটির ফলকে মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে তাই। সেখানে অনেক মাতৃত্বের লক্ষণে সমৃদ্ধ ছোট ছোট পোড়ামাটির মূর্তিও পাওয়া গেছে। তাঁদের ধারণা এইগুলি হতে অনুমান করা যায় যে এই প্রাগার্য সংস্কৃতি নারীদেবতার উপাসক ছিল। দ্বিতীয়ত একটি ফলকে নানা পশুপরিবৃত একটি মনুষ্যমূর্তি পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা তা হতে পশুপতি শিবের পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে।

এগুলি কেবল সম্ভাব্যতা ইঙ্গিত করে, এই মতগুলিকে প্রমাণিত সিদ্ধান্ত বলে স্থাপন করবার ক্ষমতা রাখে না। বরং শিব ও শক্তির পরিকল্পনা বৈদিক যুগের দেবতা দ্বারা বা ষড়দর্শনের যুগের দার্শনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। পূর্বেই বলা হয়েছে শৈব দর্শনে শিবকে পশুপতি বলা হয় এই অর্থে যে মানব আত্মারূপী পশুদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। বাঘ বা অন্য পশুদ্বারা পরিবৃত মূর্তিটি প্রাকৃতিক পশুর সহিত সম্পর্কিত। তাদের ঐ প্রাচীন যুগে মানব-আত্মার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে

ভাবতে গেলে রীতিমত কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়।

দ্বিতীয়ত এখনি বলা হয়েছে যে শিব ও শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্তরূপে হিন্দুর ধারণায় গড়ে উঠেছেন। হরাপ্পা সংস্কৃতির যে নারী মূর্তিগুলি পাওয়া যায় তারা দেবীমূর্তি নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত সেগুলির সঙ্গে যে পশুপরিবৃত পুরুষ মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রচ্ছন্ন বা বাহ্যিক সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং এক্ষেত্রে সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের সঙ্গে পার্বতী—পরমেশ্বরের সাদৃশ্য বেশী পাওয়া যায়। সৃষ্টির ব্যাখ্যা হিসাবে এই দর্শনে বলা হয়েছে পুরুষের বা ব্যক্তি-আত্মার সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সন্নিধি ঘটলে প্রকৃতি নিজেকে দৃশ্যমান বিশ্বরূপে পরিবর্ত্তিত করে। উভয়ের সংযোগই সৃষ্টির ব্যাখ্যায় মৌলিক হেতু। এক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে শিব-শক্তির পরিকল্পনা সাংখ্যদর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

সে যাই হক, আমরা দেখি এই তিন দেবতার মধ্যে পরবর্ত্তী-কালে ব্রহ্মা তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। ঠিক বলতে কি বর্তমানে তিনি বিশেষ পূজিত হন না। নানা পুরাণে তাঁকে যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

অপর পক্ষে মহেশ্বর শিব ও শক্তিরূপে যুগ্ম বা একক দেবতার আকারে ঐকান্তিক সমাদর সহ পূজিত হয়ে এসেছেন। শক্তি অংশ রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্গা রূপে তিনি এক অতি জনপ্রিয় দেবতা। বিষ্ণুও বিশেষ সমাদর লাভ করেছেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণু সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তালাভ করেছেন। দুটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মানুষকে পরবর্তীকালে তাঁর অবতার রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন রামায়ণ কাহিনীর নায়ক রাম এবং মহাভারত কাহিনীর অন্যতন বিশিষ্ট চরিত্র কৃষ্ণ। এই দুটি অবতার রূপে বিষ্ণু সব থেকে বেশী জনপ্রিয় দেবতা। কৃষ্ণ তুলনায় বেশী জনপ্রিয়। এমন কি

ভক্তিবাদী দর্শনগুলি তাঁকে ঈশ্বরের সমস্থানীয় রূপে গ্রহণ করেছেন। এইভাবে ভক্তিবাদের সুরু হয় ত্রিমূর্তি পরিকল্পনা দিয়ে এবং শেষ হয় ঐতিহাসিক চরিত্র রাম ও কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

এখন অবতারবাদের প্রতিষ্ঠা ভারতের ইতিহাসে কখন হয়, সে বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয় দুটি তথ্য বিশেষ আলোকপাত করবে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় গ্রীক রাজা সেলুকাসের দূত হিসাবে মেগাস্থিনিস কিছুকাল ভারতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর এই সময়কার লব্ধ অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ রেখে গেছেন যা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের নানা নির্ভরযোগ্য তথ্যের আকরগ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর এই বিবরণীতে তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে সুরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের মানুষ 'গ্রীক বীর হেরাক্লসকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত ; এবং, তাঁর সহিত বাসুদেব কৃষ্ণের সাদৃশ্য আছে।' (১০) এটিকে অনেকে এই কথা প্রমাণ করতে ব্যবহার করেন যে মেগাস্থিনিসের সময় কৃষ্ণ অবতার রূপে স্বীকৃত লাভ করেছেন। কিন্তু যেটুকু পাই তা হতে এমন সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে বলে মনে হয় না। বাসুদেব কৃষ্ণ যে সে সময় মথুরাবাসীর নিকট একজন জনপ্রিয় পুরুষ ছিলেন, এইটুকুই মাত্র তা প্রমাণ করে। হেরাক্লস গ্রীসে দেবতারূপে পূজিত হতেন না ; অসাধারণ শারীরিক শক্তি ধারণ করতেন বলেই তাঁর খ্যাতি। তা ছাড়া প্রাচীন গ্রীকরা অবতার বাদে বিশ্বাসী ছিলেন না।

আর একটি তথ্য পাওয়া যায়, যা মনে হয় আরও নির্ভরযোগ্য। বেসনগরে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি মন্দির পাওয়া যায়। তার কাছে স্থাপিত একটি স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ একটি লেখা পাওয়া যায়।

১০। History and Culture of Indian People, Vol. II. The Age of Imperial Unity.

তা বলে রাজা এনটিয়ালকাইডাসের গ্রীক দূত হেলিয়োডোরাস দেবাদিদেব বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। এর ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে অবতারবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই অনুমান যুক্তি সম্মত ; কারণ, শিলালিপিতে স্পটই উল্লেখ আছে যে বাসুদেব কৃষ্ণ তখন অবতাররূপে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। এই তথ্যটিকে নিশ্চিতভাবে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

এখন মনে রাখতে হবে যে আগে বিষ্ণু দেবতা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন; তবে তাঁর অবতারদের পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। তার সম্ভাব্য সময়টিও এই প্রসঙ্গে নির্ণয় করে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ বিষয় নির্ভরযোগ্য কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তবে প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর নির্ভর করে একটি যুক্তি-সম্মত অনুমানে আসা যায়। ভারতের দার্শনিক তথা ধর্মসম্পর্কিত চিন্তায় কয়েটি স্তর পাওয়া যায় ঃ শ্রুতির স্তর, ষড়দর্শনের স্তর এবং পৌরাণিক স্তর। এই তিনটিকে শ্রুতি প্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান এবং স্মৃতিপ্রস্থানও বলা হয়ে থাকে। শ্রুতির স্তরে বহু দেবতাবাদ হতে উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় চিন্তা ব্রহ্মবাদে উপনীত হয়েছিল। এই ব্রহ্ম বিশ্ব ব্যাপী এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে পরিকল্পিত। দর্শনের পরিভাষায় তাকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়।

তারপর ষড়্‌দর্শনের যুগেও ভারতীয় দর্শন চিন্তামার্গে বিশ্বরহস্য ভেদ করবার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। তারই ফলে ছয়টি হিন্দু দর্শন গড়ে উঠেছিল। এখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে চিন্তা ছিল না তা নয় ; তবে সে চিন্তা তেমন শক্তিমতী ছিল না। ছয়টি দর্শনের মধ্যে চারটি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন তোলে নি। যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত ; কিন্তু সেখানেও পুরুষ ও প্রকৃতি মূল-তত্ত্ব, ঈশ্বর অন্য গৌণ তত্ত্বগুলির একটি তত্ত্ব। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের

অস্তিত্বের প্রশ্ন কেবল উত্থাপিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে তার সপক্ষে কিছু যুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার অবকাশ পাননি।

তারও পরে ত্রিমূর্ত্তি পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে প্রকৃত একেশ্বর-বাদ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট একক ঈশ্বরের গুণ বিষ্ণু বা মহেশ্বরের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং এই রকম অনুমান করা যেতে পারে যে ষড়্‌দর্শন রচনা এবং অবতারবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোনও সময় ভারতীয় চিন্তায় একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই বলা যায় যে বৈদিক যুগের পরিবেশের সঙ্গে অবতারবাদের চিন্তার পরিবেশের সময় অনুপাতে ব্যাবধান বেশ কয়েক শত বৎসর। অবতার বাদের চিন্তা পুরাণের যুগে প্রচারলাভ করেছিল বলে তাকে স্মৃতি প্রস্থান বলা হয়।

সুতরাং দেখা যায় রামায়ণের কাহিনীতে দুটি বিভিন্নস্তরের চিন্তার একত্র সমাবেশ ঘটেছে। শ্রুতিপ্রস্থানের সঙ্গে স্মৃতিপ্রস্থান মিশে গিয়েছে। একটি বৈদিকযুগের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভিত্তিক ধর্ম। অপরটি ভক্তির যুগের তিন মূলদেবতা এবং তাঁদের অন্যতম দেবতা বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃত দেবতার পূজায় অনুপ্রাণিত ধর্ম। সুতরাং অনায়াসে অনুমান করা যায় যেসব অংশে রামায়ণে এই তিন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে সেগুলি পরবর্ত্তী কালের সংযোজন। এই সংযোজনের উদ্দেশ্য কি তা সহজেই অনুমান করা যায়। যেহেতু চরিত্রগুণে রাম এক আদর্শ অসাধারণ-ভাবে জনপ্রিয় মানুষ রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা হেতু তাঁকে বিষ্ণুর অবতার রূপে কল্পনা করে দেবত্বে উন্নীত করবার চেষ্টা হয়েছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাই তার প্রেরণা। সেই কারণেই রামায়ণের মধ্যে এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং যে সব অংশে এই পৌরাণিক দেবতাগুলির বিষয় আলোচনা

আছে সেগুলি যে পরবর্তীকালের সংযোজন, তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। আদিকবি বাল্মীকি নিশ্চিত এগুলি রচনা করেন নি।

(৩)

রামায়ণে উপখ্যানের সংযোজন

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডেই বলা হয়েছে যে তাতে একশত উপাখ্যান আছে। আদি কবি বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করেন তখন উপাখ্যানগুলি না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। তাঁর রচিত কাব্যে ধারাবাহিক কাহিনী হিসাবেই রামের কথা বর্ণিত হওয়া স্বাভাবিক। অথচ দেখা যায় পরিণত রূপে তাতে একশত কাহিনী সংযুক্ত হয়ে তার কলেবর বৃদ্ধি করেছে। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে আদিকাণ্ডে এবং উত্তরকাণ্ডেই উপাখ্যানগুলি বেশী সংখ্যায় সংযুক্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। বাল-কাণ্ডে যে উপাখ্যানগুলি স্থান পেয়েছে, তাদের মধ্যে আছে কুশনাভের কাহিনী, ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী, গঙ্গার উৎপত্তি, কার্তিকের জন্মকথা, সগর রাজার কাহিনী, ক্ষীরসাগর মন্থন কাহিনী, বশিষ্ট ও বিশ্বা-মিত্রের বিবাদের কাহিনী এবং সেই প্রসঙ্গে ত্রিশঙ্কু ও সুনঃশেপের কাহিনী। এদের অনেকগুলির প্রকৃতি মূল কাহিনী হতে এত পৃথক যে তাদের উত্থাপন প্রাসঙ্গিক ভাবেও যুক্তিযুক্ত হয়না। এই প্রসঙ্গে কার্ত্তিকের উৎপত্তির কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। তা অগ্নিপুরাণে যে কাহিনী স্থাপিত হয়েছে তারই অনুসরণে লিখিত। রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে কার্তিকের জন্ম কাহিনীর কোনও প্রাসঙ্গিক সংযোগ নাই। সাগর মন্থন কাহিনীর সম্পর্কেও অনুরূপ অভিযোগ আনা যায়। ঠিক বলতে বিশ্বামিত্রের মহর্ষিরূপে স্বীকৃতি প্রাপ্তির

সুদীর্ঘ কাহিনীর রামকাহিনীর সঙ্গে কোনও স্বাভাবিক সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না।

উত্তরকাণ্ডের মধ্যেও অনুরূপ অনেক উপাখ্যান স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে অনেকখানি স্থান জুড়ে রাবণের পূর্বকাহিনী স্থাপিত হয়েছে। তাঁর জন্মকাহিনী, তাঁর স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অভিযান, কুবেরের কাছ হতে পুষ্পকরথ অপহরণ প্রভৃতি বিস্তারিত বৃত্তান্তের রামায়ণে স্থান পাবার কোনও যুক্তিযুক্ততা পাওয়া যায় না। একই মন্তব্য হনুমানের উৎপত্তিকাহিনী সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আরও কতকগুলি কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ শম্বুকবধ কাহিনী, লবণাসুরবধ কাহিনী, দণ্ডের কাহিনী, বৃত্রবধ এবং ইলা ও বুধের কাহিনী। এদের মধ্যে দণ্ডের কাহিনী এবং বৃত্রবধের কাহিনী বাল্মীকি কথিত রামের কাহিনীর সঙ্গে পরোক্ষভাবেও কোনও সংযোগ রাখে না। শম্বুকবধের কাহিনী বিশেষ উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে মনে হয়। এ বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে।

সুতরাং দেখা যায়, রামায়ণের মূল কাহিনীর সঙ্গে অনেকগুলি উপাখ্যান খুব দুর্বল সূত্রকে অবলম্বন করে সংযুক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হয় অপ্রাসঙ্গিক, না হয় মূল ধারাবাহিক কাহিনীর অঙ্গীভূত হবার যোগ্য নয়। সুতরাং এগুলিকে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে ধরে নেওয়া যায়।

(৪)

দীর্ঘতর পদে রচিত অংশ কি সংযোজন

বিখ্যাত রামায়ণ-সমালোচক সি ভি বৈদ্যের মতে রামায়ণের যে অংশগুলি দীর্ঘতর পদে রচিত, সেগুলি পরবর্ত্তীকালের সংযোজন। তাঁর ধারণা মহাকবি বাল্মীকি কেবল শ্লোক ছন্দই আবিষ্কার করে রামায়ণ রচনায় ব্যবহার করেন। এই শ্লোকছন্দ বেদের অনুষ্টুপ

ছন্দকে অবলম্বন করে রচিত। বেদে ব্যবহৃত অনুষ্টুপ ছন্দে আট অক্ষরের চারটি পদ আছে। বাল্মীকি রচিত শ্লোক ছন্দ তা হতে ঈষৎ পরিবর্তিত। তাতে আট অক্ষরের চারটি পদের বিশেষ স্থানে গুরুভার অক্ষর স্থাপিত। দ্বিতীয়ত, চারটি আট অক্ষরের পদকে দুটি ষোল অক্ষরের পদে পরিবর্তিত করা হয়েছে। শ্রী বৈদ্যের ধারণা বাল্মীকি রামায়ণ রচনায় কেবল এই ছন্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং অন্য ছন্দে রচিত অংশগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন। (৯)

আমরা কিন্তু দেখতে পাই মূল রামায়ণে তিনটি পৃথক ছন্দ ব্যবহার হয়েছে। একটিতে দুই পদের প্রতি পদে ষোলটি অক্ষর আছে। সেটিই শ্লোকছন্দ নামে পরিচিত। এই ছন্দ নাকি বাল্মীকির মুখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ হয়েছিল। এই ছন্দেই রামায়ণের শতকরা নব্বই ভাগ অংশ রচিত। তার অতিরিক্ত আরও দুটি ছন্দ ব্যবহার হয়েছে। সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডে বহুস্থানে চারপদ বিশিষ্ট প্রতি পদে এগারটি করে অক্ষর নিয়ে একটি দীর্ঘতর ছন্দ ব্যবহার হয়েছে। অনুরূপ ভাবে অনেক সর্গের শেষে আর একটি ছন্দ ব্যবহার হয়েছে। তার চার পদের প্রতি পদে বারোটি অক্ষর।

রামায়ণকাব্যের সমালোচক বৈদ্যের মতে এই দীর্ঘতর দুটি ছন্দে যে শ্লোকগুলি রচিত হয়েছে সেগুলি মূলগ্রন্থে ছিল না; পরে সংযোজিত হয়েছে। (১০) অর্থাৎ তাঁর ধারণা এগুলি আদিকবি বাল্মীকির রচিত নয়। কেবল যে অংশ শ্লোক ছন্দে রচিত তাই বাল্মীকির নিজস্ব রচনা।

এই যুক্তি কিন্তু খুব সবল বলে মনে হয় না। বোঝাই যায় বাল্মীকির শ্লোক ছন্দ বৈদিক যুগের অনুষ্টুপ ছন্দের অনুসরণে গড়ে

৯। C. V. Vaidya, The Riddle of the Ramayana Revised edition 1972, P. 2

১০। একই গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩

উঠেছে। আমরা জানি বেদে বহু বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহৃত হত। তাদের মধ্যে একটি হল ত্রিষ্টুপ ছন্দ। তার চার পদের প্রতি পদের অক্ষর সংখ্যা এগারো। আর একটি ছন্দ ছিল জগতী। তার চার পদের প্রতি পদের অক্ষর সংখ্যা ছিল বারো। বাল্মীকি যদি বেদের অনুষ্টুপ ছন্দ ব্যবহার করে থাকেন, তা হলে ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দ ব্যবহার করতে বাধা কোথায়? অতিরিক্ত ভাবে দেখা যাবে এই দুই ছন্দে রচিত অংশগুলি শ্লোক ছন্দে রচিত অংশ হতে কাব্যগুণে আদৌ নিকৃষ্ট নয়। বরং এদের রচনারীতির মধ্যে এমন সাদৃশ্য দেখা যায় যে সেগুলি একই কবির রচনা বলে মনে হয়। সুতরাং সেগুলি যে আদিকবির রচিত নয় এবং পরে সংযোজিত হয়েছে, এমন ধারণা করবার সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায় না। আমরা এগুলিকে আদিকবির রচিত মূল রামায়ণের অংশ বলে ধরে নিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে মনে হয় একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে অনেক ক্ষেত্রে একটি সর্গের শেষ অংশ রচিত হয়েছে এগারো অক্ষরে গঠিত চার পদের ত্রিষ্টুপ ছন্দে। বোঝা যায় এই রীতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য হল এই কথা সূচিত করা যে এখানে সর্গের সমাপ্তি ঘটছে। এই রীতি পরবর্তীকালে সংস্কৃত কাব্যরচনায় কবিরা প্রয়োগ করেছিলেন। আমরা দেখব তাঁদের রচিত কাব্যেও শেষ শ্লোকটি যে ছন্দে মূল সর্গটি রচিত হয়েছে সে ছন্দ হতে ভিন্ন। সুতরাং দেখা যায় এখানে বাল্মীকি প্রবর্তিত রীতি পরবর্তীকালের সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে।

(৫)

রামায়ণের সংযোজন-পূর্ব রূপ

এখন আমরা রামায়ণের আদিরূপ কি ছিল, সে বিষয় একটি ধারণা করে নিতে পারি। এই কাজে দুটি মূলনীতি প্রয়োগ করা

যেতে পারে। প্রথমত ভক্তিবাদ সম্মত চিন্তার প্রভাব যে অংশে লক্ষিত হবে তাকে বর্জন করা যেতে পারে। তার কারণ, রামায়ণের কাহিনী বৈদিক যুগের পরিবেশে সংঘটিত। কাজেই তার সঙ্গে পৌরাণিক যুগের পরিবেশের কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যে সব উপাখ্যান রামায়ণে স্থান পেয়েছে সেগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে তারপর গ্রহণ করতে হবে। যে উপাখ্যান আদৌ প্রাসঙ্গিক নয় তাকে বর্জন করতে হবে। যেমন কার্তিকের জন্ম-কাহিনী। তার সঙ্গে রামকাহিনীর আদৌ সংযোগ নাই। যে কাহিনী পরোক্ষ ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে তাকেও বর্জন করতে হবে; কারণ, মূলকাহিনীতে তার স্থান পাবার সম্ভাবনা খুব কম। যেমন, বিশ্বামিত্রের কাহিনী। তৃতীয়ত কেবল যে উপাখ্যান মূল কাহিনীর সম্বন্ধে রীতিমত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে তাকে রাখা যেতে পারে। যেমন ক্রৌঞ্চদম্পতীর কাহিনী বা দশরথ কর্তৃক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে পশু ভেবে সিন্ধুমুনিকে বধের কাহিনী। মূল-কাহিনীর সহিত এগুলি একরকম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এইবার এই নীতিগুলি প্রয়োগ করে কি ফল দাঁড়ায় দেখে নিতে পারি।

প্রথমে আদিকাণ্ডের কথা ধরা যাক। তার আরম্ভই হয়েছে এই বলে যে নারদ এসে বাল্মীকিকে রামের কাহিনী শোনালেন। এই শোনানর কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। মূল অংশেই পাই রাম বাল্মীকির সমকালীন মানুষ। রাম যে সীতা ও লক্ষ্মণসহ বাল্মীকির আশ্রমে গিয়েছিলেন, তার উল্লেখ আছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় তিনি রামের কাহিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে যে কাহিনী জানা আছে তা শোনাবার যুক্তি পাওয়া যায় না। স্পষ্টই বোঝা যায় এটি সংযোজন।

এবার আদিকাণ্ডের আলোচ্য বিষয়গুলির প্রকৃতি আলোচনা করা যেতে পারে। ৭৭টি সর্গ নিয়ে আদিকাণ্ড। তাদের মধ্যে

চৌত্রিশতম সর্গ হতে পঁয়ষট্টিতম সর্গ পর্যন্ত বিশ্বামিত্রের কাহিনীর বর্ণনা আছে। তাঁর জন্ম, বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর বিবাদ এবং পরাজয়, ফলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের জন্য তাঁর দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই কাণ্ডের মধ্যে কার্তিকের জন্মকাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। অগ্নি পুরাণে যে কল্পনাভিত্তিক কাহিনী আছে এটি ঠিক তার অনুসরণ করেছে। এখনই বলা হয়েছে মূলকাহিনীর সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিকতা লক্ষিত হয় না। কাজেই এগুলিকে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং দেখা যায় আদিকাণ্ডের অর্দ্ধেকের বেশী অংশ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল।

পরবর্তী পাঁচটি কাণ্ডে ধারাবাহিক ভাবে রামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এগুলিতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ছাড়া অন্যত্র উপাখ্যানের অনুপ্রবেশ ঘটে নি। তবে নানা স্থানে এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য রামকে বিষ্ণুর অবতার বলে প্রতিপন্ন করা। তার কিছু দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে। অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে পাই শরভঙ্গ রামের সহিত সাক্ষাতের পর যখন অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন, তখন ইন্দ্রের রথ এসে ব্রহ্মলোকে তাঁকে তুলে নিয়ে গেল। এখানে পৌরাণিক যুগের ধারণার সঙ্গে শ্রুতির যুগের ধারণার মিশ্রণ ঘটে গেছে। শ্রুতির যুগে মানুষের আত্মা নিজ শক্তিতেই ব্রহ্মলোকে যাবার ক্ষমতা রাখত। তার কিছু বর্ণনা প্রাচীন উপনিষদে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের রথ যে এই ধরণের কাজে ব্যবহার হত তা পরবর্তীকালের আশ্রয়ে সঞ্জাত বিশ্বাস।

যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চাশতম সর্গে আছে ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তখন সেই বিপদ হতে তাঁদের উদ্ধার করবার জন্য বিষ্ণুর বাহন গরুড় এসে উপস্থিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয়ে নাগগুলি দুই ভ্রাতাকে মুক্ত করে দিয়ে পালিয়ে গেল। বৈদিক যুগে বিষ্ণুর কোনও বাহন ছিল না। পৌরাণিক যুগেই

বিনতানন্দন গরুড়কে তাঁর বাহন করে দেওয়া হয়। বোঝাই যায় রামকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে এই কাহিনীটি সংযোজিত হয়েছে।

যুদ্ধকাণ্ডে একশো-এগারতম সর্গে একটি অনুরূপ সংযোজন ঘটেছে। সেখানে রাবণের মৃত্যুর পর যখন বিভীষণ সীতাকে রামের নিকট স্থাপন করলেন, তখন রাম তাঁকে কলঙ্কলিপ্ত জ্ঞানে পরিত্যাগ করলেন। সীতা তখন অগ্নিতে আত্মোৎসর্গ করলেন, কিন্তু দগ্ধ হলেন না। সেই প্রসঙ্গে এই সর্গে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা তখন সেখানে আবির্ভূত হলেন। তাঁর কাছে রাম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি একজন মানুষ এবং জানতে চাইলেন আগন্তুকটি কে। ব্রহ্মা তখন আত্মপরিচয় দিয়ে রামকে বললেন যে রাম প্রকৃতপক্ষে মানুষ নয়, তিনি স্বয়ং বিষ্ণু এবং সীতা হলেন স্বয়ং লক্ষ্মী। সুতরাং সীতাকে রামের প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। এই অংশটি পৌরাণিক যুগে যখন ভারতীয় চিন্তায় অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাও পরবর্তীকালের সংযোজন।

যুদ্ধকাণ্ডের একশোউনিশতম সর্গে আরও একটি সংযোজন আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে মহেশ্বরের আজ্ঞায় দশরথ স্বর্গ হতে লঙ্কায় রামের নিকট আনীত হয়েছিলেন এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটি সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। এইভাবে ত্রিমূর্তির তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের লঙ্কায় রাবণবধের পর একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। বলা বাহুল্য এই ত্রিমূর্তির অঙ্গীভূত তিন দেবতা বৈদিক যুগের দেবতা নন। কাজেই রামায়ণের যে পরিবেশ তাতে তাঁদের কোনো ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

উত্তরকাণ্ডের প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ জটিল হয়ে পড়ে। তার নানা কারণ আছে। প্রথমত উত্তরকাণ্ড প্রথম অবস্থায় আদৌ

ছিল কিনা সে বিষয় সন্দেহের কারণ বর্তমান আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি বিবরণ মতে রামায়ণ ছয় কাণ্ডে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তার বিরাট অংশ রামায়ণের মূলকাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নয় এমন নানা উপাখ্যান জুড়ে বসেছে। তৃতীয়ত, তাতে মূল কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় এমন কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যার পরবর্তী কালে সংযোজিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সবার বড় কথা, যুদ্ধকাণ্ডের শেষে এমন একটি উক্তি পাওয়া যায় যা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে আদিকবি এখানেই তাঁর গ্রন্থের ছেদ টেনে দিয়েছিলেন।

প্রথম বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে বলে এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে এই আলোচনা স্থুরু হতে পারে। আমাদের বক্তব্য হল উত্তরকাণ্ডের বিরাট অংশ একরকম অপ্রাসঙ্গিক উপাখ্যান দিয়ে ভঁরে দেওয়া হয়েছে। উত্তরকাণ্ডে মোট একশো এগারোটি সর্গ আছে। তাদের মধ্যে নবম হতে তেত্রিশতম সর্গ জুড়ে রাবণাদির জন্মকথা এবং রাবণের স্বর্গ ও পাতাল জয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পয়ত্রিশ ও ছত্রিশতম সর্গে হনুমানের জন্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই তুই কাহিনী রামায়ণের মূলকাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয়। রাবণ ও হনুমান রামায়ণের কাহিনীর যে তুটি প্রধান চরিত্র, তা স্বীকার্য ; কিন্তু তা বলে মূলকাহিনীর সঙ্গে তাঁদের জন্ম বা কীর্তিকথা সবিস্তারে বর্ণনা করবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায় না। তারপর দেখা যায় ষাটতম সর্গ হতে বাহাত্তরতম সর্গ পর্যন্ত জুড়ে শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণবধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি ইক্ষ্বাকুবংশের কাহিনীর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত থাকলেও রামের নিজস্ব কাহিনীর সঙ্গে তার সংযোগ পরোক্ষ। কাজেই আদিকাব্যে তার স্থান গৌণ। এইভাবে দেখা যাবে এই

তিনটি বিষয় নিয়ে একশো এগারটি সর্গের একচল্লিশটি সর্গ রচিত হয়েছে। সমগ্র কাণ্ডের শতকরা চল্লিশ ভাগ অংশ অপ্রাসঙ্গিক বা গৌণ কাহিনীতে নিবেদিত।

তৃতীয়ত মূলকাহিনীর সঙ্গে এমন একটি কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে যা প্রাসঙ্গিক হলেও পরবর্তী কালের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত বলে সন্দেহ করবার কারণ আছে। উত্তরকাণ্ডের তিয়াত্তরতম সর্গ হতে ছিয়াত্তরতম সর্গ জুড়ে শম্বুকবধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি সকলের সুপরিচিত। এক ব্রাহ্মণের বালকপুত্র অকালে মারা গেলে রামের কাছে অভিযোগ আসে। তখন রাম নিজে অনুসন্ধান করে দেখতে পান শম্বুক নামে এক শূদ্র তপস্যা করছেন। তখন রাম তাঁকে স্বধর্ম হতে বিচ্যুতি হেতু মৃত্যুদণ্ড দেন। কারণ, শূদ্রের তপস্যা করবার অধিকার ছিল না ; তার স্বধর্ম হল অন্য তিন উচ্চবর্ণের সেবা করা।

কিন্তু রামায়ণের কাহিনী বৈদিক যুগে সংঘটিত। সে যুগে শূদ্রের তপস্যা করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না। চারটি বর্ণের জন্য যে জীবিকা নির্দিষ্ট হয়েছিল তা রামায়ণের যুগে কঠোর ভাবে পালিত হত বলে মনে হয় না। রামায়ণের মূল কাহিনীর মধ্যেই তার প্রমাণ মিলবে। অযোধ্যাকাণ্ডে আমরা পাই গুহ নামে এক চণ্ডাল রাজা ছিলেন। সুতরাং তিনি শূদ্রবর্ণের মানুষ হয়েও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করতেন। অরণ্যকাণ্ডে পাই পম্পা সরোবরের নিকট একজন শবরীর আশ্রম ছিল। সুতরাং শূদ্র হয়েও তিনি ব্রাহ্মণের ধর্মপালন করতেন। কাজেই শূদ্র যদি রাজা হয়ে ক্ষত্রিয়ের ধর্মপালন করতে পারে, শূদ্রাণী যদি তপস্যা করে ব্রাহ্মণের ধর্মপালন করতে পারে, তা হলে একই কালে শূদ্র হয়ে শম্বুক কেন তপস্যা করতে পারবেন না বোঝা যায় না। কাজেই রাম কর্তৃক তাঁর এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বিধান কাহিনীর অন্য অংশের সঙ্গে

সঙ্গতি রক্ষা করে না। সুতরাং অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় এই অংশটি পরবর্তীকালের সংযোজন।

অতিরিক্তভাবে এমন একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যা স্পষ্টই ইঙ্গিত করে যে সমগ্র উত্তরকাণ্ডখানি পরে সংযোজিত হয়েছে। একটি কাব্যের সমাপ্তি যে ঘটছে তার কিছু ইঙ্গিত কাব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশেষত যদি তা ধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ হয়, তা হলে কাব্যের শেষে তা পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে যে সুফল লাভ হয় তার বিবরণ স্থাপিত হয়। তাই হল ফলশ্রুতি শব্দটির পারিভাষিক অর্থ। সুতরাং যেখানে ফলশ্রুতি স্থাপিত হয়েছে, ধরতে হবে সেখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে।

অথচ আমরা দেখব রামায়ণে দুই স্থানে পৃথক ভাবে দুটি ফলশ্রুতি স্থাপিত হয়েছে। একটি আছে যুদ্ধকাণ্ডের একেবারে শেষে একশো আটাশতম সর্গে। আর একটি আছে উত্তরকাণ্ডের একেবারে শেষে একশো এগারতম সর্গে। দুবার ফলশ্রুতি শোনানোর কোনও অর্থ হয় না। বোঝা যায় উত্তরকাণ্ডের শেষে যখন ফলশ্রুতি স্থাপিত হয় তখন যিনি এটি স্থাপন করেন, তাঁর খেয়াল ছিল না যে আগেই একটি ফলশ্রুতি শোনানো হয়েছে। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে স্থাপিত ফলশ্রুতি আরম্ভ হয়েছে একশো আটাশতম সর্গের ১০৮ সংখ্যক শ্লোক হতে এবং শেষ হয়েছে ১২৫নং শ্লোকে। ঠিক তার আগে স্থাপিত যে দুটি শ্লোক আছে তারা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সেই শ্লোক দুটি এই ঃ

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥
ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাং চ বিজয়াবহম্।
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ (১১)

১১। যুদ্ধকাণ্ড। ১২৮। ১০৬-১০৭

স্পষ্টই বোঝা যায় মহাকবি এখানেই ছেদ টানতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত আদিকাব্য রচনা শেষ হবার কিছুকাল পরে এখানে যে ফলশ্রুতি স্থাপিত হয়েছে তা সংযোজিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সমগ্র উত্তরকাণ্ড সংযুক্ত হবার পর গ্রন্থের সমাপ্তি সূচিত করতে তার শেষে আর একটি ফলশ্রুতি স্থাপিত হয়েছে। এই অবস্থা হতে চূড়ান্ত ভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উত্তরকাণ্ড রামায়ণের আদিরূপে তার সহিত সংযুক্ত ছিল না।

উপরে দেখান হয়েছে উত্তরকাণ্ডের এক বিরাট অংশ হয় অপ্রাসঙ্গিক, না হয় মূলকাহিনীর সহিত গৌণভাবে জড়িত। যে অংশটুকু প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তা হল বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশের জন্ম, তাঁদের রামায়ণ কাহিনী সঙ্গীত আকারে গাইতে শিক্ষাদান এবং সর্বশেষে রাম ও সীতার মিলন ঘটাবার বাল্মীকির ব্যর্থ চেষ্টা। বিষয়টি এতই করুণ এবং কাব্যগুণমণ্ডিত যে তাকে বর্জন করতে অনেকের হয় তো মন চাইবে না। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য যদি ইঙ্গিত করে তা মূল রামায়ণে ছিল না, সত্যের অনুরোধে তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নাই। একথা অনস্বীকার্য যে এই করুণ কাহিনী পরবর্তীকালের সাহিত্যকে রীতিমত সমৃদ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গে কবি ভবভূতির বিখ্যাত নাটক উত্তররামচরিতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। করুণ-রসের এমন হৃদয়গ্রাহী ব্যবহার বিশ্বের অন্য কোনও সাহিত্যে পাওয়া যাবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করবার লোভ সংবরণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। এই সংযোজন রামের মহৎ চরিত্রকে খানিকটা খর্ব করেছে বলা যায় না কি? ভবভূতি অবশ্য দুকূল রাখবার চেষ্টা করেছেন। একদিকে রামকে আদর্শ রাজা প্রতিপাদিত করবার চেষ্টায় তিনি রামের মুখে এই শ্লোকটি স্থাপন করেছেন ঃ

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥(১২)

অর্থাৎ রাম এমন আদর্শ রাজা যে প্রজারঞ্জনের জন্য এমন কাজ নাই, তিনি যা না করতে পারেন ; এমনকি প্রাণের অধিক প্রিয়া ভার্যা সীতাকেও বর্জন করতে পারেন। তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভবভূতি শেষ অঙ্কে রামের সহিত সীতার মিলন ঘটিয়েছেন।

কিন্তু সব দিক বিবেচনা করলে মনে হয় তা রামের চরিত্রকে কলঙ্কযুক্ত করেছে। রাম আদর্শ পতি ও আদর্শ নৃপতি একসঙ্গে দুই হলে আপত্তি ছিল না ; কিন্তু তাঁকে আদর্শ রাজা করতে পত্নীর প্রতি অন্যায় আচরণ ঘটতে দেওয়া কি বিচক্ষণতার কাজ হয়েছে ? যাঁকে তিনি পূর্বে শত্রুর অধীনে বাস করা সত্বেও গ্রহণ করেছিলেন, যাঁকে মহিষী পদে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং যিনি তাঁর ভাবী সন্তানকে তখন জঠরে ধারণ করছেন সেই অবস্থায় প্রজারঞ্জনের জন্য ত্যাগ করার যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। যদি এই ঘটনা সত্যই ঘটে থাকে, তা হলেও তাকে মহাকবি বাল্মীকি তাঁর আদিকাব্য হতে বর্জন করে বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছেন।

●

১২। উত্তররামচরিত। প্রথম অংক

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধজাতকে বর্ণিত রামায়ণের পরিবর্ত্তিত রূপ

(১)

রামায়ণের কাহিনীর মূল রূপ

বাল্মীকি রচিত রামায়ণে রামের যে কাহিনী পাই তার সহিত ভারতবাসী আবহমানকাল পরিচিত। মূলকাহিনী অনুসারে রাম ছিলেন কোশলের রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা যখন ঘোষণা করলেন তিনি রামকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করবেন, তখন তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ী আপত্তি করলেন। ইতিপূর্বে দশরথ তাঁর দুটি ইচ্ছা পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কৈকেয়ী তখন বলেছিলেন, সে দুটি ইচ্ছা তাঁর সুবিধামত এক সময় আদায় করে নেবেন। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি দাবী করলেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে রামকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে পাঠানো হক এবং ভরতকে যুবরাজ পদে রামের পরিবর্তে অধিষ্ঠিত করা হক। দশরথ তাতে বিশেষ উৎসাহ দেখান নি। তখন কৈকেয়ী রামকে ডেকে পাঠিয়ে সোজাসুজি তাঁর কাছে এই প্রতিশ্রুতি দানের কাহিনী বলে তারপর তাঁর প্রস্তাব রামের কাছে স্থাপন করলেন। রামকে বিশেষ বোঝাতে হল না; তিনি সোজাসুজি বনবাস গমনে সম্মত হলেন। তাঁর মতে পিতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা তাঁর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সুতরাং তিনি সীতা ও লক্ষ্মণসহ বনে গেলেন। ভরত তখন তাঁর মাতুলালয়ে।

এদিকে রাম চলে যাবার পর তাঁর বিচ্ছেদের শোকে বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু ঘটল। এই পরিস্থিতিতে রাজমন্ত্রী বশিষ্ঠ ঋষি ভরতকে

মাতুলালয় হতে ডেকে পাঠালেন। ভরত ফিরে সকল বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়ে মাতার উপর রুষ্ট হলেন এবং কঠোর ভাষায় তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। তাঁর মতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিতার সিংহাসনে অগ্রাধিকার। সেই কারণে বশিষ্ঠ যখন প্রস্তাব করলেন যে রামের অনুপস্থিতিতে ভরতের রাজপদে অভিষিক্ত হওয়া উচিত, তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। রাম তখন চিত্রকূট পর্বতের সংলগ্ন অরণ্যে বাস করছিলেন। ভরত বললেন, তিনি সেখানে গিয়ে রামকে পিতার মৃত্যুর সংবাদ দেবেন এবং বনবাস ত্যাগ করে ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বলবেন।

রাম কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তাঁর একটি উচ্চ নৈতিক আদর্শ ছিল। তাঁর ধারণায় যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন তা সর্বথা রক্ষা করা উচিত। কাজেই চতুর্দশ-বৎসর-কাল বনবাস যাপন না করে তিনি অযোধ্যায় ফিরবেন না। অগত্যা দুই ভায়ের মধ্যে একটি আপোষ হল। ঠিক হল ভরত রামের প্রতিনিধি হয়ে রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে রাম যতদিন বনবাস যাপন করবেন রাজ্যভার পরিচালনা করবেন এবং রাম সত্যপালন করে ফিরে আসবার পর রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হবে।

এরপর সীতা ও লক্ষ্মণসহ রাম চিত্রকূট পর্বত ত্যাগ করে সুদূর দক্ষিণে অগস্ত্যের উপদেশ অনুসারে পঞ্চবটী বনে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন। সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর এক বিপদ ঘটল। নিকটবর্তী অঞ্চলে রাবণের একটি উপনিবেশ ছিল। খর ও দূষণ নামে দুই রাক্ষস প্রতিনিধি তার দেখাশোনা করতেন। রাবণের ভগিনী শূর্পনখা সেখানে বেড়াতে এসেছিলেন। বনে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে একত্র দেখতে পেলেন। লক্ষ্মণের রূপে তিনি এমন মুগ্ধ হলেন যে তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। শেষে বাদানুবাদের পর বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মণ তাঁর

নাক ও কান কেটে দিলেন। ক্রোধের বশে তিনি তখন খর ও দূষণের নিকট গিয়ে অভিযোগ করলেন। তাঁরা সসৈন্যে এসে রামকে আক্রমণ করলেন ; কিন্তু যুদ্ধে রামের হাতে নিহত হলেন।

শূর্পনখা তখন প্রতিহিংসা আদায়ের জন্য রাবণের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন ; আরও বললেন রামের পত্নী অসাধারণ সুন্দরী এবং রাবণের অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করবার ক্ষমতা রাখেন। ইতিপূর্বে অকম্পন জনস্থান হতে পালিয়ে এসে রাবণকে রামের বীর্যের কথা শুনিয়ে বলেছিলেন সীতা দুর্লভ স্ত্রীরত্ন ; রাম তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসেন। রাবণ রামকে রণে পরাজিত করবার ক্ষমতা রাখেন না। সুতরাং তিনি উপদেশ দিলেন সীতাকে অপহরণ করলে রাম দুঃখে মারা যাবেন। (১)

রাবণ সেই উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। মারীচের সাহায্যে স্বর্ণমৃগের লোভ দেখিয়ে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে পাঠিয়ে রাবণ সাধুর ছদ্মবেশে সীতার সহিত দেখা করেন। তারপর আত্ম পরিচয় দিয়ে সীতাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব দিলেন। সীতা ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে রাবণ তাঁকে অপহরণ করলেন।

এদিকে সীতা অপহৃত হবার পর রাম, লক্ষ্মণসহ তাঁর অন্বেষণে দক্ষিণ অভিমুখে চললেন। যেতে যেতে ঋষ্যমুখ পর্বতে সুগ্রীবের সহিত পরিচয় হয়। তিনি কিষ্কিন্ধার রাজা বালীর ভাই। বালী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে রাম সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ঠিক হল রাম তাঁকে কিষ্কিন্ধার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং পরিবর্তে সুগ্রীব তাঁর বানর প্রজাদের সাহায্যে সীতা কোথায় আছেন বার করবেন এবং তাঁর উদ্ধারকার্যে সাহায্য করবেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে রাম বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে সিংহাসনে স্থাপন করলেন এবং বালীর

১। সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হি ভবিষ্যতি ॥ অরণ্যকাণ্ড। ৩১। ৩০

পুত্র অঙ্গদকে এই রাজ্যের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন।

যথাসময় অনুসন্ধানের কাজ সুরু হল। অবশেষে সুগ্রীবের বিশ্বস্ত অনুচর হনুমান লঙ্কায় অবস্থিত রাবণের প্রাসাদের সংলগ্ন অশোকবনে বন্দিনী অবস্থায় সীতাকে আবিষ্কার করলেন। তখন সুগ্রীব বানর সৈন্যসহ রাম ও লক্ষ্মণের নেতৃত্বে সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হলেন। সেই খবর লঙ্কায় পৌঁছালে রাবণের কণিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ সীতাকে প্রত্যর্পণ করবার জন্য রাবণকে বার বার অনুরোধ করলেন। তাতে রাবণ ভীষণ রুষ্ট হয়ে বিভীষণকে তাড়িয়ে দিলেন। অগত্যা বিভীষণ চারজন অনুগত অনুচরসহ সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে রামের কাছে আত্মসমর্পন করলেন। রাম তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং এই আশ্বাস দিলেন যে লঙ্কা বিজয়ের পর তিনি বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে স্থাপন করবেন।

তারপর বানর সৈন্য লঙ্কার সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে একটি সেতু নির্মাণ করল। সেই সেতুর সাহায্যে বানরসৈন্যসহ রাম ত্রিকূট পর্বতে অবস্থিত পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত লঙ্কা নগরী অবরোধ করলেন। দীর্ঘ যুদ্ধের শেষে রাবণ রণক্ষেত্রে রামেয় অস্ত্রের আঘাতে মারা গেলেন। তখন রাম বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন।

তারপর রামের নির্দ্দেশে সীতা রামের নিকট আনীত হলেন। রাম কিন্তু শত্রুর আশ্রয়ে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন বলে সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। দুঃখে অভিমানে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। অগ্নি কিন্তু তাঁকে অদগ্ধ অবস্থায় প্রত্যর্পণ করলেন। তখন রাম সীতাকে গ্রহণ করে অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন। নন্দীগ্রামে ভরতকে হনুমান এই শুভ সংবাদ দিতে গেলেন। যথা-সময় ভরত সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামকে মহাসমারোহের সহিত স্বাগত জানালেন। পরে রামের তিন অনুজ ভ্রাতা অধিকতর সমারোহের

সহিত রাম ও সীতার অভিষেক সম্পাদন করলেন। তারপর রাম ভ্রাতাদের সহিত দীর্ঘকাল ধরে কোশলরাজ্য শাসন করে এমন জনপ্রিয় হলেন যে প্রজাদের মুখে রামের গুণকীর্তন সর্বক্ষণ উচ্চারিত হত।

এইখানেই যুদ্ধকাণ্ডের শেষ। আমরা ধরে নিতে পারি, এখানেই বাল্মীকি রচিত রামায়ণ কাহিনী শেষ হয়েছে। কারণ, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ইতিপূর্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে উত্তরকাণ্ড পরে সংযোজিত হয়েছিল।

এই কাহিনী দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে সমগ্র রামায়ণ কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেখানে বাল্মীকি কথিত কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। এই কাহিনী বুদ্ধের জন্মের পূর্বেই মহাভারতে সংযোজিত হয়ে থাকবে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় কয়েকশত বৎসর ধরে তা অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল। তারপর আমরা দেখি মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ মহাকাব্যের দশম হতে চতুর্দ্দশ সর্গ জুড়ে রামের কাহিনী কথিত হয়েছে। সেখানে যে কাহিনী পাই তা মূল কাহিনীর অনুসরণ করে। কালিদাসকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়। তারপর দেখা যায় মহাকবি ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকখানি রাম ও সীতার যুগ্মজীবনের কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের আরও এক বিখ্যাত কাব্য হল ভট্টিকাব্য। তারও উপজীব্য হল রামের জীবনকাহিনী। এই দুই ক্ষেত্রেও বাল্মীকি কথিত কাহিনীর অনুসরণ করা হয়েছে।

(২)

বৌদ্ধ জাতকে রামকাহিনীর রূপান্তর

কিন্তু দেখা যায় বৌদ্ধসাহিত্যে এই মূল কাহিনীর মৌলিক রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। বিভিন্ন জাতকে তার রূপ পরিবর্তিত হতে

হতে শেষে দেখা যায়, সীতা বিদেহরাজ জনকের কন্যা না হয়ে রামের ভগিনীতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং মহিষীর পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। ফলে এই দাঁড়ায় যে রাম আপন ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে বাল্মীকি রচিত মূল কাহিনী কতখানি গ্রহণযোগ্য। বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনীর সহিত তার অসঙ্গতি তার বিশ্বাসযোগ্যতা খর্ব করে কিনা। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রশ্ন হল রাম কি নিজের ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনীর সহিত তার এই অসঙ্গতি তার বিশ্বাসযোগ্যতা খর্ব করে কি না।

বৌদ্ধ সাহিত্যে রামায়ণের কাহিনী পাওয়া যায় বৌদ্ধ জাতক-গুলির মধ্যে। বিভিন্ন জাতকে রাম সম্বন্ধে যে কাহিনী স্থাপন করা হয়েছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই প্রসঙ্গে স্থাপন করে নিলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হবে। তাদের একটি কালানু-ক্রমিক বিবরণ নীচে স্থাপিত হল।

বৌদ্ধ জাতকে রামায়ণের কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাই সূত্র পিটকের খুদ্দক নিকায়ে। তা যখন পিটকের অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত খুব প্রাচীন ; কারণ, পিটকগুলি বুদ্ধের প্রয়াণের অল্পকাল পরেই সঙ্কলিত হয়। তাদের নিশ্চিতভাবে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে স্থাপন করা যায়। এখানে রামায়ণের কাহিনীর বিষয় অতি সামান্য উল্লেখ আছে। বোঝা যায় রামের চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করা তার উদ্দেশ্য। তাতে বলা হয়েছে, বনবাসে গমনের পর পিতা দশরথের মৃত্যু হলে ভরত সেই দুঃসংবাদ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে জানাতে এলেন ; কিন্তু তা শুনে রামের মনে কোনও বিকারের চিহ্ন লক্ষিত হল না। এর বেশী এখানে কিছু নেই। ঠিক বলতে কি কোনও কাহিনী নাই ; কেবল রামের স্থিতধীসুলভ আচরণের উল্লেখ আছে। তা বরং প্রতিষ্ঠিত করে যে বুদ্ধের সময় রামের চরিত্রের

মহত্বের কথা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তার পরবর্তী জাতকের কাহিনীটি দশরথ জাতক নামে পরিচিত। তা জাতকগাথার অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এই কাহিনীগুলি প্রস্তরে উৎকীর্ণ আকারে পাওয়া যায়। সুতরাং তাও বেশ প্রাচীন। আমরা জানি রামায়ণের কাহিনীর দুটি অংশ। একটি হল রামের যুবরাজপদে অভিষেক নিয়ে জটিলতার ফলে রামের প্রতি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করবার নির্দ্দেশ। দ্বিতীয় হল বনবাস কালে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের ফলে রামের সীতাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় অভিযান এবং যুদ্ধে রাবণকে নিহত করে সীতার উদ্ধার। এই জাতকে রাম কাহিনীর দ্বিতীয় অংশের আদৌ উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়ত প্রথম অংশে সীতাকে রামের ভগিনীরূপে স্থাপিত করা হয়েছে।

এই দুই কারণে জাতকে বর্ণিত এই কাহিনীটি বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে ভিত্তি করে জার্মান ভারত-তত্ত্ববিৎ বাল্মীকি রচিত রামায়ণ সম্বন্ধে অনেক প্রতিকূল মন্তব্য করেছেন। সেগুলি যথাস্থানে সবিস্তার আলোচিত হবে। সুতরাং কাহিনীটি কতকগুলি বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে তার সহিত আমাদের একটু বিস্তারিত পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। কাহিনী স্বয়ং বুদ্ধের মুখে স্থাপিত হয়েছে। সংক্ষেপে কাহিনীটি হল এই ঃ

বারাণসীতে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রানীর দুই পুত্র, রাম ও লক্ষ্মণ এবং এক কন্যা, নাম সীতা। সেই রানীর অকাল-মৃত্যু হল। তখন রাজা আবার বিবাহ করলেন। সেই রানীর একটি পুত্র হল। তাঁর নাম ভরত। রাজা ভরতকে একটি বর দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে ভরতের যখন আট বছর বয়স হল, তাঁর মাতা দাবী করলেন ভরতকে রাজ্যভার দিতে হবে।

দশরথ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি কিন্তু মনে মনে আশঙ্কিত হলেন যে তার ফলে পরলোকগত প্রথমা রানীর তিন

সন্তানের প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। তাই তিনি রাম, লক্ষ্মণ ও ও সীতাকে উপদেশ দিলেন, তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে, কোনও প্রতিবেশী রাজ্যে বা বনে গিয়ে বাস করুন এবং পিতার মৃত্যু ঘটলে ফিরে এসে রাজ্য দখল করুন। পরে তিনি জ্যোতিষীদের দিয়ে গণনা করিয়ে জানলেন যে তাঁর মৃত্যু ঘটবে বারো বছর পরে। তাই প্রথম পক্ষের সন্তানদের বারো বছর পরে ফিরে আসতে বললেন।

তারপর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা হিমালয় অঞ্চলে গিয়ে একটি আশ্রম স্থাপন করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু জ্যোতিষীর হিসাবকে ভুল প্রমাণ করে দশরথের মৃত্যু ঘটল নয় বছর পরে। ভরত তখন রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন; উদ্দেশ্য তাকেই শূন্য সিংহাসনে স্থাপন করা। ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মণ ও সীতা শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন; কিন্তু রাম আদৌ বিচলিত হলেন না। রাম কিন্তু তখন ফিরে যেতে রাজী হলেন না। যেহেতু পিতা তাঁকে বারো বছর পরে ফিরে যেতে বলেছিলেন, তিনি বললেন আরও তিন বছর পরে ফিরবেন। তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে ভরতের সঙ্গে পিতৃগৃহে ফিরে যেতে বললেন। আরও ঠিক হল তাঁর অনুপস্থিতি বাকি তিন বছর ভরত তাঁর পাদুকা তাঁর প্রতীক হিসাবে সিংহাসনে স্থাপন করে রামের প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পালন করবেন। এইখানেই কাহিনীর শেষ।

এই কাহিনীর শেষে গৌতম বুদ্ধের মুখে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য স্থাপিত হয়েছে। তাই তার অনুবাদ এখানে স্থাপিত হল:

"সেই কালে মহান রাজা দশরথ (প্রকৃতপক্ষে) ছিলেন শুদ্ধোদন; রামের মাতা ছিলেন (প্রকৃতপক্ষে) মহামায়া; সীতা ছিলেন (প্রকৃতপক্ষে) রাহুলের মাতা; ভরত ছিলেন (প্রকৃতপক্ষে) আনন্দ; লক্ষ্মণ ছিলেন (প্রকৃত পক্ষে) সারিপুত্র এবং সভাসদ্‌গণ

ছিলেন (প্রকৃতপক্ষে) আমার শিষ্যবর্গ এবং রাম ছিলাম আমি স্বয়ং।"

তার পরবর্তী কালের জাতকের কাহিনীর তারিখ হল ২৫২ খৃষ্টাব্দ। তার মূল পাওয়া যায় না; চীনা ভাষায় সংরক্ষিত তার একটি অনুবাদ পাওয়া যায়। তাতে রামের নামের কোনও উল্লেখ নাই; তবে যে কাহিনী স্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে রামের কাহিনীর কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীটি এই:

এক বোধিসত্বের মাতুল তাঁর রাজ্য দখল করে নেওয়ায় তিনি মহিষীকে নিয়ে বনবাসী হলেন। সেখানে এক সামুদ্রিক সাপ তপস্বীর বেশে এসে তাঁর পত্নীকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। পরে বানরদের সাহায্যে সেই বোধিসত্ব পত্নীকে উদ্ধার করলেন। কাহিনীটিতে রামের উল্লেখ না থাকলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে তার উপর রামের লঙ্কা অভিযানের কাহিনীর ছায়াপাত হয়েছে।

তার পরের কাহিনীটির তারিখ ৪৭২ খৃষ্টাব্দ। এরও মূল কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় না; তবে চীনা ভাষায় অনুবাদরূপে পাওয়া যায়। এতে লক্ষ্মণের বা সীতার উল্লেখ নাই; কেবল রামের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, রাম নারায়ণের শক্তির ধারক।

দশরথ জাতকের মত শেষের জাতকটিও বর্তমান প্রসঙ্গে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি গদ্য ও পদ্যে রচিত এবং 'জাতক কথবন্না' নামে একটি পালি ভাষায় রচিত সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এর তারিখ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। কাহিনীটি এই:

কৈকেয়ীর প্রতিকূলতার আশঙ্কায় রাম ও লক্ষ্মণকে বারো বছর বনে গিয়ে বাস করতে হয়েছিল। সীতা তাঁদের ভগিনী ছিলেন। তিনিও তাঁদের সঙ্গে গিয়ে বনে বাস করেছিলেন। কিন্তু নয় বছর পরে তাঁদের পিতা দশরথ মারা গেলেন। তখন ভরত তাঁদের ফিরিয়ে আনতে গেলেন। পিতার মৃত্যুর সংবাদ রামকে বিচলিত করতে

পারল না। আলোচনার পর ঠিক হল, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে ভরত রাজধানীতে ফিরে যাবেন, আর রাম তিন বছর পরে ফিরবেন। আরও ব্যবস্থা হল রাম ফিরে না আসা পর্যন্ত রামের পাদুকা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে ভরত রামের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করবেন। তিন বছর পরে রাম ফিরে গেলে সীতাকে অগ্রমহিষী করে রাম সিংহাসনে রাজপদে অভিষিক্ত হলেন।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে শেষের কাহিনীটি দশরথ জাতক নামে প্রচলিত দ্বিতীয় কাহিনীর অনুসরণ করেছে। তবে এখানে একটি অতিরিক্ত তথ্য সংযুক্ত হয়েছে। দশরথ কাহিনীতে সীতাকে মহিষী পদে অভিষিক্ত করার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয় নি। তবে বুদ্ধের মুখে যে মন্তব্য স্থাপিত হয়েছে, তার তাৎপর্য সেই রকম দাঁড়ায়। বলা হয়েছে সেই কাহিনীর সীতা রাহুলের মাতার পূর্ব জন্মের প্রকাশ। সুতরাং সীতা ভগিনী হয়েও রামের পত্নী হয়ে দাঁড়ান। কাজেই শেষের জাতকে যখন বলা হল সীতা রামের অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তখন দাঁড়ায় সীতাকে রাম বিবাহ করেছিলেন। দশরথ জাতকের কাহিনীর সহিত তার কোনও পার্থক্য নাই। যেহেতু দশরথ জাতক প্রাচীনতর, ধরে নেওয়া যায়, এই কাহিনী তার অনুসরণে রচিত।

(৩)

এই রূপান্তর কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ?

বোঝাই যায়, উপরে স্থাপিত প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ কাহিনীর সহিত বাল্মীকি রচিত রামায়ণ কাহিনীর কোনও অসঙ্গতি নাই; কিন্তু দশরথ জাতকে বর্ণিত কাহিনী এবং পঞ্চম কাহিনীর সঙ্গে তার মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য আছে। দুটিতেই সীতাহরণের কাহিনী নাই। দুটিতেই সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণের ভগিনীরূপে বর্ণনা করা

হয়েছে। দুটিতেই বলা হয়েছে চৌদ্দ বছর নয়, রাম বারো বছর বনে বাস করেছিলেন। উভয় কাহিনীতেই রামের চরিত্রের মূল মাহাত্ম্য, পিতার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় আত্ম-নির্বাসন বরণ করলেন, তার আদৌ উল্লেখ নাই। আরও মারাত্মক হল সীতাকে রামের ভগিনীরূপে চিত্রিত করা। ভারতীয় সমাজে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহের আদৌ প্রচলন নাই, সর্বথা নিন্দিত ও আইনতঃ নিষিদ্ধ।

এই দ্বিতীয় অসঙ্গতির সমর্থনে সুকুমার সেন বলেছেন যে প্রাচীন কালে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। (২) তার সমর্থনে আর একটি বৌদ্ধ কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। কপিলাবস্তু কি করে শাক্যবংশের রাজধানী হল এবং শাক্যবংশের নাম শাক্য কেন হল, তার একটি ব্যাখ্যা এই কাহিনীতে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাহিনীটি ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহকে ভিত্তি করে রচিত।

আলোচনার সুবিধার জন্য তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কাহিনীটি এই ঃ

ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা সুজাতের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। তাঁর উপপত্নীর কোলে আর একটি পুত্র জন্মায়। উপপত্নীর ইচ্ছা অনুসারে রাজা বৈধ পুত্র এবং কন্যাদের নির্বাসনে পাঠালেন এবং উপপত্নীর পুত্রকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করলেন। নির্বাসিত হয়ে পাঁচ রাজপুত্র তাঁদের ভগিনীদের সঙ্গে নিয়ে কপিল মুনির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ভাই ভগিনীদের একজনকে বিবাহ করলেন। তার কারণ সেই বিদেশে উচ্চবংশজাত বিবাহযোগ্য কন্যা পাওয়া যায় না ; অপরপক্ষে নিকৃষ্ট বংশের কন্যাকে বিবাহ করলে বংশের মর্যাদায় হানি ঘটে। রাজার কাছে সেই খবর পৌঁছালে তিনি পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে বিধান

২। ডঃ সুকুমার সেন, রামকথার প্রাক্ ইতিহাস।

চাইলেন। তাঁরা সব প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করে এই বিধান দিলেন, যে পরিস্থিতিতে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ সংঘটিত হয়েছে তা যে সমর্থন করা যায় না তা নয়। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে যে কথাটা প্রয়োগ করলেন, তা হল 'সকিয়'। কথাটি পালি ভাষার ; তার সংস্কৃত অনুবাদ হবে 'শক্য', পরিস্থিতির চাপে পড়ে যা ঘটেছে তা সমর্থনযোগ্য। সুতরাং এই সিদ্ধান্তের ফলে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ সিদ্ধ হয়ে গেল। তাঁদের বিবাহকে ভিত্তি করে যে বংশ স্থাপিত হল তার নাম হল শাক্যবংশ। তাঁরা সেখানে কপিল মুনির অনুমতি নিয়ে যে নগর স্থাপন করলেন, তাঁর নামের অনুসরণে তার নাম হল কপিলাবস্তু।

এই কাহিনীর সম্ভাব্যতার সমর্থনে আরও দাবী করা হয়েছে যে ঋগ্বেদে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং ঋগ্বেদে তার নজির আছে। বলা হয়েছে নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয় সূর্যার ভ্রাতাও বটে পতিও বটে। অর্থাৎ তিন জনই সূর্যের সন্তান ছিলেন। কিন্তু এই দাবীর ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। সূর্যা নিশ্চিত ঋগ্বেদে সূর্যের কন্যা বলে স্বীকৃত ; কিন্তু অশ্বিদ্বয় সূর্যের পুত্র বলে উল্লিখিত হয় নি। ঋগ্বেদে এই ভ্রাতৃদ্বয়কে এক জায়গায় 'দিবো নপাতা' বলা হয়েছে। (৩) তা সংস্কৃত নপ্তৃ শব্দের অনুরূপ। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায় তাঁরা আকাশের দৌহিত্র। একই সূক্তের ১৫ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ "রৌদ্রৌ অর্চিমন্তৌ নাসত্যৌ"। অর্থাৎ নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয় রুদ্রের সন্তান। ঋগ্বেদে রুদ্র সূর্য বা সবিতা হতে পৃথক দেবতা রূপে পরিকল্পিত। সুতরাং তাঁরা সূর্যের পুত্র নয়। এক্ষেত্রে তাঁদের সহিত সূর্যার ভগিনী সম্পর্ক আরোপ করা যায় না।

অবশ্য পুরাণে একটি কাহিনী আছে যার ভিত্তিতে তাদের এক-

৩। ঋগ্বেদ। ১০।৬১।৪

জনের সঙ্গে সূর্যার ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক আরোপ করা যায়। কাহিনীটি এই :

বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ হয়। সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পেরে তিনি ছায়া নামে এক নারীকে সূর্যের কাছে রেখে অশ্বীর দেহ ধারণ করে কুরুক্ষেত্রে গিয়ে আত্মগোপন করেন। সূর্য তখন অশ্বের দেহ ধারণ করে তাঁর অনুসরণ করেন এবং তাঁর সহিত মিলিত হন। ফলে তাঁদের অশ্বিনী ও রেবন্ত নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

কাহিনীটি কষ্টকল্পিত এবং উদ্ভট; পুরাণের কাহিনী যেমন হয়ে থাকে তার অনুরূপ। ঋগ্বেদে এঁদের নাম নাসত্য, অর্থাৎ অসত্য নয়, অর্থাৎ সত্য। বিকল্প নাম অশ্বিনৌ। অর্থাৎ তাঁদের রথ মনোরম অশ্ব কর্তৃক বাহিত হত। সে অর্থকে বিকৃত করে অশ্বিনীর কুমার বা পুত্ররূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যাই হক পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তিতে ঋগ্বেদের দেবতাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। এ বিষয় একটি নির্দেশ আছে যে শ্রুতির সঙ্গে পুরাণের বিরোধ ঘটলে শ্রুতির উক্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। এই নির্দেশ যুক্তি সম্মত। ঋগ্বেদ বহু প্রাচীন গ্রন্থ। পুরাণগুলি রচিত হয় মহাভারত তার পূর্ণরূপ ধারণ করবার পরে। ঋগ্বেদের তুলনায় তারা নিতান্তই অর্বাচীন গ্রন্থ। পুরাণের নিয়ন্ত্রণহীন কল্পনা যে কাহিনীর উৎস, তা এ বিষয় মীমাংসা করবার অধিকার রাখে না। ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারাই তা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

সুতরাং দশরথ জাতকের তথা পঞ্চম জাতকটির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্দ্ধারিত হবে প্রাচীন ভারতে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ সিদ্ধ বা প্রচলিত ছিল কিনা, সেই প্রশ্নের মীমাংসার ওপর। এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে ভ্রাতা

ও ভগিনীর বিবাহের কোনও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য ধর্মশাস্ত্রে তা নিষিদ্ধ। এমন কি বৈদিক সাহিত্যেও তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বরং বৈদিক সাহিত্যে এই ধরনের সম্পর্কের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে বর্ণিত যম ও যমীর কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের সম্পর্ক ভ্রাতা ও ভগিনীর। যমী যমকে তাঁর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে অনুরোধ করছেন। যম সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলছেন: 'তুমি আমার ভগিনী, সুতরাং অগম্যা'। (৪) তিনি আরও বলছেন, 'ভগিনীতে যে উপগত হয় সে পাপী'। সুতরাং ঋগ্‌বেদে শুধু তা বর্জিত নয়, নিন্দিত। এক্ষেত্রে সেকালে হিন্দুসমাজে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল, এই প্রতিপাদ্য একেবারেই সমর্থিত হয় না। কাজেই দশরথ জাতকে বর্ণিত এই কাহিনী নিতান্তই কল্পনা প্রসূত বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

এই প্রসঙ্গে শেষের জাতকে রাজা সুজাতের পুত্র ও কন্যার মধ্যে বিবাহের কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কাহিনীর মধ্যেই এমন পরিস্থিতির উল্লেখ আছে যা ইঙ্গিত করে সেকালে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল না এবং নিন্দনীয় ছিল। তা যদি না হবে, তবে পুত্র ও কন্যার বিবাহের খবর পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করলেন কেন? যদি এই ধরনের বিবাহ প্রচলিত থাকত, তা হলে পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের অনুমোদন প্রার্থনার প্রয়োজন হত না।

এই পরিস্থিতি এমন একটি সন্দেহ জাগাবার অবকাশ রাখে যে এইভাবে ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিবাহ

৪। ঋগ্‌বেদ। ১০।৬০।২

ঘটানোর পশ্চাতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। ভগবান বুদ্ধ যে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করে তার মর্যাদা বর্দ্ধিত করেছিলেন তা আমরা জানি। এমনও হতে পারে যে তাঁর কীর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাঁর ভক্তগণ তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার মর্যাদাকে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। এখন ইক্ষ্বাকু বংশ ভারতের প্রাচীনকালের রাজবংশগুলির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। রামের মত সত্যপরায়ণ আদর্শ রাজা যিনি পরবর্তীকালে অবতার বলে স্বীকৃতি লাভ করেন, তিনি এই বংশকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। সুতরাং শাক্যবংশের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা থাকে, যদি তার সহিত শাক্যবংশের একটি সংযোগসূত্র স্থাপন করা যায়। সেই জন্য এই কাহিনী।

দ্বিতীয়ত, একই উদ্দেশ্যে ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহকে সিদ্ধ করবার কল্পনা গড়ে উঠে থাকতে পারে। শাক্যবংশের পিতৃকূল ও মাতৃকূল উভয় দিক হতেই যে ইক্ষ্বাকু বংশের সহিত তা সংযুক্ত তা প্রমাণ করবার লোভ হয়ত যিনি এই কাহিনী রচনা করেছিলেন তাঁর সংবরণ করা সম্ভব হয় নি। এমনও হতে পারে তার সমর্থক প্রমাণ হিসাবে একটি নজির স্থাপনের জন্য সীতাকে রামের ভগিনী বলে দশরথ জাতকে স্থাপন করা হয়েছে। অবস্থাগুলি এমন সম্ভাবনারই ইঙ্গিত করে।

যদি সেই চেষ্টা হয়ে থাকে, তা হলে বলতে হয়, তার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। ভগবান বুদ্ধ নিজস্ব কীর্তিদ্বারা মণ্ডিত হয়ে এমন অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলেন যে তাঁর একক মহিমা দিয়েই তাঁর পিতৃকূল অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত হয়েছিল। তাঁর বংশকে অন্য এক বংশের সহিত কল্পিত অবাস্তব কাহিনী দিয়ে যুক্ত করবার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং তৃতীয় ও পঞ্চম জাতকের কাহিনী, তথা শাক্যবংশের উৎপত্তির কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতার

দাবী আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

রামায়ণ সমালোচক সি ভি বৈদ্যও একটি অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন দশরথ জাতকে রাম ও সীতার মধ্যে ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্পর্ক স্থাপন করা অভিসন্ধিমূলক ; রামকে বুদ্ধ হতে অভিন্ন প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যই হল বুদ্ধের বংশগৌরব বর্দ্ধন করা। (৫)

সুতরাং সীতা যে রামের ভগিনী ছিলেন এই কাহিনীকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। বাল্মীকি রচিত রামায়ণে যে কাহিনী বর্ণিত হয়ে দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল, তাকেই মর্যাদা দিতে হবে বেশী।

৫। C. V. Vaidya, The Riddle of the Ramayana দ্রষ্টব্য

পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা

(১)

লঙ্কা অভিযান কাহিনীর সম্ভাব্যতা

বাল্মীকি বর্ণিত রামকাহিনীর দুটি অংশ। প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয় হল কৈকেয়ীর ইচ্ছায় রামের চতুর্দশ বৎসরব্যাপী বনে নির্বাসন। এটি রামায়ণের মূল অংশ। দ্বিতীয়টি হল সীতা অপহৃত হলে, তাঁকে উদ্ধার করতে সুগ্রীবের বানরসৈন্যের সাহায্যে রামের লঙ্কায় অভিযান এবং রাবণের পরাজয় ও মৃত্যু। প্রথম অংশটির মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নাই। তাই তার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আপাত দৃষ্টিতে কোনও সন্দেহ আসে না। দ্বিতীয় অংশের মধ্যে এমন অনেক অসঙ্গতি আছে যা তার সম্ভাবনার সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বানরদের সাহায্যে রামের রাবণের সহিত যুদ্ধ। এমন ব্যাপার যে ঘটেছিল তা বিশ্বাস করা যায় না। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে রাবণের দশটি মুণ্ড ছিল। দশটি মুণ্ড পৌরাণিক কাহিনীতে সাজে ; কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনীতে তার স্থান নেই। তৃতীয়ত দশরথ জাতকে রামকাহিনীর লঙ্কা অভিযান অংশের উল্লেখ না থাকায়, তা আদৌ ঘটেছিল কিনা সে বিষয় প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। এই সব কারণে কাহিনীর দ্বিতীয় অংশটি প্রথমে আলোচনা করে নিলে সুবিধা হবে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে রামায়ণের কাহিনী যে সংস্কৃতির পরিবেশে স্থাপিত তার কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানাস্তরের যে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি একসঙ্গে বর্তমান ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, আর্য সংস্কৃতি

তখনও ভারতের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে নি। এই কথা মনে রেখে আমরা প্রস্তাবিত আলোচনা স্থুরু করতে পারি।

আর্যসংস্কৃতির ভারত উপমহাদেশে বিস্তার যে ধীরে ধীরে ঘটেছিল, তা একটি ঐতিহাসিক সত্য। সম্প্রতি হরাপ্পা সংস্কৃতি সম্বন্ধে তথ্য উদ্ঘাটিত হবার ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের চিত্রটি অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে স্থাপন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে বর্তমান কালে মানুষের ইতিহাসের একটি নূতন দিগন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে বিস্তারিত ভাবে না হলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোটামুটি একটি ইতিহাস গড়া যায়। তার অবলম্বন হল প্রাচীন কালের ঢিবি খুঁড়ে আদিম মানুষের ব্যবহৃত যে সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি হতে সংগৃহীত তথ্য। যেমন কাটবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত পাথরের কুঁচি, মৃৎপাত্র, কঙ্কাল এবং তাদের সঙ্গে প্রোথিত অন্য জিনিস-পত্র। আদিম মানব সুবিধা পেলে শীত হতে পরিত্রাণের জন্য গুহায় বাস করত। সেখানে দেয়ালের গায়ে আদিম-মানব জাতির অঙ্কিত কিছু চিত্রের নিদর্শনও পাওয়া যায়।

পরে যেমন আদিম-মানব-গোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতির অগ্রগতি হতে লাগল, তেমন তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রাদিরও উন্নতি হতে লাগল। মানুষের ব্যবহৃত পাথরের কুঁচি আরও মসৃণ রূপ ধারণ করল এবং সুদৃশ্য হল। কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হলে হাড়ের লাঙ্গল এল। আরও পরে তামা আবিষ্কার হল, টিন আবিষ্কার হল। তাদের মিশ্রিত করে ব্রঞ্জ এল; তাকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে নানা অস্ত্র নির্মিত হল। আরও পরবর্তীকালে কৃষিবিদ্যা রীতিমত আয়ত্ত হল। ফলে জনপদ গড়ে উঠল, অশ্বযান এল, এমন কি গণনারীতি এবং লিপিমালাও উদ্ভাবিত হল।

এই সব নিদর্শন হতে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন: প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নূতন প্রস্তর যুগ এবং নগর ভিত্তিক সংস্কৃতির যুগ। প্রথম আসে প্রাচীন প্রস্তর যুগ। সে যুগের মানুষ পাথরের কুঁচির ভোঁতা টুকরো অস্ত্র বা সহায়ক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। তা দিয়ে তারা শিকার করা পশুর ছাল ছাড়াত বা জিনিসপত্র কাটত। তারা আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। তা দিয়ে শীত নিবারণ করত বা মাংস পুড়িয়ে খেত। তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি, খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত।

তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হল একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। মানুষ তখন খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল। পশু পালন এবং কৃষি তার জীবিকার অবলম্বন হল। তখন তার পাথর খণ্ড হতে যন্ত্র নির্মাণের দক্ষতা বাড়ল। তার পাথরকুঁচির যন্ত্র আরও মসৃণ ও সুদৃশ্য হল। এতদিন তার বন্যপশু শিকার করে বা ফল-মূল সংগ্রহ করে বা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। এখন শস্য উৎপাদন করে সে খাদ্যশস্য মজুত করতে শিখল। গৃহপালিত পশুর মাংস ও দুধ তার খাদ্য ভাণ্ডারকে হাতের নাগালে আনল। ফলে তার জীবনযাত্রার রীতি একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে যাযাবর জীবন ত্যাগ করে জনপদ গড়ে তুলতে শিখল। সেই কারণে তাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম বিপ্লব বলা হয়। এই যুগের নাম হল দ্বিতীয় প্রস্তর যুগ।

তারপর আরও একটি বিপ্লব এল। এই সময় মানুষ ধাতুর ব্যবহার করতে শিখল। তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রঞ্জ উৎপাদিত হল। তা দিয়ে নানা অস্ত্র নির্মিত হল। মানুষ ইট পোড়াতে শিখল। তা দিয়ে পাকা বাড়ী নির্মাণ যেমন সম্ভব হল, তেমন নিত্য ব্যবহারের জন্য হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি মাটির পাত্র নির্মাণ করতে মানুষ শিখল।

এই সব কৌশল আয়ত্ত হবার ফলে মানুষ নগর গড়ে তুলল। কৃষির সুবিধার জন্য পঞ্জিকা উদ্ভাবিত হল। হিসাব রাখতে এবং দলিল লিখতে লিপিমালা উদ্ভাবিত হল। ফলে সমাজবিন্যাস রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে গেল। কর্মের প্রকৃতি অনুসারে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হল। নগরকে কেন্দ্র করে এই নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠল বলে তাকে নগরভিত্তিক সংস্কৃতি বলা হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এটি হল দ্বিতীয় বিপ্লব।

গর্ডন চাইল্ডের ধারণায় প্রাচীন প্রস্তর যুগের আরম্ভ হয় সম্ভবত আড়াই লক্ষ বছর আগে। তা প্রায় দুলক্ষ বছর স্থিতাবস্থায় ছিল। মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এই সংস্কৃতির লক্ষ্য করবার মত পরিবর্তন সুরু হয়। এই উপসংস্কৃতিকে পরিণত পুরাতন প্রস্তর যুগ বলা হয়। (১)

তার অনেক পরে, এখন হতে মাত্র আট হাজার বছর আগে নূতন প্রস্তর যুগ এল। তখন মানুষ খাদ্য-আহরণকারী জীব হতে উন্নীত হয়ে খাদ্য-উৎপাদনকারী জীবে পরিণত হল। অর্থাৎ সে চাষ করতে ও পশুপালন করতে শিখল। একেই নূতন প্রস্তরযুগ বলে। এই যুগের শেষে মানুষ কতকগুলি নূতন দক্ষতা আয়ত্ত করেছিল যা দ্বিতীয় বিপ্লবের পথ খুলে দিয়েছিল। সে কৌশলগুলির মধ্যে ছিল প্রাকৃতিক শক্তি বা পশুশক্তির ব্যবহার, লাঙ্গল উদ্ভাবন, চাকাযুক্ত গাড়ী উদ্ভাবন, ইট নির্মাণের দক্ষতা এবং ধাতু ব্যবহার সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যা। ২)

এই সব দক্ষতা আয়ত্ত হবার ফলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হল যে দ্বিতীয় বিপ্লবটি ঘটে গেল। এতদিন প্রত্যেক গোষ্ঠী বা

১। Upper Paleolithic Age

২। এই প্রসঙ্গে Gordon Childe প্রণীত Man Makes Himself গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

পরিবার আত্মকেন্দ্রিক বা স্বয়ংনির্ভর ছিল। এখন আর এই ধরনের সরল সমাজবিন্যাসকে ধরে রাখা সম্ভব হল না। এত নূতন ধরনের কাজের উদ্ভব হল যে একই পরিবারের মানুষ সব রকম কাজ করতে পারল না। সুতরাং বিভিন্ন জীবিকার উদ্ভব হল। কেউ হল কৃষক, কেউ হল পশুপালক, কেউ কারিগর ইত্যাদি। এইভাবে জীবিকার প্রকারভেদে সমাজের বিন্যাস জটিল রূপ ধারণ করল। ফলে সমাজের বিন্যাস রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই নূতন সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনে এক নূতন শাসকগোষ্ঠীর উদ্ভব হল। ফসলের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত হওয়ায় নগর গড়ে উঠল। এইভাবে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দীতে প্রাচীন সংস্কৃতির রূপ আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই পরিবর্তন মিশর দেশ, সুমেরিয়া এবং ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় মোটামুটি একই সময় বিকাশ লাভ করেছিল। ছোট ছোট কৃষকের খামার আর তখন সমাজবিন্যাসের মূল উপাদান হয়ে রইল না। সমাজবিন্যাস নূতন রূপ ধারণ করল। রাষ্ট্র এল সবার উপরে। রাষ্ট্রের পরিচালকরা পেল সবার উপরের শ্রেণীর মর্যাদা। তার তলায় রইল নানা স্তরে নানা শ্রেণী। তাদের কেউ প্রাথমিক উৎপাদক, কেউ নয়। প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেল রাজপরিবারের মানুষ, পুরোহিত, মসীজীবি ও রাজপুরুষ। তাদের নীচে স্থান পেল বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর, পেশাদার সৈন্য ও শ্রমিক।

পিগোটের মতে (৩) প্রাচীন ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত নগরভিত্তিক সংস্কৃতি খৃষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে তার পূর্ণ মহিমায় অধিষ্ঠিত ছিল। তারপর উত্তর-পশ্চিম হতে আর্যজাতি এসে তাদের আক্রমণ করল। ফলে ভারতের নগর সংস্থতির বাহক মানুষদের সহিত আর্যদের এক দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ ঘটল। আর্যরা তুলনায় এক

৩। এই প্রসঙ্গে Pigott প্রণীত Prehistoric India, Chap. VII দ্রষ্টব্য।

নিকৃষ্ট সংস্কৃতির ধারক ছিল। তারা গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত, পশুপালন ও কৃষি ছিল তাদের জীবিকার মূল অবলম্বন। অপর পক্ষে সিন্ধু উপত্যকার মানুষ প্রাকারবেষ্টিত সুরক্ষিত নগরে বাস করত। মনে হয় আর্যজাতির প্রাণশক্তি প্রবলতর ছিল। ফলে প্রযুক্তিবিদ্যায় নিকৃষ্ট হয়েও ধীরে ধীরে এই সংস্কৃতিকে পরাজিত করে সিন্ধু অঞ্চলে তাদের আধিপত্য স্থাপন করল। তারা ধীরে ধীরে ভারতের উত্তর অংশে বিস্তৃতি লাভ করল। হরাপ্পা সংস্কৃতির মানুষ ফলে তাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হল। যখন সংঘর্ষ চলত তখন তাদের নাম ছিল দস্যু, পরাজয়ের পর তাদের নাম হল দাস এবং আর্য সংস্কৃতি ভাল ভাবে স্থাপিত হবার পর তারা আর্যদের সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীতে রূপান্তরিত হন। এই শ্রেণীগুলিকে বর্ণ বলা হত। হরাপ্পা সংস্কৃতির মানুষ শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত হল। মনে হয় বৈদিক সংস্কৃতি ভারতে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে গড়ে উঠেছিল। যে তথ্যের উপর এই অনুমান স্থাপিত তা ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এরপর ভারতে আর্য সংস্কৃতির বিস্তার ধীরে ধীরে অনেক শতাব্দী জুড়ে ঘটেছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি তা রামায়ণের যুগে দাক্ষিণাত্যে বিস্তার লাভ করেনি। এমন কি আর্যাবর্তের পূর্ব সীমানায়ও পৌঁছায় নি। মহাভারতে দেখি, সমগ্র ভারতেই তা বিস্তার লাভ করেছে। রামায়ণের কাহিনী অনুসারে রামের অধিনায়কত্বেই দক্ষিণ ভারতে আর্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। রামায়ণের কাহিনীর তাৎপর্য তাই। রামের অধিনায়কত্বে ঘটুক বা না ঘটুক আর্য সংস্কৃতির দাক্ষিণাত্যে যে বিস্তার ঘটেছিল তা যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, তা অনস্বীকার্য।

(২)

কিষ্কিন্ধা ও লঙ্কার সংস্কৃতির প্রকৃতি

এখন প্রশ্ন হল ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে আর্য সংস্কৃতির বিস্তারে রাম যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, সত্যঘটিত ইতিহাসরূপে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য। এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে রামায়ণের কাহিনীর ইতিহাস হিসেবে মূল্য আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর। সে প্রশ্নটি পরে আলোচিত হলে সুবিধা হবে। তবে তার আগে রামায়ণের কাহিনীর এই অংশের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে একটি পৃথক আলোচনা হতে পারে। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কাহিনীর এই অংশে যে অপ্রাকৃত ঘটনাগুলির উল্লেখ আছে তাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন কিষ্কিন্ধার রাজা সুগ্রীবের অধীনে বানর সৈন্যের রাবণের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ আদৌ সম্ভব ছিল কি না। যেমন রাবণের যে দশানন বলে খ্যাতি তা সত্যই সূচিত করে কি না। যে রামায়ণ কাহিনীতে রাবণের দশটি মুণ্ড থাকা তাকে অবাস্তব এবং কল্পিত বলে প্রমাণ করে কি না। যদি সত্যই তা হয়ে থাকে তা হলে রামায়ণের কাহিনীর বিশ্বাস যোগ্যতার দাবী দুর্বল হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে উভয় গোষ্ঠীর যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল তার সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা লঙ্কা নগরীর বৈভবের একটি পরিচয় পাই সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। সীতা কোথায় আছেন তা অন্বেষণ করে বাহির করবার জন্য যে সব বানর নেতা প্রেরিত হয়েছিলেন হনুমান তাঁদের অন্যতম। তিনি ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কাদ্বীপে সীতার অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি লঙ্কানগরীর যে রূপ দেখলেন তা এই সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। তিনি লঙ্কানগরীর কাছে উপস্থিত হয়ে

দেখলেন তা চারিদিকে পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। (৪) আরও দেখলেন অতিরিক্ত ভাবে তা একটি প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। (৫) তা বহু অট্টালিকা শোভিত একটি নগরী। (৬) তা ত্রিকূট পর্বতের উপর অবস্থিত।

এই বর্ণনা হতে অনুমান করা যায় যে লঙ্কা নগরী প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি নগরভিত্তিক সংস্কৃতির নিদর্শন। আর্যদের ভারতে আগমনের আগে হতেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই নগরভিত্তিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর দুটির সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে। এমনও হতে পারে সমুদ্রপথে হরাপ্পা সংস্কৃতির লঙ্কায় বিস্তার ঘটেছিল। অর্থাৎ লঙ্কার সংস্কৃতি হরাপ্পা সংস্কৃতির উপনিবেশ স্থানীয় ছিল। তা যে সম্ভব তার প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়। আমরা জানি যে হরাপ্পা সংস্কৃতির সমুদ্রপথে সুমেরিয়ার সহিত বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল। কাজেই ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপের সহিত হরাপ্পা সংস্কৃতির যারা ধারক ছিল তাদের পক্ষে সংযোগ স্থাপন করা বেশ সম্ভব বলে মনে হবে। তাদের পক্ষে ত্রিকূট পর্বতে একটি নগরী নির্মাণ করে একটি নূতন উপনিবেশ গড়াও সম্ভব ছিল। এমনও হতে পারে, আর্যদের উত্তর-পশ্চিম দিকে ভারত আক্রমণের ফলে হরাপ্পা সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেলেও সুদূর লঙ্কাদ্বীপে তাদের যে উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল তা অটুট রয়ে গিয়েছিল। দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় তা বাহিরের আক্রমণ হতে তুলনায় নিরাপদ ছিল। সেই কারণে রামায়ণের যুগেও তা সংরক্ষিত অবস্থায় বর্তমান ছিল। অন্তত এই ধরনের একটা সম্ভাবনাকে আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না।

৪। সুন্দরকাণ্ড। ২। ১৪

৫। একই। ২। ১৬

৬। একই। ২। ১৭

এমনও হতে পারে ত্রিকূট পর্বতে প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে খননকার্য পরিচালিত হলে, এই সংস্কৃতির নিদর্শন প্রোথিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হতে পারে। হোমার রচিত ইলিয়ড-এর কাহিনীকে এক সময় ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিতে ঐতিহাসিকগণ প্রস্তুত ছিলেন না। বহুকাল পরে জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক হাইনরিখ শ্লিয়ারমান (৭) যখন সেখানে নিজে উদ্যোগী হয়ে খননকার্য পরিচালনা করেন, তখন বিভিন্ন সংস্কৃতির অনেকগুলি আস্তরণ সেখানে আবিষ্কৃত হয়। তার ফলে ইলিয়ডে বর্ণিত গ্রীক রাজাদের ট্রয় অভিযান কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃতি লাভ করে। গবেষণা করে ত্রিকূট পর্বতের কাছে সম্ভাব্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে যদি খননকার্যের ব্যবস্থা হয়, তা হলে হয়ত লঙ্কানগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হয়ে পড়তে পারে। বহু প্রাচীনকাল হতে লিখিত আকারে এমন নগরীর কাহিনী অকারণে জীবিত রাখা হয় না; তার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকার বেশ সম্ভাবনা আছে।

রামায়ণের কাহিনী অনুসারে কিষ্কিন্ধার অধিবাসীরা বানর জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের কপি, হরি, প্লবঙ্গম, বানর প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। হনুমানের লেজও দারুণ খ্যাতিলাভ করেছে। অথচ পাই তাদের একটি রাজ্য আছে, সমাজ আছে, বিবাহ আছে। কাহিনীর এই দুই অংশের মধ্যে একটি অসঙ্গতি এসে পড়ে। সুতরাং তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলে কিনা তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

রামায়ণের কাহিনীতে আমরা পাই সীতা অপহৃতা হবার পর রাম, লক্ষ্মণসহ তাঁর অন্বেষণ করতে করতে দক্ষিণে পম্পা সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেন। কাছেই ঋষ্যমুখ পর্বতে সুগ্রীব তাঁর বিশ্বস্ত

৭। Heinrich Sahliermann

অনুচর হনুমান ও আর কয়েকজন বানর নেতাসহ বাস করছিলেন। সুগ্রীব প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কিষ্কিন্ধার রাজা বালীর অনুজ ভ্রাতা। একবার বালী মায়াবী নামে এক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে এক গর্তে দীর্ঘকাল অদৃশ্য হয়েছিলেন। সুগ্রীব তখন ধরে নিয়েছিলেন যে বালী মারা গেছেন এবং শূন্য সিংহাসন নিজে অধিকার করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে বালী সুগ্রীবের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং সুগ্রীবের পত্নী রুমাকে নিজের অন্তঃপুরে রেখেছিলেন। অগত্যা সুগ্রীব নিজের নিরাপত্তার জন্য ঋষ্যমুখ পর্বতে গিয়ে বাস করছিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ যখন সীতার অন্বেষণে পম্পা সরোবরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এসেছিলেন তখন সুগ্রীব তাঁদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। হনুমানের সাহায্যে তাঁদের ঋষ্যমুখ পর্বতে আনা হয়। সেখানে রাম ও সুগ্রীব পরস্পরের সহিত পরিচিত হন। উভয়েই দুর্ভাগ্য-পীড়িত। নিজেদের কাহিনী পরস্পরকে জানান। সুগ্রীব আরও জানান যে আকাশমার্গে রাবণ কর্তৃক বলপূর্বক নীয়মান অবস্থায় সীতা ঋষ্যমুখ পর্বতে তাঁর কিছু অলঙ্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন তাঁরা পরস্পরের সহিত মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার একটি চুক্তিও করেন। রাম প্রতিশ্রুতি দেন বালীকে অপসারিত করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজপদে অধিষ্ঠিত করবেন। প্রতিদানে সুগ্রীব প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তাঁর বানর অনুচরদের সাহায্যে সীতা কোথায় আছেন অনুসন্ধান করে বার করবেন এবং পরে তাঁকে উদ্ধারের জন্য বানরসৈন্য দিয়ে রামকে সাহায্য করবেন।

আপাত দৃষ্টিতে এই কাহিনী অবাস্তব মনে হবে। যুদ্ধ কার্যত বানরদের মত ইতর প্রাণীদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। এখন প্রশ্ন ওঠে কিষ্কিন্ধাবাসী সুগ্রীবের প্রজারা কি সত্যই বানর

ছিল ? তারা যে নিজেদের বানর বলে পরিচয় দিত তা স্বীকৃত। হনুমানের লাঙ্গুল যে লঙ্কা দাহ করতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল, তাও রামায়ণে বেশ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত। কাজেই মনে হবে কাহিনীটি উদ্ভট।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পাঠ করলে দেখা যাবে যে মূল রামায়ণের মধ্যেই এমন অনেক তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে যা ইঙ্গিত করে কিষ্কিন্ধাবাসীরা সত্যই বানর ছিল কিনা তা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে। দেখা যায় এই গোষ্ঠীর সমাজ ছিল, বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, রাজা ছিল। অর্থাৎ এমন বহু তথ্য পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে একটি সংঘবদ্ধ মানব গোষ্ঠীর মত তাদের জীবনধারণ রীতি গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য স্থাপন করা যেতে পারে।

রামের কাছে ঋষ্যমুখ পর্বতে সুগ্রীব তাঁর নিজের দুর্দশার যে কাহিনী স্থাপন করেছেন, তাতে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি অনুযোগ করেছেন যে বালী যখন তাঁকে রাজপ্রাসাদ হতে তাড়িয়ে দেন, তাঁকে সঙ্গে কোনও ব্যবহার্য বস্ত্র আনতে দেননি ; যে বস্ত্র তাঁর পরিধানে ছিল কেবল তাই তাঁর সঙ্গে এসেছিল। (৮) বানরজাতির কাপড় পরবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। সুগ্রীবের জীবনযাত্রা রীতি মানুষের অনুরূপ।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি তথ্য আমরা পাই। সুগ্রীব অতিরিক্ত অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁকে বিতাড়িত করবার পর বালী সুগ্রীবের পত্নী রুমাকে তাঁর অন্তঃপুরে এনে তাঁর সহিত সহবাস করেছিলেন। রামের কাছে যে বালীর এই আচরণ খুব নিন্দনীয় মনে হয়েছিল তার পরিচয় পরবর্তী ঘটনায় মিলবে। সুগ্রীব এবং বালী যখন পরস্পর যুদ্ধে রত বালী তাঁকে পরাজিত করে ফেললে

৮। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড। ১০। ২৬

সুগ্রীবের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ল। অগত্যা তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য বালীকে বাণ মেরে রাম মারত্মক ভাবে জখম করলেন। তখন বালী তাঁকে ভৎর্সনা করেছিলেন এই বলে, যে রামের ত তিনি কোনও ক্ষতি করেনি তবু তাঁকে এমন ভাবে আক্রমণ করা হল কেন? তার উত্তরে রাম এই বলেছিলেন ঃ ভ্রাতৃবধুর কাছে স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার সমতুল্য। বালী সুগ্রীবের পত্নী রুমার সহিত সহবাস করে অধর্ম আচরণ করেছেন। তাই তিনি বালীকে এই দণ্ড দিলেন। ভ্রাতার ভার্যাকে ধর্ষণ করবার জন্য তাঁর এই দণ্ড। ৯

সুতরাং দেখা যায় এই গোষ্ঠীর মধ্যে শুধু সমাজ ছিলনা, সেই সমাজ উচ্চমানের নৈতিক আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনুজের পত্নীর সহিত অগ্রজের সহবাস অত্যন্ত বিগর্হিত কর্ম বলে বিবেচিত হত। বানর জাতি কেন, অনুন্নত শ্রেণীর মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের নীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না।

আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। রাবণের সহিত যুদ্ধে বিজয়লাভের পর সীতার সহিত রাম যখন অযোধ্যায় এলেন, তখন ভরত তাঁকে স্বাগত জানালেন। রামের সঙ্গে সুগ্রীব এবং তাঁর কিছু নেতৃস্থানীয় বানরও এসেছিলেন। সেখানে যে বর্ণনা পাই, তাতে বলা হয়েছে এই বানর গোষ্ঠী মানুষের রূপ ধারণ করে ভরতের কাছে এসে তাঁর কুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। 'তে কৃত্বা মানুষং রূপং বানরাঃ কামরূপিণঃ কুশলং পর্যপৃচ্ছন্।' (১০) সুতরাং দেখা যায় এই বানর গোষ্ঠী কামরূপী ছিল, অর্থাৎ ইচ্ছামত বানররূপ বা মানুষরূপ ধারণ করত। তা যদি হয় তাদের প্রকৃতরূপ যে বানররূপ সে বিষয় বেশ সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

৯। ভ্রাতৃভার্যাভিমর্ষেঽস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদতঃ।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১৮। ২০

১০। যুদ্ধকাণ্ড ১২৭। ৪৫

সুগ্রীবের অনুচর বানরগণ যে ইচ্ছামত বানররূপ বা মানুষরূপ ধারণ করতে পারতেন তার আরও একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেটি আছে যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ সর্গে। তাৎপর্য গ্রহণের সুবিধার জন্য প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। পরিবেশটি এই : রাম সসৈন্যে লঙ্কায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইতিপূর্বে সমুদ্র অতিক্রমণের পূর্বেই বিভীষণ রাবণকে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য বারবার অনুরোধ করায়, রাবণ বিরক্ত হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অগত্যা বিভীষণ তখন তাঁর চারজন বিশ্বস্ত অনুচর সহ সমুদ্র অতিক্রম করে রামের নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। রাম তাঁকে গ্রহণ করেছেন। এই পরিবেশে লঙ্কায় যুদ্ধ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে বিভীষণের কাছে লঙ্কার সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে রাম তাঁর দলের বিশিষ্ট নেতাদের কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশের অঙ্গ হিসাবে এই তিনটি শ্লোক পাওয়া যায় :

ন চৈব মানুষং রূপং হরিভিঃ কার্য মাহবে।
এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরে বলে॥
বানরা এব নশ্চিহ্নং স্বজনেঽস্মিন্ ভবিষ্যতি।
বয়ং তু মানুষেনৈব সপ্ত যোৎসামহে পরান্॥
অহমেব সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন মহৌজসা।
আত্মনা পঞ্চমশ্চায়ং সখা মম বিভীষণঃ॥ (১১

এখানে আমরা কিছু নূতন কথা পাচ্ছি। প্রথমত রাম উপদেশ দিচ্ছেন যে হরিগণ যুদ্ধের সময় মানুষের রূপ ধারণ না করে বানররূপেই চিহ্নিত থাকবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর দলের সাত ব্যক্তি মানুষের বেশে যুদ্ধ করবেন। তাঁরা হলেন রাম ও লক্ষ্মণ এবং চারজন অনুচর সহ বিভীষণ। দেখা যায় বিভীষণকে তিনি সখা বলে বর্ণনা করেছেন।

১১। সুন্দরকাণ্ড। ৩৭। ৩৩-৩৫

অর্থাৎ বিভীষণের ওপর তাঁর এমন আস্থা জন্মেছে যে তিনি আশা করেন বিভীষণ ও তাঁর চার সঙ্গীসহ রামের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবেন। সে যাই হক, উপরের নির্দেশের দুটি তাৎপর্য আছে। প্রথমত, তা দেখায় যে সুগ্রীবের সৈন্যদল মানবরূপ ধারণ করবারও ক্ষমতা রাখত এবং দ্বিতীয়ত, বিভীষণ ও তাঁর চার অনুচর মানবদেহধারী ছিলেন। তাঁরা পাঁচজন এবং রাম ও লক্ষ্মণ নিয়ে দুইজন, এই সাতজন, মানুষের আকারেই যুদ্ধ করবেন ; এই হল রামের নির্দেশ। সুতরাং লঙ্কাবাসীরা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ না হয়ে যায় না।

এই নির্দেশ রাম অকারণে দেননি। মনে হয় তার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা রামের সেনাপতির ভূমিকায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। আমরা দেখছি লঙ্কার যুদ্ধে রাক্ষসগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করে। তাদের সেনাধ্যক্ষগণ রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করে। অপর পক্ষে বানর সৈন্যগণ কোনও অস্ত্র ব্যবহার করে না। এমন কি তাদের নায়ক সুগ্রীবও অস্ত্র ব্যবহার করেন না। তার সুন্দর প্রমাণ মিলবে যুদ্ধকাণ্ডের প্রথম অংশে। (১২) সেখানে দেখতে পাই লঙ্কার পরিবেশ সম্বন্ধে পরিচিত হবার জন্য রামসহ যখন তিনি সুবেল পর্বতে গেলেন, সেখানে হঠাৎ রাবণকে দেখতে পেলেন। সেই সুযোগ ব্যবহার করতে সুগ্রীব রাবণকে আক্রমণ করলেন। তখন দুজনের মধ্যে হস্তাহস্তি যুদ্ধ হল। অনুমান করা যায় রাবণ তখন অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন না এবং শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটবে ভাবতে পারেননি। তা না হলে হস্তাহস্তি যুদ্ধ ঘটা সম্ভব নয়। সুতরাং অনুমান করা যায় তথাকথিত রাক্ষসজাতি প্রযুক্তি-বিদ্যায় বেশ পারদর্শী ছিল ; অপর দিকে সুগ্রীব যে গোষ্ঠীর নেতা তা তুলনায় প্রযুক্তিবিদ্যায় অনগ্রসর ছিল। প্রস্তরযুগের মানুষের মত তারা প্রস্তর খণ্ড বা গাছের ডাল নিয়ে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত।

১২। যুদ্ধকাণ্ড। ৪০তম সর্গ

এই ধরনের যুদ্ধে দুই আততায়ী দলের পরস্পর মিশে যেতে হয়। খুব কাছে না গেলে লাঠি দিয়ে বা গাছের ডাল দিয়ে যুদ্ধ বা হস্তাহস্তি যুদ্ধ সম্ভব নয়। রাক্ষস সৈন্যদের সহিত বানরসৈন্যর অন্য রীতিতে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। সম্ভবত সেই কারণেই রাম সুগ্রীবের সৈন্যদের বানর বেশে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন। তা হলে যুদ্ধের সময় তারা কে নিজের দলের মানুষ, কে বিপক্ষের মানুষ তা চিনতে পারবে। আজকাল ফুটবল খেলায় প্রতিযোগী দল দুটি পরস্পরকে চেনবার সুবিধার জন্য বিশেষ রঙে রঞ্জিত গাত্রবাস ধারণ করে। মনে হয় রামের নির্দেশের যুক্তিও অনুরূপ কৌশল অবলম্বনের জন্য। অপরপক্ষে যে সাতজন মানুষ রূপেই যুদ্ধ করবেন তাঁরা অস্ত্র ব্যবহার করবেন। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।

এক্ষেত্রে রামের বানরসৈন্য আর প্রকৃত বানর জাতীয় জীব থাকেনা। তারা এক অনগ্রসর মানব জাতিতে পরিণত হয়। তারা মানুষের রূপ ধারণ করবার ক্ষমতা রাখে, মানুষের বুদ্ধি ধারণ করে এবং মানুষের মত দলপতির অধীনে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে যুদ্ধ করতে পারে। অবশ্য তারা অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে না। তা ইঙ্গিত করে তারা প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেনি। তার সঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অতিরিক্ত তথ্য মিলে যায় যে তারা ফল-মূল ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করত। [১৩] এক্ষেত্রে তাদের একটি নিকৃষ্ট সংস্কৃতির অধিকারী মানবগোষ্ঠী রূপে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। প্রাচীন প্রস্তরযুগে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না; তারা ফল-মূল-আদি সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত। তারা যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্র নির্মাণ করতে শেখেনি। প্রস্তর-খণ্ডই তাদের ব্যবহার্য যন্ত্র এবং হাতিয়ার। এমন হতে পারে যে

১৩। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড। ১৭। ২৫

রামায়ণের যুগে দক্ষিণভারতের অভ্যন্তর ভাগে এমন এক প্রাচীন প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির বাহক মানবগোষ্ঠী কিষ্কিন্ধা অঞ্চলে বাস করত। বর্তমানকালেও আণবিক যুগের প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী মানুষের পাশাপাশি এখনও প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ আছে। উদাহরণ স্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের আদিম অস্ট্রেলিয় জাতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং বলা যেতে পারে কিষ্কিন্ধাবাসীরা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত তবে তারা আদি প্রস্তরযুগের মানুষ ছিল।

এই প্রতিপাদ্যের বিপক্ষে একটি বড় বাধা হল যে এই গোষ্ঠী সবত্র বানর বা কপি শ্রেণীর জীব বলে বর্ণিত হয়েছে। তবে তারও একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মিলতে পারে। আমরা দেখি অনেক মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টি অনেক সময় একটি বিশেষ দ্রব্য বা উদ্ভিদ বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। আকর্ষণের যেটি বিষয় তার যে নিজস্ব বিশেষ মূল্য আছে তা নয়; ঘটনাচক্রে তা বিশেষ গোষ্ঠীর মনে স্থান করে নিয়েছে। ফলে সেই গোষ্ঠীর উপর তার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হত।

এর দৃষ্টান্ত যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষিত হয়, তেমন বর্তমানকালে নানা সভ্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও লক্ষিত হয়। অনগ্রসর গোষ্ঠী অনেক সময় একটি বিশেষ জীবকে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মনে করে তাদের হত্যা নিষেধ করে দেয়। এই ধরণের নিষেধকে ট্যাবু (Taboo) বলে। সভ্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন হিন্দুরা গরুকে মাতা জ্ঞান করে গোহত্যা নিষেধ করেছে। এই প্রসঙ্গে অচেতন পদার্থ রূপে ক্রিশ্চানদের ক্রুশধারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। খৃষ্টের আত্মোৎসর্গের সহিত জড়িত হয়ে তা এই মর্যাদা পেয়েছে। বিভিন্ন জাতির জাতীয় পতাকাও তার একটি দৃষ্টান্ত। অনগ্রসর জাতিরা

যখন এই ধরনের রীতি প্রচলিত করে তখন এই বিশেষ দ্রব্যটিকে প্রতীক বলা হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর জাতির কোনও বিশেষ দ্রব্য বা জীবের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি ঘটলে তাকে বলা হয় টোটেম (Totem)।

এমনও হতে পারে কিষ্কিন্ধাবাসীরা প্রকৃতপক্ষে এক অনগ্রসর প্রাচীন প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির ধারক মানবগোষ্ঠী ছিল। যাদের নিকট বানরজাতি বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। তারা এই মানবগোষ্ঠীর নিত্য সহচর হওয়ায় তাদের প্রতি এদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সেই কারণে তারা বানরজাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা সূচিত করতে নিজেদের বানরের সগোত্র বলে পরিচয় দিত। অনুরূপ দৃষ্টান্ত বর্তমান কালেও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদের কোনও গোষ্ঠী কাঙ্গারুকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছে, কোনও গোষ্ঠী এমু নামে উটপাখীর অনুরূপ এক শ্রেণীর পাখীকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছে। তাদের কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার জাতি কি, সে বলবে, আমি কাঙ্গারু, বা আমি এমু। রাল্ফ্ লিণ্টনের গ্রন্থে এই দৃষ্টান্ত দুট স্থাপিত হয়েছে। (১৪) সুতরাং তারা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও যে নিজেদের বানরজাতি বলে পরিচয় দেবে তা অসম্ভব নয়। এই ধরনের অনুমান যে একেবারেই কষ্টকল্পিত তা বলা যায় না। বরং বিষয়টি সম্বন্ধে সকল দিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত করলেই আপাতদৃষ্টিতে যে অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হয়, তার একটি মীমাংসা হয়ে যায়।

সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে কিষ্কিন্ধাবাসীরা অনুরূপ ভাবে নিজেদের বানর না হয়েও বানর বলে পরিচয় দিত

১৪। এই প্রসঙ্গে Ralph Linton প্রণীত The Study of Man গ্রন্থের ২৪তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এবং সম্ভবত কেউ কেউ বানরের প্রতীক হিসাবে লাঙ্গুল ধারণ করত। এই প্রসঙ্গে আমরা আরও লক্ষ্য করতে পারি যে হনুমান ছাড়া অন্য কোনও বানর নেতার লাঙ্গুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রামায়ণে উক্তি পাওয়া যায় না। হনুমানের লাঙ্গুলের সহিত লঙ্কাদাহ ব্যাপারটি সংযুক্ত হয়ে পড়ায় তাঁর সহিত লাঙ্গুলের সম্পর্ক অতি মাত্রায় আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে সুগ্রীবের বাহিনী লঙ্কা অভিযানে ভূমিকা গ্রহণে যোগ্যতা রাখত কিনা এই সন্দেহের ভিত্তি থাকে না। তারা প্রকৃত পক্ষে বানর জাতি নয়, এক অনগ্রসর মানবগোষ্ঠী ছিল বলে ধরে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে এই অসঙ্গতি হেতু রামের লঙ্কা অভিযান কাহিনীকে অবাস্তব বলে ধরে নেওয়ার যুক্তি থাকে না।

(৩)

রাবণ কি দশানন ছিলেন ?

যুদ্ধ-অভিযান কাহিনীর আর একটি মৌলিক অসঙ্গতি আছে, যা তাকে অবাস্তব করে তোলে। রামায়ণে লঙ্কার অধিপতি রাবণকে দশমুণ্ডধারী এবং বিংশতি হস্তধারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই বর্ণনা কল্পনাপ্রসূত ; কারণ, প্রকৃতিতে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই বিষয়টি সম্বন্ধেও রামায়ণের মধ্যেই এমন কতকগুলি তথ্য মিলে যায় যা রাবণের দশাননত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের উদ্রেক করে।

রামায়ণের বহু স্থানে রাবণকে দশানন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি সুন্দরকাণ্ডেও পাই যে হনুমানকে যখন রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় রাজসভায় বাবণের নিকট স্থাপন করা হল, তখন হনুমান দেখলেন রাবণ দশটি মুকুট শোভিত শির ধারণ করে আছেন। তাঁর যে রূপ হনুমান দেখেছিলেন তা কবি এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

শিরোভির্দশভির্বীরো ভ্রাজমানং মহৌজসম্।
নানাব্যাল সমাকীর্ণৈঃ শিখরৈরিব মন্দরম্॥ (১৫)

অর্থাৎ রাবণকে তিনি দেখলেন দশটি শির ধারণ করে শক্তির আকর রূপে বর্তমান ; তিনি নানা হিংস্র পশু সমাকীর্ণ শিখররাজি শোভিত মন্দর পর্বতের মত শোভা পাচ্ছিলেন।

সেই হনুমানই তার পূর্বের রাত্রে রাবণের ভিন্ন রূপ দেখেছিলেন। হনুমান নিজের নিরাপত্তার জন্য রাত্রে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে প্রথমেই রাবণের অন্তঃপুরে সীতাকে অনুসন্ধান করতে প্রবেশ করেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি রাবণ যে শয়নকক্ষে নিদ্রা যাচ্ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি কি দেখলেন তা সুন্দরকাণ্ডের দশম সর্গে বর্ণিত হয়েছে। তিনি দেখলেন রাবণ সেখানে শয়ান অবস্থায় নিদ্রিত। কবির বর্ণনায় :

মুক্তামণি বিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজিনা।
মুকুটেনাপাবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্॥ (১৬)

অর্থাৎ রাবণের মুণ্ড হতে কাঞ্চন নির্মিত, মুক্তা-মণি-খচিত মুকুট খুলে রাখা হয়েছে ; কেবল কর্ণের কুণ্ডলের প্রভায় তাঁর মুখখানি উদ্ভাসিত।

তিনি আরও দেখলেন,

তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।
শয়ানস্য বিনিশ্বাসঃ পূরয়ন্নিব তং গৃহম্। (১৭)

অর্থাৎ শায়িত অবস্থায় সেই রাক্ষসরাজের মুখ হতে নিশ্বাস বহির্গত হচ্ছিল এবং নাসিকার গর্জনে যেন সমগ্র ঘরখানি ভরে যাচ্ছিল। সুতরাং তাঁর নাসিকা রীতিমত গর্জন করত। তবে আরও মূল্যবান

১৫। সুন্দরকাণ্ড। ৫১.৬

১৬। সুন্দরকাণ্ড। ৬০।২৫

১৭। সুন্দরকাণ্ড। ১০।২৪

তথ্য পাই তাঁর একটি মুখ ছিল।

হনুমান আরও দেখলেন যে রাবণের নিদ্রিত অবস্থায় বিশ হাত নাই, তিনি সাধারণ মানুষের মত মাত্র দুটি হাতের মালিক। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

কাঞ্চনাঙ্গদ সন্নদ্ধৌ দদর্শ চ মহাত্মনঃ।
বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্র ধ্বজোপসৌ॥ (১৮)

অর্থাৎ হনুমান দেখলেন সেই মহাত্মা রাক্ষসরাজের কাঞ্চনময় অঙ্গদ শোভিত ইন্দ্রধ্বজের সহিত তুলনীয় দুটি হাত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর বিশ হাত থাকত না। তা হলে কি বিশটি হাতের অস্তিত্ব কোনও সাংকেতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? রাবণের কর্মক্ষমতা সূচিত করতে কি তাকে বিশটি হাত দেওয়া হয়েছে? এক্ষেত্রে এমন সন্দেহ পোষণ করবার সঙ্গত কারণ আছে।

মূল রামায়ণের মধ্যে এই ধরনের আরও বর্ণনা পাওয়া যায়। হনুমান যখন অশোকবনে সীতাকে আবিষ্কার করলেন তখন হনুমান গাছের পাতার আড়ালে বসে লক্ষ্য করলেন যে রাবণ সীতার নিকট আসছেন। তিনি সীতার নিকট এসে নিজের রূপের সুখ্যাতি করে প্রস্তাব দিলেন, মৈথিলি, তুমি আমার ভার্যা হও; আমি তোমাকে অগ্রমহিষী করব। সীতা তখন ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, তা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তিনি বলেছিলেন :

ইমে তে নয়নে ক্রূরে বিকৃতে কৃষ্ণপিঙ্গলে।
কিং তৌ ন পতিতৌ কস্মাৎ মামনার্য নিরীক্ষতঃ॥ (২০)

অর্থাৎ তুমি অনার্য, আমাকে নিরীক্ষণ করবার সময় তোমার ওই

১৮। সুন্দরকাণ্ড। ১০।১৪

১৯। সুন্দরকাণ্ড। ২২।১৮

বিকৃত কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণের নয়ন দুটি ভূমিতলে খসে পড়ল না কেন? এই মন্তব্য হতে অনুমান করা যায় রাবণের তখন কেবল দুটি চোখ মাত্র ছিল। সুতরাং আরও অনুমান করা যায় তখন তাঁর দেহে একটি মাত্র মুণ্ড যুক্ত ছিল। রাবণ সীতার কথা শুনে তাঁকে শাসিয়ে গেলেন যে দু মাসের মধ্যে যদি সীতা রাবণকে বিবাহ করতে না সম্মত হন, তা হলে তাঁকে রাবণ প্রাতরাশের জন্য ব্যবহার করবেন।

সীতাকে পাহারা দেবার জন্য রাবণ অনেকগুলি রাক্ষস জাতীয় নারী নিয়োগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ত্রিজটা নামে এক বর্ষীয়সী নারী ছিল। সে হঠাৎ দুঃস্বপ্ন পীড়িত হয়ে জেগে উঠে তার দুঃস্বপ্নের বিবরণ তার সঙ্গিনীদের দিল। সেই প্রসঙ্গে সে বলেছিল:

"রাবণস্য ময়া দৃষ্টো মুণ্ডস্তৈলসমুক্ষিতঃ।" ২০

অর্থাৎ আমি দেখলাম রাবণের মুণ্ডটি তৈল দ্বারা সিক্ত। এখানেও রাবণের একটি মুণ্ডের কথাই বলা হয়েছে।

লঙ্কার যুদ্ধের শেষ পর্বে রাবণ যখন রামের বাণের আঘাতে নিহত হলেন তখন রাবণের পত্নীগণ রণক্ষেত্রে এসে তাঁর দেহ নিয়ে কিভাবে বিলাপ করেছিলেন তার বর্ণনা যুদ্ধকাণ্ডের ১১০তম সর্গে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে কোনও পত্নী নিহত রাবণের মুখখানি দেখে মোহগ্রস্ত হলেন। (২১) অন্য একজন তার মুণ্ডটি অঙ্কে স্থাপন করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন। (২২)

সুতরাং দেখা যায় মৃত্যুর সময়ও তিনি একটি মাত্র মুণ্ড ধারণ করেছিলেন।

আরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার প্রয়োজন নাই। দেখা যায় নিদ্রিত অবস্থায়, অন্তঃপুরে অবস্থান কালে বা যুদ্ধকালে রাবণ একটি মাত্র

২০। সুন্দরকাণ্ড ২৭। ২২

২১। হতস্য বদনং দৃষ্টবা কাচিদ মোহম্বনুপাগতা। যুদ্ধকাণ্ড ১১০।৯

২২। কাচিদঙ্কে শিরঃ কৃত্বা রুরোদ মুখমীক্ষতী। যুদ্ধকান্ড। ১১০।১০

মুণ্ড এবং দুটি হাতযুক্ত দেহ ধারণ করতেন। অথচ তিনি যখন সিংহাসনে আসীন অবস্থায় ছিলেন, তখন হনুমান তাঁকে দশমুণ্ড শোভিত বেশে দেখলেন (শিরোভির্দশভির্ভ্রাজমানং মহৌজসম্)।

এক্ষেত্রে এই অসঙ্গতির দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। এক ব্যাখ্যা হতে পারে যে রাবণের অমিতবিক্রম ও বুদ্ধি সূচিত করতে রূপক অর্থে তাঁকে দশ আনন ও বিংশতি হস্তবিশিষ্ট রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এমন হতে পারে যে যখন তিনি দরবার করতে সিংহাসনে বসতেন, তখন দশমুণ্ড বিশিষ্ট মুখোস পরতেন। এটি সম্ভবত তাঁর দরবারী পোষাকের অঙ্গ ছিল। আমি পুরুলিয়ায় দেখেছি যে ছৌ নাচে নৃত্যশিল্পীরা রাবণের ভূমিকায় এই ধরনের মুখোস ব্যবহার করে। একটি মুকুট প্রকৃত মুণ্ডটির সহিত যুক্ত হয় আর নকল মুণ্ডগুলি তার দুইপাশে সমান্তরাল রেখায় সাজান থাকে। রাবণ যে মুকুট পরতেন সম্ভবত তাঁর একটি স্থাপিত হত তাঁর দেহের অঙ্গীভূত মাথায় এবং অন্যগুলি স্থাপিত হত দুইপাশে স্থাপিত কৃত্রিম মুণ্ডগুলির উপর।

এই পরিস্থিতিতে রামের সীতাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কাবিজয় অভিযানকে একেবারে অবাস্তব কল্পনা মাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধরে নিতে হয় যে রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হলে এক প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির ধারক মানবগোষ্ঠীর নেতার সহিত মৈত্রী স্থাপন করে সীতাকে উদ্ধার করার জন্য রাম লঙ্কায় অভিযান করেন। সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক নগরভিত্তিক সংস্কৃতির ধারকগোষ্ঠীর রাজা রাবণের সহিত তাঁর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি সীতাকে উদ্ধার করেন।

(৪)

লঙ্কায় অভিযান কি গ্রীক সাহিত্যের অনুসরণে রচিত ?

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে রামায়ণের কাহিনীর দ্বিতীয় অংশকে একটি সম্ভাব্য ঘটনা বলে স্বীকার করে নেওয়া সহজ হয়। কিন্তু ভারত-তত্ত্ববিদ্ ওয়েবার এই সম্ভাবনাকে একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন। (২৩) তাঁর প্রতিপাদ্যের সপক্ষে তিনি যে যুক্তিগুলি প্রয়োগ করেছেন সবই উপরে উল্লিখিত দশরথ জাতকে বর্ণিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করে স্থাপিত। দশরথ জাতকে রামের বনবাস কাহিনীর উল্লেখ আছে, কিন্তু রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং তাঁর উদ্ধারের কাহিনীর উল্লেখ নাই। এই অনুল্লেখকে ভিত্তি করেই তাঁর প্রযুক্ত সমর্থক যুক্তিগুলি স্থাপিত। তাঁর প্রতিপাদ্য হল এই অনুল্লেখ প্রমাণ করে যে আলেকজাণ্ডার পরিচালিত ভারত অভিযানের ফলে গ্রীক সংস্কৃতির সহিত পরিচয়ের পর হোমারের ট্রয় অভিযান কাহিনীর অনুসরণে বাল্মীকি এই অংশ রচনা করেন। কারণ, তাঁর ধারনায় আদিকবি এমন কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন না যে আর্য-সংস্কৃতির দাক্ষিণাত্যে বিস্তারের জন্য রাম অভিযান চালিয়ে সীতাকে উদ্ধার করবেন এমন জটিল কাহিনী রচনা করবার ক্ষমতা রাখবেন।

সুতরাং ওয়েবারের প্রতিপাদ্যের ভিত্তি হল তিনটি যুক্তি : (১) রামায়ণ বুদ্ধের পরে রচিত ; (২) দশরথ জাতকে রামের লঙ্কা অভিযান কাহিনী নাই, সুতরাং লঙ্কা অভিযান আদৌ ঘটেনি, তা কাল্পনিক ; (৩) ভারতীয় কবির এমন কাহিনী রচনা করবার কবিত্ব-শক্তি ছিল না। সুতরাং গ্রীকদের সংস্পর্শে এসে হোমার রচিত ইলিয়ডের কাহিনীর অনুসরণে রামের লঙ্কা অভিযান কাহিনী রচিত হয়েছিল। এখন এই যুক্তিগুলি কতখানি তথ্যের দ্বারা সমর্থিত, তা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

রামায়ণ বুদ্ধের পরে রচিত কিনা এ বিষয় পূর্বে আলোচিত

২৩। A Weber, A History of Indian Literature. 1878

হয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে রামায়ণকাহিনীর মূল অংশ বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বে রচিত হয়েছে। তার সমর্থনে প্রযুক্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সেখানে স্থাপিত হয়েছে। আমরা দেখেছি রামায়ণের কাহিনীর পরিবেশ বৈদিক যুগের পরিবেশ। বুদ্ধ তার বহু পরে জন্মেছিলেন। আমরা আরও দেখেছি যে মহাভারত একই সময়ের কাব্য হলেও তা রামায়ণের পরে রচিত। কাব্য হিসাবে রামায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যের আদি কাব্যগ্রন্থ। সুতরাং তা যে বুদ্ধের পরে রচিত হয়েছিল, ওয়েবার স্থাপিত এই প্রতিপাদ্য গ্রহণ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে। সূত্রপিটকের অন্তর্ভুক্ত যে জাতকের কাহিনীটি পাওয়া যায় তাতে আছে রাম তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মন অবিচলিত অবস্থায় ছিল। রামের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষকেই এখানে শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। এই সূত্রপিটক বুদ্ধের প্রয়াণের অল্পকাল পরেই তাঁর শিষ্যবর্গ কর্তৃক সংকলিত হয়। সুতরাং এই তথ্য হতেও অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বুদ্ধের সময় রামায়ণের কাহিনী সুবিদিত ছিল।

ওয়েবারের দ্বিতীয় যুক্তি হল দশরথ জাতকে রামের দাক্ষিণাত্য অভিযান কাহিনীর উল্লেখ নাই ; সুতরাং ধরতে হবে এই কাহিনী ঘটেনি। সুতরাং রামায়ণের মধ্যে স্থাপিত এই কাহিনীটি কাল্পনিক। এই যুক্তিটি বিশেষ সবল বলে মনে হয় না।

একটি বিবরণে কোনও ঘটনার অনুল্লেখ দুই কারণে ঘটতে পারে। প্রথমত হতে পারে, পূর্ববর্তী কাহিনীতে তা ছিল না বা তা আদৌ ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, তা লেখক ইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দিয়ে থাকবেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালের লেখক তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না বলে তা ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুল্লিখিত রেখেছেন। সুতরাং অনুল্লেখ চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ করে না যে মূল রামায়ণে এই

কাহিনী ছিল না। অপর পক্ষে সূত্রপিটকে তা যে ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুল্লিখিত রাখা হয়েছিল তা মনে করবার কিছু সঙ্গত কারণ আছে।

রামায়ণের কাহিনীর দুটি অংশ। প্রথমটিতে রামের চারিত্রিক গুণ পরিস্ফুট। তিনি আত্মত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, সুখ ও দুঃখে অবিচলিত মন। তিনি পিতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য স্বেচ্ছায় বনবাসী হন। অবশ্য দশরথ জাতকে কাহিনীর কিছু অংশ পরিবর্তিত হয়েছে। নিজের বিমাতার আক্রোশ হতে নিরাপদ রাখবার জন্য পিতার উপদেশ অনুসারে তিনি বনবাসী হয়েছিলেন বলা হয়েছে। তবু তাঁর চারিত্রিক গুণ এবং খ্যাতি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল মনে হয়। দ্বিতীয় অংশে রামের বীরত্বের কাহিনী আছে। সীতাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি লঙ্কায় অভিযান করেন এবং পরিণতিতে রাবণকে যুদ্ধে নিহত করেন। ক্ষত্রিয় হিসাবে দুষ্টের দমন করে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন। কিন্তু এই ভূমিকা হিংসার ভূমিকা। বুদ্ধ প্রচারিত অহিংসা ধর্মের আদর্শের সহিত তা সঙ্গতি রক্ষা করে না। সেই কারণেই দশরথ জাতকে তা বর্জিত হবার সম্ভাবনা বেশী।

এই পরিস্থিতিতে দশরথ জাতকে রামের লঙ্কাবিজয় কাহিনী বর্জিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তা ঘটেনি বা মূল কাহিনীতে তার উল্লেখ ছিল না। অনুল্লেখ সুনিশ্চিত ভাবে কিছুই প্রমাণ করে না।

তৃতীয় যুক্তি হল ভারতীয় কবির কল্পনাশক্তি এমন দুর্বল যে লঙ্কা অভিযান কাহিনী আপনা হতে রচনা করবার শক্তি রাখতেন না; সুতরাং গ্রীক সংস্কৃতির সহিত পরিচয়ের পরে হোমার রচিত ট্রয় অভিযান কাহিনীর অনুসরণে তা রচিত হয়েছে। এই তৃতীয় যুক্তিটি ওয়েবার ব্যবহৃত অন্য দুটি যুক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই যুক্তি দুটি যদি ভেঙে পড়ে তা হলে এটিও ভেঙে পড়বে। রামায়ণের কাহিনী যদি বুদ্ধের জন্মের পূর্বে রচিত হয়ে থাকে, তা হলে হোমারকে

অনুসরণ করবার প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়ত দশরথ জাতকে লঙ্কা অভিযানের অনুল্লেখ যদি নিশ্চিত ভাবে তাকে অপ্রমাণ না করে, তা হলে হোমারকে অনুসরণ করবার প্রয়োজন প্রমাণিত হয় না। গ্রীকসংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটে আলেকজাণ্ডারের পাঞ্জাব অভিযানের পর। তা ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ অংশে। বুদ্ধ জন্মেছিলেন খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়। আমরা যা তথ্য পেয়েছি, তা ইঙ্গিত করে রামায়ণ তারও পূর্বে রচিত। কাজেই হোমারের কাহিনীর সহিত রামায়ণের লেখকের পরিচিত হবার সুযোগ ছিল না ধরতে হয়।

আর একদিক হতেও বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। হোমার রচিত ইলিয়ডের কাহিনীর সহিত বাল্মীকি রচিত রামায়ণের কাহিনীর প্রকৃতিগত বিভেদ আছে। দুই কাহিনী দুই দেশের সংস্কৃতির পরিবেশে রচিত। রামায়ণের কাহিনীর সহিত আমরা সুপরিচিত। সংক্ষেপে ইলিয়ডের কাহিনী হল এই ঃ

আগামেমননের নেতৃত্বে মেনেলাউসের সুন্দরী পত্নী হেলেনকে ট্রয় জয় করে উদ্ধার করার কাহিনীর মূলে আছে তিন মহিলা দেবতার পরস্পর বিদ্বেষ। হেরা, এথিনা এবং এফ্রোদিতির মধ্যে কে সব থেকে সুন্দরী তা বিচারের ভার পড়ল ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের উপর। তিনজন প্রতিযোগিনীই তাঁকে বিভিন্ন ধরণের পুরস্কার দেবার লোভ দেখালেন। প্যারিস এফ্রোদিতির পক্ষে রায় দিলেন শুধু এই কারণে যে তিনি যে পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন প্যারিসের কাছে তা সব থেকে চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। তাঁকে লোভ দেখানো হয়েছিল যে এফ্রোদিতিকে জিতিয়ে দিলে বিশ্বের সব থেকে সুন্দরী নারীকে তিনি প্রেমিকা রূপে পাবেন। তাই তিনি এই দেবতাটির আনুকূল্যে মেনেলাউসের আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরূপে বিখ্যাত পত্নীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেন এবং

তাঁর সহযোগিতায় তাঁকে নিয়ে ট্রয়ে পালিয়ে গেলেন। তাই নিয়ে ট্রয়ের যুদ্ধ।

সেকালের গ্রীক জাতি ছিল বীর্যবান ও ভোগী। তারা মেধাবীও ছিল। কিন্তু নীতিবোধে তারা বিশেষ সচেতন ছিল না। সেকালের আর্যজাতির বীর্য ছিল, মেধা ছিল; অধিকন্তু নীতিবোধ তাদের বিশেষ প্রখর ছিল। গ্রীকজাতি নারীর সতীত্বকে কোনও মূল্য দিত বলে মনে হয় না। অপরপক্ষে প্রাচীন আর্যসমাজে নারীর সতীত্বের আদর্শ বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। তাই সেকালে সীতার মত, সাবিত্রীর মত, দময়ন্তীর মত কত নারী চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যাবে না। অবশ্য ইউলিসিস-পত্নী পেনিলপি আছেন; কিন্তু মনে হয় তিনি যেন ব্যতিক্রম। দুই জাতির প্রকৃতিগত বিভিন্নতা হোমার ও বাল্মীকির কাহিনীতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। তাই দেখি হেলেন স্বেচ্ছায় স্বামীকে ত্যাগ করে প্রেমিকের সঙ্গে পলায়ন করলেন। যা ঘটল তা অপহরণ নয়, স্বেচ্ছায় প্রেমিকের নিকট আত্মসমর্পণ। আর রামায়ণে দেখি রাম নিজের প্রদত্ত নয়, পিতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য স্বেচ্ছায় দীর্ঘকালস্থায়ী বনবাসের নির্দেশ গ্রহণ করলেন। সীতা স্বেচ্ছায় স্বামীর দুঃখের জীবনের দুঃখ ভাগ করে নিতে তাঁর অনুগমণ করলেন। রাবণ চক্রান্ত করে সীতাকে বলপূর্বক অপহরণ করলেন, তবু তাঁকে তাঁর অন্তঃপুরে আনতে পারলেন না। সীতার সতীত্বের আদর্শে এত নিষ্ঠা যে ভয় দেখিয়েও তাঁকে রাবণ অঙ্কশায়িনী করতে পারলেন না। তাই মনে হয় হোমারের কাহিনী গ্রীকসংস্কৃতির পরিবেশেই সম্ভব এবং বাল্মীকির কাহিনী আর্যসংস্কৃতির পরিবেশেই সম্ভব। তাদের প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য আছে। তা প্রমাণ করে যে দুই গ্রন্থই মূল কাহিনীরূপে রচিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত রামায়ণ কাহিনী নিয়ে একটি বিতর্কের উল্লেখ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই বিতর্কের কেন্দ্র সম্প্রতি প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাল্মীকি রচিত রামায়ণ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য নিয়ে। বিষয়টির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে প্রদত্ত হল।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে বাল্মীকি রচিত রামায়ণের বিষয় একটি আলোচনা সভা ডাকা হয়েছিল। ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ তারিখে তার আরম্ভ হয় এবং পাঁচ দিন ধরে চলে। সেই সভা উদ্বোধন করতে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানান হয়। সেই প্রসঙ্গে হাতে লেখা নোটের সাহায্যে তিনি একটি মৌখিক ভাষণ দেন এবং সেই প্রসঙ্গে রামায়ণকে ঘিরে যে বিতর্ক আছে তার উল্লেখ করে কিছু মন্তব্য করেন।

পরের মাসে ১৫ই জানুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই আলোচনা সভাকে বিষয় করে একটি ভাষণ দেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি দশরথ জাতকে যে রামকে সীতার ভ্রাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তার উল্লেখ করেন। তার ফল হয় অভাবনীয়। অনেকের ধারনা হয় তিনি বৌদ্ধজাতকের দাবীর সমর্থন করে রামায়ণকে বিকৃত করেছেন। সংবাদপত্র ও সভায় তীব্র প্রতিবাদ হয়। এমনকি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে নানা কটু বাক্য দ্বারা কন্টকিত বহু পত্র তাঁর নিকট আসতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর মানুষ ভুলে গেছে যে তার একশত বৎসর পূর্বে জার্মান পণ্ডিত ওয়েবার রামায়ণ সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন এবং ডঃ চট্টোপাধ্যায় নূতন কথা কিছু বলেন নি। তাঁর ছিল অসীম ধৈর্য। তিনি অবিচলিত থেকে এই আক্রমণ সহ্য করে যান।

তিনি এই প্রতিক্রিয়ার উত্তরে কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। সেইজন্য ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে জাতীয়

গ্রন্থাগারে একটি সভা ডাকা হয়। সেখানে তিনি বলেন যে রামায়ণ গড়ে উঠেছিল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উপাদান হতে; গাথাসাহিত্য তাদের অন্যতম। সুতরাং জাতকের কাহিনীতে যা বলা হয়েছে তাকে লঘুভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি আরও বলেছিলেন রামায়ণের কাহিনী যে হোমার রচিত ইলিয়ডের অনুসরণে রচিত সেকথা তিনি স্বীকার করেন না। তবে তাঁর ধারণা আর এক প্রাচীন গ্রীক কবি হেসিয়ড রচিত 'থিয়োগোনাসের' প্রভাব রামায়ণে বর্তিয়ে থাকতে পারে। তবে এ বিষয় আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব সুচিন্তিত মন্তব্য গ্রন্থের আকারে পরে প্রকাশ করবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ রচিত হবার পূর্বেই তিনি ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রয়াত হন। (২৪) সুতরাং সে গ্রন্থ আর প্রকাশ হয়নি।

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনাগুলির মধ্যে দুটি মন্তব্য আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। প্রথম মন্তব্য হল বৌদ্ধগাথায় রাম ও সীতার ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক উপেক্ষণীয় নয়। দ্বিতীয় মন্তব্য হল 'থিওগোনাসের' কাহিনী দ্বারা রামায়ণের লঙ্কা অভিযান কাহিনী প্রভাবান্বিত হয়ে থাকতে পারে। এ দুটি মন্তব্য এখানে পরীক্ষা করে নেওয়া যেতে পারে।

বৌদ্ধগাথা অর্থে এখানে দশরথ জাতকই অভিপ্রেত, কারণ তা গাথা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তাতে রাম ও সীতাকে একই পিতার সন্তান বলে প্রচার করা হয়েছে। এ বিষয় উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা যে তথ্যগুলি পেয়েছি সেগুলি আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে রাম ও

২৪। এই তথ্যগুলি ডঃ চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'জীবন কথা' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত। পৃঃ ৯৯ দ্রষ্টব্য।

সীতার ওপর যে ভ্রাতা-ভগিনীর সম্বন্ধ আরোপিত হয়েছে তা সম্ভবত উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ সেকালে একান্ত গর্হিত বিবেচনা করা হত। সেই কারণেই এ সম্বন্ধে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণের প্রতিক্রিয়া ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করেছিল।

দ্বিতীয় মন্তব্য হল হেসিয়ড রচিত থিয়োগোনাসের কাহিনী দ্বারা রামের লঙ্কা-অভিযান কাহিনী প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। থিয়োগোনাস ইলিয়ড হতে প্রাচীনতর কাহিনী। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রীক সাহিত্যের সহিত ভারতীয় কবির পরিচয় ঘটাবার সুযোগের ওপর এই সম্ভাবনা নির্ভর করে। কিন্তু রামায়ণ রচিত হবার পূর্বে সে সুযোগের অস্তিত্বের প্রমাণ যে পাওয়া যায় না। একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হল আলেকজাণ্ডারের খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাঞ্জাব অভিযান গ্রীসের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপন করেছিল। কিন্তু রামায়ণের আখ্যায়িকা অংশ এবং রামকে অবতার প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে যে অংশগুলি স্থাপিত হয়েছে সেগুলি বর্জন করে যে অংশ পাই তা বুদ্ধের জন্মের বহুকাল পূর্বে রচিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। সেক্ষেত্রে মূল অংশের উপর হেসিয়ড রচিত কাহিনীর প্রভাব আছে মানতে হলে, কল্পনার উপর অত্যধিক নির্ভর করতে হয়।

দ্বিতীয়ত ডঃ চট্টোপাধ্যায় লঙ্কা-অভিযানের উপর হেসিয়ডের প্রভাবের সম্ভাবনার যে উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তি হল এই তথ্য যে হেসিয়ডের রচিত কাহিনীতে তিনটি ভায়ের উল্লেখ আছে যাদের অনেকগুলি মাথা ছিল। এই প্রসঙ্গে রাবণের দশাননত্বের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা যে দীর্ঘ আলোচনা করেছি তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। আমরা যে তথ্যগুলি পেয়েছি তা ইঙ্গিত করে রাবণের একটি মাত্র মাথাই সম্ভবত ছিল। তা যদি হয় তা হলে এই ধরনের কাহিনীর অনুসরণের সম্ভাবনা আর বিশেষ থাকে না।

(৫)

মূল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা

এখন আমরা রামায়ণের মূল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। অর্থাৎ রাম যিনি রামায়ণের নায়ক তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন কিনা তার আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই রামায়ণ ও মহাভারতের পরস্পর প্রকৃতিগত সাদৃশ্য হেতু তাদের তুলনার কথা প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে। উভয়েই বৈদিক সংস্কৃতির শেষের যুগের পরিবেশে সংঘটিত কাহিনী। তবে রামায়ণের পরিবেশ মহাভারতের পরিবেশ হতে প্রাচীনতর বলে মনে হয়। তখনও বর্ণ ও আশ্রমধর্মের ভিত্তিতে সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত। যে বর্ণে যে জন্মেছে তার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম তার স্বধর্ম। তখনও প্রতি ব্যক্তির জীবনে চারটি আশ্রম পালন করতে হত। তখনও বৈদিক রীতি অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিক ধর্মরূপে পালিত হত। তখনও কুলপতির তত্ত্বাবধানে আশ্রমে আধ্যাত্মিক চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রকৃতিও অনুরূপ। দুটি গ্রন্থই সংস্কৃত সাহিত্যের আদি গ্রন্থ। রামায়ণ আদি কাব্য বলে পরিচিত। আমরা বলতে পারি মহাভারত দ্বিতীয় আদিকাব্য। উভয়েই দুই রাজবংশের কাহিনী বলে প্রচারিত। তবে রামায়ণের পরিবেশ মহাভারতের পরিবেশ হতে প্রাচীনতর বলে মনে হয়।

এই পরিবেশের কথা মনে রেখে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে মহাভারতের কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে স্বীকৃত। ঐতিহাসিকগণ মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের কাহিনীকে সত্য ঘটনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই কারণে দেখা যায় ঐতিহাসিকগণ মহাভারতের যুদ্ধের কাল নির্ণয়ের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস শব্দটির সুস্পষ্ট অর্থ নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে।

ইতিহাস ও পুরাণ শব্দ দুটির ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর রচিত শঙ্করের ভাষ্যে ইতিহাস ও পুরাণ উভয়েরই একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। (২৫) তার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি। সেখানে তিনি ইতিহাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনীর উল্লেখ করেছেন এবং পুরাণ অর্থে বলেছেন তা হল সৃষ্টি বিষয়ক কাহিনী। সুতরাং পুরাণের অর্থ দাঁড়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক কল্পনা ভিত্তিক কাহিনী। আর ইতিহাস অর্থে বুঝতে হবে মানুষকে নিয়ে সংঘটিত কাহিনী। ইতিহাসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও সেই অর্থ সূচিত করে। 'ইতি হ আস' এই তিন পদের যোগে তা গঠিত। তার অর্থ দাঁড়ায় এই রকম ঘটেছিল। ইতিবৃত্তকে তার সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার অর্থও একই। সুতরাং যাকে ইতিহাস বলে চিহ্নিত করা হয় সেই কাহিনীর একটি বাস্তব ভিত্তি আছে বলে ধরে নিতে হয়। সেই অর্থেই মহাভারতকে ইতিহাস বলা হয়েছে। অবশ্য আধুনিক কালের নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা বা অনুরূপ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত ইতিহাস তা নয়।

এখন দেখা যায় উভয়েই একই প্রকৃতির গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও মহাভারতকে ইতিহাস বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু রামায়ণকে সে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এদিকে দেখি রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থের মধ্যে এমন আভ্যন্তরীণ মন্তব্য পাওয়া যায় যা উভয়কেই ইতিহাস বলে প্রচার করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমে রামায়ণের কথা ধরা যাক। রামায়ণের মধ্যে রামের কাহিনীকে দু জায়গায় 'পুরাবৃত্ত আখ্যান' বলা হয়েছে। (২৬) পুরাবৃত্ত আখ্যান বললে

২৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর শঙ্কর ভাষ্য। ২।৪।১০

২৬। যুদ্ধকাণ্ড। ১২৮ সর্গ ১২১ শ্লোক এবং উত্তরকাণ্ড ১১১ সর্গ ২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স্পষ্টই বলা হয় যে এই আখ্যান পুরাকালে ঘটেছিল। তা হলে তা ইতিহাসই হয়ে দাঁড়ায়।

মহাভারতের আদিপর্বেই তাকে 'ইতিহাস' বলে দাবী করা হয়েছে। (২৭) বলা হয়েছে, এই পুণ্য ইতিহাস সত্যবতী সুত রচনা করেন (ইতিহাসমিদং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ)। মহাভারতের এই দাবী ঐতিহাসিক কর্তৃক স্বীকৃত। অতিরিক্তভাবে আমরা দেখি রামায়ণও দাবী করছে তা 'পুরাবৃত্ত'। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষি কথিত রামোপাখ্যানের উল্লেখ করা যেতে পারে। জয়দ্রথ যখন বনবাস কালে পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে যান তখন যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মার্কণ্ডেয় এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন। এই কাহিনী আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।
স ভার্যেন যথাপ্রাপ্তং দুঃখং রামেণ ভারত ॥ (২৮)

এখানে রামায়ণ কাহিনীকে 'যথাবৃত্ত ইতিহাস' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ; তা রামায়ণকে শুধু ইতিহাস বলে বর্ণনা করেনি, তা যে ঘটেছিল তাও বলেছে।

সুতরাং শুধু রামায়ণ নয়, মহাভারতও রামের কাহিনীকে ইতিহাস বলে প্রচার করেছে। মহাভারত ইতিহাস বলে স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে রামায়ণকে ইতিহাস নয় বলে প্রত্যাখ্যান করবার যুক্তি সবল নয়। অন্তত মহাভারতের মত প্রাচীন গ্রন্থ যে রামায়ণকে ইতিহাস বলে স্বীকার করে, তা রামায়ণের কাহিনীর ঐতিহাসিকতার সপক্ষে একটি মূল্যবান প্রমাণ।

দ্বিতীয়ত আমরা দেখি মহাভারতের মূল চরিত্র কৃষ্ণ এবং

২৭। মহাভারত। আদিপর্ব। ১। ৫৪

২৮। মহাভারত, বনপর্ব। ২২৭। ৬

রামায়ণের নায়ক রাম উভয়েই বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃত হয়েছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্দের তৃতীয় অধ্যায়ে চব্বিশ জন অবতার স্বীকৃত। এই অবতারদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(১) মানুষ হতে পৃথক রূপে কল্পিত জীব ; যেমন মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি।

(২) মানুষের রূপ আছে কিন্তু ঐতিহাসিক মানুষ নয় ; যেমন মোহিনী, বামন, কল্কি। পরশুরাম ঠিক এই শ্রেণীতে না পড়লেও তাঁর নাম এখানেই উল্লেখ করা যেতে পারে ; কারণ, তিনি ঐতিহাসিক মানুষ কিনা এবিষয় সন্দেহ আছে।

(৩) ঐতিহাসিক মানুষ বলে রামায়ণ ও মহাভারতে স্বীকৃত : রাম ও কৃষ্ণ।

(৪) স্পষ্টতই ঐতিহাসিক মানুষ। এই শ্রেণীতে পড়েন ব্যাস, কপিল ও বুদ্ধ।

এখন দেখা যাবে প্রথম শ্রেণীর অবতারদের ঐতিহাসিক মানুষের ভূমিকা গ্রহণের আদৌ প্রশ্ন ওঠে না। তাঁরা পুরাণের কল্পিত চরিত্র। কাজেই তাঁদের কোনো বাস্তব ভিত্তি নাই। দ্বিতীয় শ্রেণী সম্বন্ধেও সে কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। তাঁরা মানবদেহধারী হলেও তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। চতুর্থ শ্রেণী সম্বন্ধে তাঁদের ঐতিহাসিক চরিত্র হওয়া সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁদের কীর্তি তাঁদের ঐতিহাসিকতার অভ্রান্তভাবে সাক্ষ্য দেয়। ঐতিহাসিক যুগে তাঁদের সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ তথ্য আছে। তৃতীয় শ্রেণীতে যে দুই অবতারকে স্থাপন করা হয়েছে তাঁদের ঐতিহাসিকতাই আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে যাঁরা ঐতিহাসিক মানুষ রূপে প্রমাণিত তাঁদেরও অবতার পদে উন্নীত করবার একটি প্রবণতা ভারতীয়

চিন্তায় দেখা যায়। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ চতুর্থ শ্রেণীতে যে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি স্থাপিত হয়েছেন তাঁরা। তাঁরা ভাগবত পুরাণে অবতার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে বুদ্ধের কথা ধরা যাক। তিনি শুধু ভাগবত পুরাণে অবতার পদে উন্নীত হননি, কয়েক শতাব্দী পরে কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থেও তাঁকে কেশবের অন্যতম অবতার বলে বন্দনা করা হয়েছে। অথচ তিনি যে ধর্ম প্রবর্তন করেন তার অন্তর্ভুক্ত মানুষ তাঁকে অবতার বলে স্বীকার করেনি।

তার একটা কারণ, বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছেন তাতে ঈশ্বর নাই; একটি কার্যকারণ সম্পর্কে সংযুক্ত ঘটনাচক্রের সাহায্যে তিনি বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর স্থাপিত তত্ত্বের নাম প্রতীত্য সম্যপাদ তত্ত্ব। তাতে ঈশ্বরের কোনও ভূমিকা নাই। তাই তাঁর ভক্তদের তাঁকে অবতার পদে উন্নীত করবার সুযোগ ছিল না। তবুও বলা যাবে না যে শ্রদ্ধাস্পদ মানুষকে অবতার পদে উন্নীত করবার যে প্রবণতা হিন্দুদের মনে ক্রিয়া করে, তা হতে বুদ্ধের ভক্তগণ মুক্ত ছিলেন। তা যে ছিলেন না তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। বৌদ্ধধর্মের আদিরূপে বুদ্ধের বাণীই প্রাধান্য পেয়েছিল; তিনি অন্তরালে রয়ে গেছেন। কয়েক শত বৎসর পরে দেখা গেল তাঁর বাণী হতে তাঁর প্রতি ভক্তদের আকর্ষণ বড় হয়ে উঠল। তা শেষে এমন প্রবল হয়ে উঠল যে বৌদ্ধধর্মের রূপ পরিবর্তিত হল। তাতে বুদ্ধকে সামনে এনে প্রকাশ্যে তাঁর মূর্তি মন্দিরে স্থাপিত হল। ভক্তেরা তাকে একরকম ঈশ্বরের আসনে স্থাপন করে তাঁর প্রতি হিন্দুদের মত বাতি জ্বেলে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আরম্ভ করল। এই নূতন ধর্মরীতিকে পূর্বের ধর্মরীতির পথকে পৃথক করে চিহ্নিত করবার জন্য তার নাম দেওয়া হল মহাযান এবং পূর্বের রীতিকে বলা হল হীনযান। এইভাবে বুদ্ধ এক রকম অবতার পদে উন্নীত না হয়ে একেবারে ঈশ্বরের পদে উন্নীত হলেন।

এই প্রসঙ্গে ইলোরায় অবস্থিত পর্বতের অভ্যন্তরে পাথর কেটে যে চৈত্যগুলি নির্মিত হয়েছিল তাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। চৈত্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা উপাসনা করতেন। তাদের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রশস্ত চৈত্যের প্রান্তে একটি ছোট স্তূপ স্থাপিত আছে এবং তার সামনে স্থাপিত হয়েছে একটি ছোট আকারের বুদ্ধমূর্তি। তার সাহায্যে একটি বাণী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ পূজিত হতেন না। তাঁর স্মারক চিহ্নগুলি স্তূপের অভ্যন্তরে লোক চক্ষুর অন্তরালে স্থাপিত ছিল। নূতন রীতি অনুসারে বুদ্ধ আর অন্তরালে রইলেন না, ভক্তের নাগালের মধ্যে স্থাপিত হলেন। সেই সংবাদটি বহন করছে এই ছোট স্তূপের সম্মুখে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তি। বলা হচ্ছে বুদ্ধ স্তূপ হতে বাহির হয়ে ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য ভক্তের কাছে এলেন।

মধ্যযুগের বাংলা দেশে এক ঐকান্তিক ভাবে জনপ্রিয় বহুগুণের দ্বারা ভূষিত মানুষ কিভাবে অবতারপদে উন্নীত হয়েছিলেন তার আর এক ঐতিহাসিক কালে সংঘটিত দৃষ্টান্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করে এক নূতন আধ্যাত্মিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর গৌরকান্তি, অসাধারণ মনীষা এবং ঐকান্তিক ঈশ্বর ভক্তি তাঁর প্রতি সেকালের মানুষের এমন গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল যে তাঁকে তাঁর ভক্তগণ কৃষ্ণের অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি অবতার পদে উন্নীত হন।

এক্ষেত্রে আমরা এইরূপ অনুমান করতে পারি যে লিখিত ইতিহাসের যুগের পূর্বে যে সব ঐতিহাসিক মানুষ অবতার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কেও একই প্রক্রিয়া কাজ করেছিল। তাঁরা প্রথমে মানুষ হিসাবেই বিবেচিত হতেন। পরে

তাঁদের মধ্যে নানা মহৎ গুণের সমাবেশ দেখে তাঁদের সমকালীন বা অব্যবহিত পরবর্তীকালের মানুষ তাঁদের প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধাবিষ্ট হতেন এবং ফলে উত্তরকালে তাঁরা ঈশ্বরের অবতার রূপে স্বীকৃতি পেতেন।

কৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক মানুষ বলে স্বীকৃত। তাঁর ক্ষেত্রে যে এমন ঘটেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মহাভারতের সভাপর্বে দেখি কৃষ্ণকে ঘিরে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশটি ছিল এই ঃ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। যজ্ঞের সভায় বহু বিশিষ্ট মানুষ নিমন্ত্রিত হয়েছেন। এই যজ্ঞের একটি অবশ্য পালনীয় আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হল সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের একজনকে অর্ঘ্য দিয়ে সম্মানিত করতে হয়। স্বভাবতই যিনি গুণে সবার শ্রেষ্ঠ তাঁরই এই সম্মান প্রাপ্য। এই সম্মান কাকে দেওয়া হবে তা নির্দ্ধারণের ভার যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে দিলেন। ভীষ্ম তখন এই অভিমত দিলেন যে কৃষ্ণই সেই সম্মানলাভের যোগ্যতম পাত্র। তিনি বললেন কৃষ্ণ 'অর্হণীয়-তমা' (২৯) কিন্তু শিশুপাল সে প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন। ফলে উভয়ের মধ্যে বিতর্ক লেগে গেল। পরিণতিতে শিশুপাল কৃষ্ণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হলেন। সুতরাং সেখানে কৃষ্ণ বহু মাননীয় অতিথির অন্যতম রূপেই ব্যবহার করেছিলেন এবং সভাসদ্‌বৃন্দ তাঁকে একজন মানুষ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তিনি অবতার বলে কেউ দাবী তোলেননি।

কৃষ্ণ মহাভারতের নায়ক না হয়েও একটি অনন্যসাধারণ চরিত্র। ধর্ম ও অধর্মের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে তাঁদের নিপুণভাবে পরিচালিত করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁদের বিজয়ীর পদে অধিষ্ঠিত

২৯। মহাভারত, সভাপর্ব। ৩৬। ২৭ বার্ষ্ণেয়ং মন্যতে কৃষ্ণমর্হণীয়-তমং ভুবি।

করলেন। তাই তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিখরে স্থাপিত হলেন। তারই পরিণতি হল তাঁকে বিষ্ণুর অবতার পদে উন্নয়ন। সেটি সংঘটিত হল গীতার ভীষ্মপর্বের মধ্যে সংযোজন ঘটিয়ে। তা ঘটতে সময় লেগেছিল। কারণ, মূল অংশ সম্ভবত রচিত হয় উপনিষদের যুগের শেষ প্রান্তে। বেদব্যাস যদি সেই অংশ রচনা করে থাকেন তা হলে তা বৈদিক যুগে নিশ্চয় রচিত হয়েছিল। অথচ অবতারবাদ জন্মলাভ করে তার অনেক পরে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাঁকে দেবতার পদে স্থাপন করবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে পাওয়া যায় না। বেসনগরে অবস্থিত একটি স্তম্ভে উল্লেখ আছে যে গ্রীক রাজদূত হেলিয়োডোরাস দেবাদিদেব বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। সুতরাং তার কাছাকাছি সময়েই কৃষ্ণ দেবতার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সম্ভবত এই সময় গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বে সংযোজিত হয়।

গীতা যে পরবর্তী কালে সংযোজিত হয়েছে, তার প্রমাণ মহাভারতের মধ্যেই মিলবে। প্রথমেই দেখা যেতে পারে যে গীতার যে পরিবেশ কল্পিত হয়েছে তা একান্তই অস্বাভাবিক। দুই পক্ষের সৈন্য যখন যুদ্ধ করতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন অর্জুন হঠাৎ যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন কৃষ্ণ দুই দলের সৈন্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘ ভাষণ ও উপদেশ দিলেন। কিন্তু এটি বাস্তব কাহিনী বলে মনে হবে না। অর্জুনের হৃদয়দৌর্বল্য দেখাবার কারণও ছিল না; কারণ তিনি আগে হতেই জানতেন যে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণই তাঁর প্রতিপক্ষ।

গীতায় সর্বত্রই কৃষ্ণের উক্তিকে 'শ্রীভগবান্ উবাচ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের অন্য অংশে এই সম্মান প্রদর্শন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই সেই সকল ক্ষেত্রে মহাভারতের মধ্যে যখন কৃষ্ণের মন্তব্য স্থাপন করা হয়েছে, তখন কোথাও বলা হয়েছে 'কৃষ্ণ উবাচ',

কোথাও বলা হয়েছে 'বাসুদেব উবাচ', আবার কোথাও বলা হয়েছে 'শ্রীভগবান উবাচ'। যেমন সভাপর্বে বলা হয়েছে 'কৃষ্ণ উবাচ' বা 'বাসুদেব উবাচ' এবং উদ্যোগপর্বে বলা হয়েছে 'শ্রীভগবান্ উবাচ'।

প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি বিবেচনা করলে মনে হয় রামের ক্ষেত্রেও একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল, যার মধ্য দিয়ে তিনি অবতার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। প্রথমে অগণিত মানুষের অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণের প্রয়োজন। এমন শ্রদ্ধা আকর্ষণের মত গুণ রামের ছিল। তাঁর মধ্যে নানা মহৎ গুণের সমাবেশ পাওয়া যায়। তিনি আত্মত্যাগী, নীতিপরায়ণ, বীর্যবান এবং সর্বোপরি আদর্শ রাজা। এই প্রসঙ্গে তাঁর অনুজ ভরত কর্তৃক রামের প্রশস্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, দুঃখ রামকে ব্যথিত করে না, সুখ তাঁকে হর্ষ দেয় না, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি সমান উদাসীন। (৩০) তিনি এই বলে তাঁর প্রশস্তি শেষ করেছেন ঃ

অমরোপমসত্বস্ত্বং মহাত্মা সত্যসংগরঃ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ বুদ্ধিমাংশ্চাসি রাঘব ॥ (৩১)

অর্থাৎ তুমি দেবতার সহিত তুলনীয়, তুমি মহাত্মা, সত্যে তোমার অচল নিষ্ঠা ; তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং বুদ্ধিমান।

রামের সত্যনিষ্ঠার জন্যই তাঁর সমধিক খ্যাতি। পিতার মৃত্যুর পর অযোধ্যায় ফিরে আসতে ভরতের অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ; কারণ, তা হলে তিনি কৈকেয়ীর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বসবেন। সত্যপালনই ছিল রামের সব থেকে মৌলিক গুণ। সেই গুণই রামের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। মহাত্মা গান্ধী সেই কারণেই রামকে এত শ্রদ্ধা করতেন।

আদর্শ নরপতি হিসাবেও তিনি আমাদের দেশে স্মরণাতীত

৩০। অযোধ্যাকাণ্ড। ১০৬। ২-৫

৩১। অযোধ্যাকাণ্ড। ১০৬। ৬

কাল হতে স্বীকৃতি পেয়ে আসছেন। রামরাজ্যের যে একটি ধারণা প্রাচীন কাল হতে ভারতবাসীর মনে গড়ে উঠেছে, তার একটি ভিত্তি না থাকাই আশ্চর্যের বিষয় হবে। আদর্শ রাজা হিসাবে রাম কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তার একটি মনোরম বর্ণনা আমরা যুদ্ধকাণ্ডের শেষে পাই। এখানে আদর্শ রাজা হিসাবে রামের কীর্তির পরিচয়টি আদিকবি এই মন্তব্য দিয়ে শেষ করেছেন ঃ

রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।
রামভূতং জগদভূজ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ (৩২)

অর্থাৎ প্রজাদের মুখে রাম ভিন্ন আর কথা ছিল না। রামের রাজত্ব-কালে বিশ্ব রামময় হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর গুণের ছটায় দেশের মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এক্ষেত্রে এই রকম অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে আদর্শ মানুষ হিসাবে রাম সমকালীন মানুষের এমন সীমাহীন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন যে মানুষ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আবিষ্ট হয়ে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কোনও কাব্যের কল্পিত নায়ক কখনও জনমানসে এতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন দেখা যায় না। সকল সম্ভাব্য গুণের অধিকারী হলেও কল্পিত চরিত্র কল্পিত চরিত্রই থেকে যায়। তাকে কেউ অবতার বলে স্বীকৃতি দেয় না। সুতরাং সব দিক থেকে বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে না যে রামায়ণের নায়ক রাম ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন। বাল্মীকি রচিত আদিকাব্যে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে কৃষ্ণের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল রামায়ণে রামের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। রামকে অবতার পদে উন্নীত করা হয় দুই পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে রাম একজন আদর্শ

৩২। যুদ্ধকাণ্ড। ১২৮। ১০১-১০৬

নীতিপরায়ণ মানুষ ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার পদে উন্নীত করা হয়েছে। সহজেই অনুমান করা যায় রামায়ণের আদিরূপে রাম মানুষ হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই প্রসঙ্গে ভরতের রামের জন্য যে প্রশস্তি কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তা আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে ভরত 'অমরোপমসত্ত্ব' বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি এত মহৎ গুণের অধিকারী যে তিনি ভরতের বিবেচনায় একজন দেবতুল্য মানুষ। সুতরাং তাঁর ওপর অবতার পদ আরোপের কোনও চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।

পরবর্তী কালে সংযোজনের সাহায্যে তাঁকে বিষ্ণুর অবতারপদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ বিষয় পূর্বের এক অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা হয়েছে। কাজেই সংক্ষেপে দু একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। আদিকাণ্ডের প্রথমে এই কাহিনীটি স্থাপিত হয়েছে। রাবণ কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে এসে আবেদন জানালেন যে তাঁর দশরথের বংশে মানবদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে রাবণকে বধ করতে হবে। মানবদেহ ধরতে হবে কেন তার ব্যাখ্যা হিসাবে এই কাহিনী স্থাপন করা হয়েছে যে পিতামহ ব্রহ্মা নাকি রাবণকে এই বর দিয়েছিলেন যে নর ও বানর ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর সত্তা তাঁকে বধ করবার ক্ষমতা রাখবে না। এমন কি মূল অংশেও প্রক্ষিপ্ত ভাবে এমন ঘটনা সংযুক্ত হয়েছে যা রামকে অবতার বলে প্রচার করে। এই প্রসঙ্গে সীতার অগ্নি প্রবেশের পূর্বে হঠাৎ ব্রহ্মা আবির্ভাব হয়ে রামের কাছে প্রকাশ করে দিলেন যে রাম স্বয়ং বিষ্ণু এবং সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। দুই ক্ষেত্রেই সংযোজনের সাহায্যে রামের উপর অবতারত্ব আরোপের যে চেষ্টা হয়েছে তা এত সুস্পষ্ট যে সে বিষয় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন থাকে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামায়ণের সাহিত্যিক উৎকর্ষ

(১)

প্রাথমিক কথা

কোনও ভাষায় প্রকাশিত প্রথম রচিত কাব্য সাধারণত খুব উৎকৃষ্ট মানের হয় না। তার কারণ আছে। যিনি প্রথম রচনা করেন, তাঁর কাছে কোনও আদর্শ বা অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত থাকে না; তাঁকে সম্পূর্ণ নিজের শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। তবু যদি দেখা যায় কোনও বিশেষ সাহিত্যে প্রথম কবির প্রথম রচনা অতি উচ্চমান অধিকার করবার গুণ ধারণ করে; তা হলে ধরতে হবে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন। তিনি ব্যতিক্রম।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটেছিল। আদি-কবি বাল্মীকি রচিত আদিকাব্য রামায়ণ এমন একটি ব্যতিক্রম। পুরাণে গল্প আছে দেবতা ও অসুর মিলে যখন সমুদ্র মন্থন করা হল, তখন সমুদ্র হতে নানা বস্তু তুলে আনা সম্ভব হয়েছিল। যেমন চন্দ্র, ঐরাবত ইত্যাদি। তাদের মধ্যে একজন হলেন উর্ব্বশী নামে নারী। তিনি আবিষ্কৃত হয়েছিলেন পূর্ণযৌবনা রূপে। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'উর্ব্বশী' নামে বিখ্যাত কবিতায় প্রশ্ন তুলেছিলেন উর্ব্বশী কি কোন কালে মুকুলিকা-বালিকা-বয়সী ছিলেন না? যে পুরাণকার তাঁর পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তিনি বলবেন ছিলেন না; তাকে পূর্ণ বিকশিত রূপেই তিনি কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সে তো গেল কল্পনা। আমার ধারণায় বাস্তবক্ষেত্রে রামায়ণের মধ্যে এমন একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তা সংস্কৃত সাহিত্যের

আদিকাব্য হওয়া সত্বেও, তার মধ্যে সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট পরিণত রূপ আবিষ্কার করা যায়।

ঠিক বলতে কি আদিকবির আদিকাব্য এতখানি উৎকর্ষলাভ করেছিল যে তা দেখে অবাক হতে হয়। আদিকবির রচনায় কবিতাকে পরিণত রূপে পাওয়া যায়। উৎকর্ষগুণে তা এত উচ্চ স্থান অধিকার করে যে দেখা যাবে বাল্মীকির পরবর্তী কালে যে সব কবি সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে এক মহাকবি কালিদাস ব্যতীত কেহ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। এমন কি এও দেখা যাবে যে কালিদাসের রচনা বাল্মীকি রচিত রামায়ণ দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সে বিষয় একটি আলোচনাও বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। সুতরাং বাল্মীকিকে শুধু আদিকবি নয়, মহাকবি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

সেই কারণে বর্তমান আলোচনাটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে। প্রথমে বাল্মীকির কবিতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা হবে। দ্বিতীয়ত বাল্মীকি রচিত রামায়ণ কালিদাসের সাহিত্য কীর্তির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা দেখান হবে।

(২)

বর্ণনাভঙ্গির উৎকর্ষ

পরিণত কবিতার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। সেগুলি প্রধানত এই: বর্ণনাভঙ্গির উৎকর্ষ, শব্দ ও অর্থালঙ্কারের নিপুণ প্রয়োগ, চিত্তগ্রাহী বর্ণনা এবং প্রজ্ঞাবচন। এই সব কটি গুণই বাল্মীকি রচিত রামায়ণে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। তার কিছু দৃষ্টান্ত নীচে স্থাপন করা হল:

প্রথমে বর্ণনা ভঙ্গির উৎকর্ষের কথা ধরা যাক। এই উৎকর্ষের

উপাদান কি তা কেউ বলতে পারবেন না। তবে তার একটি লক্ষণ দেওয়া যায়। যে বর্ণনা মনে পুলক সঞ্চার করে, নিদাঘের দিনে দক্ষিণ হতে প্রবাহিত শীতল বায়ুর স্পর্শের মত মিষ্ট লাগে তাই হল উৎকৃষ্ট বর্ণনারীতি। তার কিছু উদাহরণ এখানে স্থাপন করা হল।

সুন্দরকাণ্ডের শেষে রাম যখন সীতাকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলেন তখন রাম যা দেখলেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সমুদ্র ও আকাশের মিলন রেখার একটি বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে ঃ

সাগরং চাম্বরপ্রক্ষমম্বরং সাগরোপমম্।
সাগরং চাম্বরং চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত ॥ ৫।৪।১১৫

অর্থাৎ সাগর অম্বরের সহিত তুলনীয় এবং অম্বর সাগরের সহিত তুলনীয়; কোথায় সাগর শেষ হয়েছে আর কোথায় অম্বর সুরু হয়েছে বোঝা যায় না; দুয়ে মিলে একাকার হয়ে গেছে। সীমাহীন সমুদ্রের বিস্তারের দিগন্তসীমানায় অনন্ত আকাশের মিলন রেখা চিরকাল মানুষের মনকে দোলা দিয়ে এসেছে। রামধনুর পাশাপাশি স্থাপিত রঙের মত তারা পরস্পর মিশে গেছে। উপরের শ্লোকটিতে তার মনোরম বর্ণনা মিলবে। শ্লোকটি কবি নবীন চন্দ্র সেন রচিত 'প্রভাস' নামে কাব্যের একটি অংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাতে আছে ঃ

নীলিমায় নীলিমায় মহিমায় মহিমায়
মিলাইয়া পরস্পর মহা-আলিঙ্গন।

এবার একটি জটিল অথচ সুন্দর বর্ণনাভঙ্গির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। বর্ণনাটির পরিবেশ এই ঃ কৈকেয়ী বৃদ্ধ রাজা দশরথের প্রিয়তমা ভার্যা ছিলেন; রামও তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। এ হেন পত্নী যখন রামকে বনবাসে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন, তখন

রাজা দশরথের চোখে কৈকেয়ী সম্বন্ধে ধারণা কতখানি অবনমিত হল তার বর্ণনা এখানে পাই। বর্ণনাটি দুটি শ্লোকে বিধৃত :

প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যৎ জগতীপতিঃ।
স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্যাং প্রানেভ্যোঽপি গরীয়সীম্॥
অপাপঃ পাপসংকল্পাং দদর্শ ধরণীতলে।
লতামিব বিনিস্কৃতাং দদর্শ ধরণী তলে॥ (২।১০।২৩-১৪)

অর্থাৎ সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ রাজা তখন দুঃখে নিপীড়িত হয়ে প্রাণের অধিক প্রিয়া তরুণী ভার্যাকে ছিন্নমূল লতার মত ভূমিতে পতিত হতে দেখলেন। কৈকেয়ীর আকস্মিকভাবে উলঙ্গ স্বার্থপরতা প্রণোদিত আচরণ দেখে দশরথের তাঁর সম্বন্ধে উচ্চধারণা নষ্ট হয়ে গেল। যাঁকে তিনি মনোরম লতা জ্ঞান করতেন, তিনি ছিন্ন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

বর্ণনাভঙ্গিকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্য দক্ষ কবিরা অনেক সময় যা সোজা ভাবে বলা যায় তাকে দুটি নেতিবাচক কথার সাহায্যে প্রকাশ করেন। সোজা ইতিবাচক বাক্য প্রয়োগ না করে দুটি নেতিবাচক বাক্যের সাহায্যে একই ভাবপ্রকাশ করলে প্রকাশ যেন বেশী দীপ্তিমণ্ডিত হয়। তা সাধারণত অপরিণত সাহিত্যে পাওয়া যায় না; কিন্তু আদিকাব্যে তার নিদর্শন মিলবে। তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

বর্ণনাটি আছে সুন্দরকাণ্ডে। সীতাকে রাবণ কোথায় গোপন করে রেখেছেন তা বার করবার জন্য সুগ্রীব অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি বানর নেতাদের নির্দেশ দিলেন। নানা স্থানে অন্বেষণ করতে করতে হনুমান শেষে লঙ্কার অভ্যন্তরে অবস্থিত অশোকবনে তাঁকে আবিষ্কার করলেন। সেই শুভসংবাদটি রামের কাছে স্থাপন করবার আগে বানরদলটি সাফল্যের আনন্দে সুগ্রীবের সুসজ্জিত উদ্যান মধুবনে উৎসব করেছিল। সেখানে নানা স্বাদু ফল খেয়ে এবং

সুরাপান করে তাদের যে দশা হল তার বর্ণনা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়ঃ

> ন চাত্র কশ্চিৎ ন বভুব মত্তঃ।
> ন চাত্র কশ্চিৎ ন বভুব দৃপ্তঃ॥ ৫।৬১।১৯

অর্থাৎ মধুবনে পান-ভোজনের ফলে সেখানে সকলেই মত্ত হল এবং দৃপ্ত হল। কেউ যে বাদ রইল না সেই কথাটির ওপর জোর দেবার জন্য এখানে নেতি বাচক পরস্পর বিরোধী দুটি করে কথা প্রয়োগ করা হয়েছে।

ভট্টি কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে শরৎকালের একটি মনোরম বর্ণনা আছে। তাতে একটি অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই:

> ন তজ্জলং যন্ন সুচারু পঙ্কজং
> ন পঙ্কজং তদ্ যদলীন ষট্পদম্।
> ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
> ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ॥

অর্থাৎ এমন জলাশয় ছিল না যেখানে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় নি; এমন পদ্ম ছিল না যার ওপর মৌমাছি বসে ছিল না; এমন মৌমাছি ছিল না যা গুঞ্জনে বিরত ছিল; এমন গুঞ্জন ছিল না যা মনকে মুগ্ধ করে নি। ভট্টি কবি আরও দক্ষতার সহিত এই রীতিটি প্রয়োগ করেছেন স্বীকার্য; কিন্তু তার প্রথম প্রয়োগ পাই আদিকাব্যে।

(৩)

অলঙ্কারের ব্যবহার

পরিণত কবিতার একটি লক্ষণ হল তাতে শব্দ ও অর্থালঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়। আদিকাব্যে তার বহু নিদর্শন মিলবে। শব্দালংকার রচনাকে শ্রুতিমধুর করে। জয়দেবের গীতগোবিন্দম্

কাব্যে তার নিপুণ প্রয়োগ হেতু তা এমন জনপ্রিয় গ্রন্থ হয়েছে। তাঁর রচনাকে তা কান্তিমণ্ডিত করেছে। অর্থালঙ্কার প্রয়োগ আরও পরিণত রূপের লক্ষণ। তারও প্রচুর প্রয়োগ বাল্মীকি রচিত রামায়ণে মিলবে। অর্থালংকারের নিপুণ প্রয়োগ কবিতাকে মনোরম করে তোলে। রামায়ণে এই দুই শ্রেণীর অলংকারই কেমন দক্ষতার সহিত প্রযুক্ত হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথমে শব্দালঙ্কারের কথা ধরা যাক। শব্দালঙ্কার প্রধানত দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে ঃ যমক ও অনুপ্রাস। যমকে একই শব্দের ভিন্ন অর্থ নিয়ে বারবার প্রয়োগ দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় তার প্রচুর উদাহরণ মিলবে। অনুপ্রাসে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটায় শুনতে মধুর শোনায়। যেমন জয়দেব বলেছেন 'কোকিল-কূজিত কুঞ্জ কুটীর'। বাল্মীকির রামায়ণে দুই শ্রেণীর শব্দালঙ্কারের ব্যবহার মিলবে।

যমকের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হবে তার পরিবেশ হল এই। সীতার অন্বেষণে হনুমান লঙ্কানগরীতে গভীর রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি প্রথমে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে সীতাকে হয়ত সেখানে পাওয়া যাবে। সেখানে তিনি বহু অন্তঃপুরিকাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখেছিলেন। সেই দৃশ্যটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

চন্দ্রপ্রকাশাশ্চ বর্ণমালা বক্ত্রাঃ সুপক্ষ্মাশ্চ সুনেত্র মালাঃ।
বিভুষণানং চ দর্দশ মালাঃ শতহ্রদানামিব বর্ণমালাঃ। ৫।৫।২২

অর্থাৎ চন্দ্রের আলোকে নানা বর্ণ প্রকাশ হল ; মহিলাদের আননগুলিতে সুন্দর পল্লব শোভিত নেত্রমালা প্রকট হল ; তাঁদের দেহে নানা ভূষণের মালা প্রকট হল ; যেন চারিদিকে শত হ্রদের

মালা বিরাজ করছে। মালাকে যমক হিসাবে এখানে কেমন নিপুণ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার একটি অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। সীতা অপহৃত হলে রাম তাঁর উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজার আসনে স্থাপন করে বললেন যে তখন বর্ষাকাল সমাগত হওয়ায় কোনও অভিযান সম্ভব নয়। বর্ষার শেষে সীতার উদ্ধারের অভিযান হবে। তাই তিনি লক্ষ্মণসহ প্রস্রবণগিরিতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। সেখানে শরৎকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করা হবে তা রামের মুখে স্থাপন করা হয়েছে। শ্লোকটিতে সন্ধ্যার বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে:

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিত তারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্॥ ৪।৩০।৪৫

অর্থাৎ চঞ্চল চন্দ্রকিরণের স্পর্শে হর্ষ সঞ্চারিত হওয়ায় সন্ধ্যা তারারূপ নয়ন খুললেন এবং (সূর্যের প্রতি) অনুরাগ হেতু নিজেই অম্বর ত্যাগ করে তাঁর অনুগামিনী হলেন। এখানে একই শ্লোকে তিন ক্ষেত্রে অনুপ্রাসের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারে: চঞ্চৎ চন্দ্র, স্পর্শ হর্ষ এবং স্বয়ম অম্বর'। আরও বড় কথা তার মধ্যে যে কল্পনাটি বিধৃত হয়েছে তা শ্লোকটিকে আরও মনোরম করে তুলেছে।

কিন্তু শব্দালঙ্কার বাহিরের জিনিষ। তা বাহিরের ভূষণ মাত্র। কবিতার অন্তরে প্রবেশ করবার তা ক্ষমতা রাখে না। তার আবেদন কানে; কিন্তু কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করবার তার অধিকার নাই। মর্মের ভিতরের প্রবেশ করবার ক্ষমতা রাখে অর্থালঙ্কার। কেন রাখে তা বুঝতে হলে কাব্যের ভাষার স্বাতন্ত্র্যের কথা স্মরণ করতে হয়।

ভাষা দুই প্রকার হয়। একটি বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা, অপরটি হৃদয়-বৃত্তির ভাষা। বুদ্ধিবৃত্তির ভাষায় কাজ হল তথ্য বহন করা। তা

জানাবার ভাষা। যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের ভাষা ; যেমন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভাষা। হৃদয়বৃত্তির ভাষা স্বতন্ত্র। তা মানুষের হৃদয় নানা ঘটনা বা অভিজ্ঞতার সংঘাতে কেমন আলোড়িত হয় তাকে বুঝিয়ে দেবার ভাষা। বুদ্ধিবৃত্তির ভাষার আবেদন মস্তিষ্কে ; হৃদয়বৃত্তির ভাষার আবেদন হৃদয়ে। একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে বোঝবার সুবিধা হবে। ধরা যাক একটি মেয়ের দাঁতগুলি যেমন ধবধবে সাদা তেমন পরিপাটি ভাবে সাজানো। তা বর্ণনা করতে তার ভাই হয়ত বলবে বোনটির দাঁতগুলি ভারি সুন্দর। কিন্তু তার যদি প্রেমিক থাকে তা হলে তার দাঁতের এই সৌন্দর্য তার হৃদয়কে দুলিয়ে দেবে। সে তার অনুভূতিকে বর্ণনা করতে কবি জয়দেবের অনুসরণে বলবে কথা বলতে তুমি যখন মুখ খোল তোমার দাঁত প্রকাশ পেয়ে অন্ধকারে আলো ফুটিয়ে তোলে ঃ

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী।
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্॥

এ হল অনুভূতির ভাষা। তাই তা এমন অলংকৃতি ভূষিত ; তাই তাতে এতখানি অতিরঞ্জিত উচ্ছ্বাস।

সুতরাং হৃদয়বৃত্তির ভাষা সৃষ্টি হয় বুদ্ধিবৃত্তির ভাষাকে হৃদয়রসে রঞ্জিত করে রসসিক্ত করে। ফলে জ্ঞানের ভাষার বিশুদ্ধ সত্যতা আর রক্ষিত হয় না ; তার সঙ্গে কল্পনা, অতিরঞ্জন প্রভৃতি মিশ্রিত হয়ে গিয়ে তা ভিন্নরূপ ধারণ করে। এই কাজে শব্দালঙ্কারের ভূমিকা গৌণ ; তা শব্দমাধুর্য সৃষ্টি করে ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে। অর্থালংকার এখানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সত্যের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে তাকে হৃদয়বৃত্তির ভাষায় রূপান্তরিত করে। যিনি কেবল তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন তিনি এইভাবে কল্পনাকে সত্যের সহিত মিশিয়ে হৃদয়বৃত্তির ভাষায় পরিণত করতে পারেন না ; কিন্তু যিনি সাহিত্যের শিল্পী, তিনি তা পারেন। কোনও মহিলার মাথায় কালো কেশের

বিপুল বিস্তার দেখলে বৈজ্ঞানিকের কালো মেঘের কথা মনে উদয় হবে না; কিন্তু কবির হবে। সুন্দর মুখ দেখলে বৈজ্ঞানিকের কমলের কথা মনে হয় না; কিন্তু কবির হয়। এই ভাবেই অর্থালঙ্কার গড়ে ওঠে।

অর্থালঙ্কারের রাজা হল উপমা। তা সাদৃশ্যের সূত্র ধরে বর্ণনীয় বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য অতীতে লব্ধ অনুভূতি বা অভিজ্ঞ-তার সহিত সংযোগ ঘটায়। এইভাবে উপমার মুখ্য ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় মানব-জীবনের সহিত সত্যকে মিশিয়ে দেওয়া। এই প্রতি-পাদ্যের সমর্থনে দুএকটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। যেমন মুখ দেখলে কমলের কথা মনে পড়ে, যেমন খরস্রোতা তটিনী দেখলে নটিনীর কথা মনে পড়ে বা অভিসারিকা রমণীর কথা মনে পড়ে যায়।

উপমা বিশুদ্ধ সত্যকে কিভাবে হৃদয়রসের সহিত মিশ্রিত করে রস সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলে তা বুঝতে হলে উপমার সহিত একটু নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উপমার মধ্যে তিনটি উপাদান আছে: উপমেয়, অর্থাৎ যাকে উপমার বিষয় করি; উপমান, অর্থাৎ যার সঙ্গে উপমা করি; সমানধর্ম, অর্থাৎ যে বিষয় তুলনা করি। কোনও প্রেমিক যখন বলে তার প্রেয়সীর মুখচন্দ্র ঘর আলোকিত করছে, তখন প্রেয়সীর মুখ হয় উপমেয়; যার সঙ্গে উপমা করি সেই চন্দ্র হয় উপমান; আর যে বিষয় নিয়ে উপমা করি, অর্থাৎ আলোকিত করবার ক্ষমতা, তা হয় সমানধর্ম।

উপমা প্রয়োগের সময় যেখানে তিনটি উপাদানেরই উল্লেখ থাকে সেখানে পূর্ণোপমাকে পাই। যেমন দুগ্ধফেননিভ শয্যা। এখানে দুটি বস্তুর সাদৃশ্য বর্ণনাকে শুধু পরিস্ফুট করে না, পরস্পরের এই সঙ্গতির উপলব্ধি মনকে আনন্দ দেয়। কিন্তু দেখা যায় উপমার

প্রচ্ছন্ন আকারে স্থাপিত হবার ঝোঁক কবির মনে প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে উপমার উপাদানগুলির এক বা একাধিক উপাদান অনুল্লিখিত রয়ে যায়। এই শ্রেণীর উপমাকে এই কারণে লুপ্তোপমা বলে। আশ্চর্যের বিষয় হল কিন্তু এই যে উপমা যত বেশী পরিমাণ প্রচ্ছন্ন আকারে স্থাপিত হয়, তত বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়।

লুপ্তোপমা প্রধানত চার শ্রেণীর হতে পারে। সেগুলি নীচে স্থাপিত হল ঃ

১। উপমিত সমাসে সমানধর্ম অনুল্লিখিত থাকে ; উপমান ও উপমেয়কে মাত্র উল্লেখ করা হয়। যেমন 'মুখকমল'। এখানে সমানধর্ম 'সৌন্দর্য' অনুল্লিখিত রয়ে গেছে।

২। উপমান সমাসে উপমিত অনুপস্থিত থাকে ; উপমান ও সমানধর্ম উপস্থিত থাকে। যেমন 'তুষারধবল'। এখানে 'তুষার' উপমান 'ধবল' সমানধর্ম। যার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে তা অনুল্লিখিত।

৩। রূপকের সঙ্গে উপমিতের রূপগত পার্থক্য নাই ; তাদের পার্থক্য অর্থগত। রূপকেও সমানধর্ম অনুপস্থিত থাকে, উপমিত ও উপমান উপস্থিত থাকে। সমাসটি রূপক হবে না উপমিত হবে তা নির্ভর করে এদের কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তার ওপর। উপমিত ও উপমানের মধ্যে অভেদ আরোপ করে যদি উপমানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা হলে রূপক সমাস হয়।

যদি বলি 'মুখচন্দ্র আনন্দ দেয়' তা হলে উপমিত ; কারণ, মুখ এখানে প্রাধান্য পায়।

যদি বলি 'মুখচন্দ্র ঘর আলোকিত করছে' তা হলে তা রূপক হয়ে যায়, কারণ উপমানের অর্থ প্রাধান্য পায়।

৪। এখনি বলা হয়েছে যে উপমা যত প্রচ্ছন্ন হয় বর্ণনা তত মনোহর হয়। তার দৃষ্টান্ত হিসাবে কালিদাস রচিত 'রঘুবংশ'

কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গ হতে একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। শ্লোকটির পরিবেশ এই। লঙ্কা বিজয়ের শেষে রাম সীতাকে নিয়ে পুষ্পকরথে আকাশমার্গে দাক্ষিণাত্য পরিক্রম করছেন। যেতে যেতে একটি স্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি সীতাকে বলছেন :

> সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাম্
> অদৃশ্যত ময়া নূপুরমেকমুর্ব্যাম্।
> ত্বচ্চরণারবিন্দ বিশ্লেষতুঃখাদ্
> ইব বদ্ধমৌলাম্।

অর্থাৎ এই সেই স্থল যেখানে তোমার একটি নূপুর ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। তা যেন তোমার চরণারবিন্দ হতে ভ্রষ্ট হবার তুঃখে মৌন হয়ে ছিল।

এই উক্তিটি ভালই লাগে ; কিন্তু এখানে যদি তুলনাবাচক 'ইব' অব্যয়টি তুলে দেওয়া হত, তা হলে বর্ণনাটি আরও হৃদয়গ্রাহী হত। তখন বলা হত, নূপুরটি তোমার চরণ হতে বিচ্ছিন্ন হবার তুঃখ হেতুই মৌন হয়ে রয়েছে। এখানে উপমানের উল্লেখ নাই, সমান-ধর্মের উল্লেখ নাই, কেবল আচরণের সাহায্যে সমানধর্ম সূচিত হচ্ছে। নূপুরের যেন সীতার চরণ প্রেমাস্পদ ; তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার শোকে সে নীরব হয়ে গেছে। এমন বর্ণনা আরও ভাল লাগে।

তার একটা কারণ আছে। প্রথমটিতে উপমা প্রকট রূপে ব্যবহৃত হয়েছে ; তাই এখানে মানবহৃদয়ের অনুভূতি জড়বস্তুর উপর আরোপের আভাস মাত্র আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নূপুরের উপর বিরহী প্রেমিকের আচরণ আরোপ করে তাকে হৃদয়বৃত্তি ভূষিত মানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে তা আরও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। অর্থাৎ উপমা এখানে প্রকটরূপে নয়, প্রচ্ছন্নরূপে ব্যবহার

হয়েছে বলেই বর্ণনা এমন বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। একে অলংকার শাস্ত্রে সমাসোক্তি বলে। তা খানিকটা রূপকের মত; কারণ, উপমান এখানে প্রাধান্য পায়। কিন্তু উপমান এখানে অনুপস্থিত, সমানধর্মও অনুল্লিখিত। আচরণের দ্বারা সমানধর্ম সূচিত হয়েছে। এখানে এই ভাবে উপমা সর্বাধিক প্রচ্ছন্ন হয়েছে বলে জড়বস্তুর উপর মানব হৃদয়ের অনুভূতিগুলি সর্বাধিক সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একে তথ্যের সহিত মানবরসের মিশ্রণ বলেন।

সুতরাং সমাসোক্তির মধ্যে উপমার সব থেকে সার্থক প্রয়োগ ঘটে থাকে। তবে একথা স্বীকার্য যে সমাসোক্তির প্রয়োগ বেশ সূক্ষ্ম শিল্প বোধ না থাকলে সম্ভব হয় না। সাধারণত উচ্চমানের কবিদের রচনার মধ্যেই তার প্রয়োগ সীমিত থাকতে দেখা যায়। কালিদাস বা শেলী বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তার বহু নিদর্শন মিলবে। এতগুলি কথা বলার উদ্দেশ্য হল এই কথা প্রতিপালিত করা যে সমাসোক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত উন্নত মানের কবিতার পরিচয় দেয়। আমরা দেখব আদিকবি হওয়া সত্ত্বেও বাল্মীকির রচনায় নানা শ্রেণীর উপমার সহিত সমাসোক্তিরও প্রয়োগ দেখা যাবে।

এখন রামায়ণে নানা সূত্রে নানা শ্রেণীর উপমার প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি। একটি সাধারণ পূর্ণোপমার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যেতে পারে।

পরিবেশটি হল হরধনু ভগ্ন হবার পর রামসহ চার ভ্রাতার মিথিলায় জনকের প্রাসাদে সীতা সহ চার ভগিনীর বিবাহের আয়োজন হয়েছে। সেই সভায় জনক কন্যা সীতাকে রামের কাছে সম্প্রদান করতে গিয়ে বলছেন,

প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্লীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥ ১।৭৩।২৭

অর্থাৎ তোমার কল্যাণ হক। এই কন্যার পাণিগ্রহণ কর ; ইনি পতিব্রতা, ভাগ্যবতী এবং ছায়ার মত (অভিভাবকের) অনুগমন করেন। সীতার নম্র স্বভাবের সহিত ছায়ার অনুগমনের এই তুলনাটি একটি পূর্ণোপমার দৃষ্টান্ত। তা একটি জনপ্রিয় উপমা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার একটি জটিল পরিবেশের মধ্যে সুনিপুণ উপমা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে। দৃশ্যটি অযোধ্যাকাণ্ডের গোড়ায় স্থাপিত। রাজা দশরথ সিদ্ধান্ত করেছেন যে রামকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করবেন। তাই সভায় রামকে ডেকেছেন। নানা সভাসদ সেই সভাকে অলংকৃত করে উপবিষ্ট হয়েছেন ; এমন সময় সেখানে রামের আবির্ভাব হল। এই ঘটনাটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

বিমলা গ্রহনক্ষত্রা শরদি দ্যৌরিবেন্দুনা।
স পশ্যমানো নৃপতিস্তুতোষ প্রিয়মাত্মজম্॥ ২।৩।৩৭

অর্থাৎ শরৎকালের বিমল আকাশের গ্রহনক্ষত্র শোভিত পরিবেশে ইন্দু যেমন শোভা পায় রাজা নিজ তনয়কে তেমন ভাবে শোভা পেতে দেখে আনন্দিত হলেন। এখানে সভা যেন শরৎকালে পরিচ্ছন্ন আকাশ, সভাসদ্‌গণ যেন গ্রহনক্ষত্র এবং রামের আবির্ভাব যেন তার মাঝখানে চন্দ্রের উদয়ের মত। উপমাটিতে শুধু রামের সহিত চন্দ্রের তুলনা হয় নি, সমগ্র পরিবেশটির একটি তুলনীয় পরিবেশের সহিত সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একই বিষয়ের সঙ্গে অনেকগুলি তুলনীয় বস্তুর উপমা টানলে আমরা উপমামালা পাই। তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। পরিবেশটি হল এই। সীতার অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে হনুমান লঙ্কাপুরীর মধ্যে অবস্থিত সীতাকে অশোকবনে চেড়ী পরিবৃত অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। হনুমান তাঁকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখলেন। তাঁর সেই রাহুগ্রস্ত রূপের বর্ণনা কবি এইভাবে

দিয়েছেন ঃ

তাং স্মৃতিমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
নিহতামিব শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব॥ ৫।১৫।৩০

অর্থাৎ হনুমান যেন তাঁকে দেখলেন ম্লান স্মৃতির মত, নিপতিত ঋদ্ধির মত, নিহত শ্রদ্ধার মত এবং প্রতিহত আশার মত। এখানে লক্ষণীয় যে বিমূর্ত ভাবের সঙ্গে সীতার দুর্দশার তুলনা টানা হয়েছে। সূক্ষ্ম পর্যায়ের চিন্তার ক্ষমতা না থাকলে এই প্রকৃতির উপমা প্রয়োগ সম্ভব নয়। অপরিণত সাহিত্যে তার প্রয়োগ বড় একটা চোখে পড়ে না।

এখানে উপমামালা সোজাসুজি স্থাপিত হয়েছে। রামায়ণে এমন দৃষ্টান্তও মেলে যেখানে উপমাগুলি নেতিবাচক রূপে স্থাপিত হয়েছে। যেমন এই শ্লোকটি ঃ

নাতন্ত্রী বাদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥ ২।৩৯।২৯

অর্থাৎ বীণা তন্ত্রীর সহিত যুক্ত না থাকলে বাজে না, চক্র না থাকলে রথ চলে না ; তেমন পতি হতে বিচ্ছিন্ন হলে যে নারী শত পুত্রের জননী সেও সুখে থাকে না। রাম যখন বনগমনে উদ্যত, সীতা সঙ্গে যেতে চাইলেন। রাম বনবাসে কত যন্ত্রণা তার বিবরণ দিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। তখন সীতা এই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি এই উপমার সাহায্যে তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে যুক্তিটি সুন্দরভাবে স্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছেন প্রাসাদে অতিবাহিত জীবনে পতি বিরহিত হয়ে কোনও সুখ নাই। অরণ্য-বাসে পতিসঙ্গ তুলনায় তাঁর কাছে বেশী আকর্ষণের বস্তু।

এবার একটি নূতন আস্বাদের উপমা স্থাপন করার প্রস্তাব করি। উপমা সাধারণত সমগুণ সম্পন্ন বস্তুর উপর প্রয়োগ করা হয়। এই দৃষ্টান্তে দেখা যাবে দুই বিপরীত গুণসম্পন মানুষের মধ্যে তুলনা।

তুলনায় কে উৎকৃষ্ট এবং কে নিকৃষ্ট তা কয়েকটি উপমার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

পরিবেশটি এই। সীতাকে অপহরণের উদ্দেশ্যে মারীচের সহযোগিতায় রাবণ প্রথমে রাম এবং পরে লক্ষ্মণকে সীতার নিকট হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজে পরিব্রাজক রূপে সীতার কাছে উপস্থিত হলেন। তারপর সীতা তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আত্মরূপ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, আমি রাবণ, রাক্ষসগণের ঈশ্বর; লঙ্কা নামে সাগরবেষ্টিত পুরীতে আমি বাস করি। তোমাকে আমার অগ্রমহিষী করতে চাই। তুমি যদি আমার ভার্যা হও সকল সম্ভাব্য অলঙ্কার দিয়ে তোমার দেহকে আমি ভূষিত করব, তোমার সেবার জন্য পাঁচ সহস্র দাসী নিযুক্ত করব। রাবণের এই স্পর্ধা সীতাকে দারুণ ভাবে রুষ্ট করল। কোথায় রাম আর কোথায় রাবণ। রাবণ কি করে আশা করেন রামের ভার্যা হয়ে তিনি রাবণকে ভজন করবেন?

এই সূত্রেই সীতা দৃপ্ত ভঙ্গিতে রামের সঙ্গে রাবণের বৈপরীত্যের যে তুলনামূলক মন্তব্য করেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এখানে বহু উপমা প্রয়োগ করা হয়েছে; সুতরাং এটি উপমামালারও একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। বিপরীত গুণগুলি প্রকট করতে উপমান হিসাবে যে বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলি সুনির্বাচিত হওয়াতেই এই অংশটি এত মনোরম হয়েছে। এবার শ্লোকগুলি স্থাপন করা যেতে পারে:

যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে যদন্তরং স্যন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ।
সুরাগ্রসৌবীরকয়োর্যদন্তরং তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥
যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়ো যদন্তরং চন্দনবারি পঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তিবিড়ালয়োর্বনে তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥
যদন্তরং বায়সবৈনতেয়যোর্যদন্তরং মদ্‌গুময়ূরয়োরপি।

যদন্তরং হংসকগৃধ্রয়োর্বনে তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥ ৩।৪৮।৪৫-৪৭

অর্থাৎ সিংহ ও শৃগালের মধ্যে যে পার্থক্য, সমুদ্র ও জলাশয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, উৎকৃষ্ট সুরার সঙ্গে ধান হতে উৎপাদিত মদ্যের যে পার্থক্য, কাঞ্চনের সহিত সীসের যে পার্থক্য, হস্তীর সহিত বিড়ালের যে পার্থক্য, গরুড়ের সঙ্গে বায়সের যে পার্থক্য, ময়ূরের সঙ্গে পান-কৌড়ির যে পার্থক্য, হংসের সঙ্গে শকুনির যে পার্থক্য দশরথতনয় রামের সঙ্গে তোমার সেই পার্থক্য।

উপমাভিত্তিক সমাস একটি জটিল জিনিষ। এখানে উপমেয় ও উপমান পৃথক থাকে না; তাদের মিলিয়ে সমাস করে রচনায় ব্যবহার করা হয়। যে সাহিত্য পরিণতি লাভ করেছে তাতেই তার ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু আদিকাব্য রামায়ণেও তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে। তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করা হবে।

তার পরিবেশ এই: দশরথ যখন ঘোষণা করলেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে তিনি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করবেন তখন অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কারণ, রাম তাঁদের কাছে অতি প্রিয় ছিলেন। তারা দলে দলে অযোধ্যার পথ-গুলি ভরে ফেলে হর্ষধ্বনি করতে লাগল। পথে জনতার ভিড় নয় জনস্রোত দেখা গেল। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এবার স্থাপন করা যেতে পারে:

জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বন বৃতস্তদা
বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥ ২।৫।১৭

অর্থাৎ রাজপথগুলিতে জনতার স্রোতের পরস্পর সংঘর্ষ হেতু এবং হর্ষধ্বনি হেতু সাগরের গর্জনের মত ধ্বনি শোনা গেল। এখানে 'জনবৃন্দোর্মি' একটি উপমিত সমাসের উদাহরণ। জনস্রোত যেন তরঙ্গের মত পথগুলিকে ভাসিয়ে দিল।

এবার আমরা সমাসোক্তির একটি দৃষ্টান্ত দেব। আমরা উপরের

আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত করেছি যে উপমার সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী রূপটি পাই সমাসোক্তির মধ্যে। এর লক্ষণ হল এখানে জড়বস্তুর উপর বা প্রাকৃতিক শক্তি বা ইতর প্রাণীর উপর মানবোচিত আচরণ আরোপ করে তাদের মানবধর্মী করে দেওয়া। আদিকাব্যে তারও দৃষ্টান্ত মিলবে। এই শ্লোকটি দেখা যেতে পারে :

ন বাতি পবনঃ শীতো ন শশী সৌম্যদর্শনঃ।
ন সূর্যাস্তপতে লোকং সর্বং পর্যাকুলং জগৎ ॥ ২।৪১।১৮

অর্থাৎ শীতল বায়ু আর প্রবাহিত হয় না, চন্দ্রের সৌম্যমূর্তি ম্লান হয়ে গেছে, সূর্য আর তেমন আলো দেয় না ; সমগ্র জগৎ আকুল হয়ে পড়েছে। এখানে রামের বনবাসের সংবাদ শুনে অযোধ্যা নগরীর কি দশা হল তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সকলের তিনি এতখানি প্রিয় ছিলেন যে প্রজাগণ তো শোকে কাতর হলই ; এমন কি নৈসর্গিক বস্তু তাদের আচরণে জানিয়ে দিল তারাও রামের বিচ্ছেদে সমানই কাতর হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমের অলঙ্কার শাস্ত্রে একে Personification বলা হয়। নামকরণ যথার্থই হয়েছে ; কারণ এখানে জড় প্রকৃতির উপর আচরণের দ্বারা মানুষের প্রকৃতি আরোপ করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যরসিক রাসকিন (Ruskin) তার নাম দিলেন Pathetic fallacy। তাঁর ধারণায় ভাবের আবেগে কবি যখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তখন চিন্তার বিকৃতি হেতু এই ভ্রান্ত তথ্য তিনি পরিবেশন করেন। আমার মনে হয় এখানে তিনি কবিদের প্রতি অবিচার করেছেন। ভ্রান্তি তাঁদের ঘটেনি, ঘটেছে তাঁরই। কবিতার আলোচ্য বিষয় তথ্য নয়, তা পরিবেশন করে শিল্প। তাই সত্যের সঙ্গে কল্পনা সংযোগ করে তাকে হৃদয়বৃত্তির গ্রহণযোগ্য করে তোলবার অধিকার তাঁদের আছে। এখানে কোনও ভ্রান্তি ঘটে না ; কবি সত্যকে রূপান্তরিত করে তাকে কবিতার গ্রহণযোগ্য

করে তোলেন। বিখ্যাত অলঙ্কার তত্ত্ববিৎ শ্যামাপদ চক্রবর্তী ঠিকই বলেছেন যে এটি হল 'রাসকিনের অপসৃষ্টি'। (১)

(৪)

নিসর্গ শোভা

আদি কাব্যের আর একটি মহৎ গুণ হল নিসর্গ শোভার সুন্দর বর্ণনা গ্রন্থখানির নানা অংশে ছড়ান আছে। মনে হয় আদিকবি বাল্মীকির সৌন্দর্যবোধ বেশ তীক্ষ্ণ ছিল। তাই যে কোনও প্রসঙ্গে কাব্যের চরিত্রগুলি প্রকৃতির পরিবেশে যেখানে স্থাপিত হয়েছে সেখানেই নৈসর্গিক শোভার সুন্দর বর্ণনা রচনাকে অলঙ্কৃত করেছে। বহু স্থানে বর্ণনাগুলি বিভিন্ন চরিত্রের মুখে স্থাপিত হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে কবি যে নয়নে প্রকৃতিকে দেখেছেন তা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে স্থাপন করে দিয়েছেন। আদিকাব্য নৈসর্গিক শোভার বর্ণনায় পুষ্ট হয়ে এক অনন্যসাধারণ মহাকাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। ঠিক বলতে কি বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিশেষ দেখা যাবে না। অরণ্যের বর্ণনা, পর্বতের বর্ণনা, খরস্রোতা নদীর বর্ণনা, নানা ঋতুর বর্ণনা যেমন প্রচুর মিলবে সাহিত্যিক গুণেও দেখা যাবে সেগুলি বিশেষ সমৃদ্ধ। এদিক হতে তুলনায় মহাভারত নিতান্তই দরিদ্র।

এবার তার কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমে চিত্রকূট পর্বতের বর্ণনা দিয়ে আমরা আরম্ভ করতে পারি। ভরদ্বাজ ঋষির উপদেশ অনুসারে রাম প্রথম চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে বনবাস জীবন আরম্ভ করেছিলেন। সেখানে চিত্রকূট পর্বতের শোভা এবং তার সানুদেশে প্রবাহিত মন্দাকিনী নদীর শোভা রামকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি যে নয়নে তাদের দেখেছেন তা সীতাকে যে ভাবে

১। শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলঙ্কারচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৪২।

শুনিয়েছিলেন তাতে একটি অপূর্ব নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা মিলবে। তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

বর্ণনাটি অযোধ্যাকাণ্ডের ৯৪তম সর্গে স্থাপিত হয়েছে। সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাম বলছেন, চিত্রকূট গিরি নানা পক্ষী দ্বারা ভূষিত, তার শিখরগুলি বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত, আম্র, জম্বু, লোধ্র, প্রিয়াল, পনস, বদরী, আমলক, নীপ প্রভৃতি বৃক্ষ দিয়ে তা শোভিত। সুতরাং তা যে অতি রমণীয় তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। নামকরণের সঙ্গে তার শোভা সঙ্গতি রক্ষা করে।

এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভিঃ মনোরমৈঃ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ॥
২।৯৪।১০

অর্থাৎ পুষ্পশোভিত, ফলভারে নত, ছায়াবান নানা মনোরম বৃক্ষে আকীর্ণ এই গিরি শ্রীমণ্ডিত হয়েছে।

শুধু কি তাই? আরও আছে—

গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভরান্ বহূন্।
ঘ্রাণতর্পণমভেত্য কং নরং ন প্রহর্ষযেৎ॥ ২।৯৪।১৪

অর্থাৎ গুহা হতে প্রবাহিত সমীরণ দ্বারা বাহিত নানা পুষ্পের গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়ে কোন মানুষ না হর্ষ লাভ করে।

এই পর্বতেরই সানুদেশে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। তারও একটি সুন্দর বর্ণনা অনুরূপভাবে রামের মুখে স্থাপিত হয়েছে। রাম বলছেন নদীটির পুলিন হংস ও সারস দ্বারা শোভিত, তার তটদেশ নানাবিধ পুষ্প ও ফলপ্রসূ বৃক্ষ দ্বারা শোভিত। আরও আছে—

ক্বচিন্ মণি নিকাশোদাং ক্বচিৎ পুলিনশালিনীম্।
ক্বচিৎ সিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥ ২।৯৪।৯

অর্থাৎ মন্দাকিনী নদীকে দেখ। কোথাও তার জল মণির

মত শোভা ধারণ করে, কোথাও তার তটের বিস্তার ঘটেছে, কোথাও সিদ্ধগণ বিচরণ করছে।

চিত্রকূট পর্বতে ভরত আসবার পর রাম অযোধ্যা হতে দূরতর দেশে গিয়ে বাস করবেন ঠিক করলেন। তাই চিত্রকূট ত্যাগ করে তিনি দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁর সহিত দেখা করে কোথায় বাস করবেন সে বিষয়ে উপদেশ চাইলেন। অগস্ত্য তাঁকে গোদাবরীর তীরে অবস্থিত পঞ্চবটীতে কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে উপদেশ দিলেন। তখন সীতা ও লক্ষ্মণসহ পঞ্চবটীতে এসে তার রূপ দেখে রাম মুগ্ধ হলেন। রাম তখন একটি মনোরম স্থান নির্বাচন করে সেখানে লক্ষ্মণকে কুটীর বাঁধতে নির্দ্দেশ দিলেন। তার একটি সুন্দর বর্ণনা অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গে পাওয়া যায়। রাম লক্ষ্মণকে বললেন এই তরুপরিবৃত স্থানে আশ্রম স্থাপন কর, কারণ এখানে :

ইয়মাদিত্যসংকাশৈঃ পদ্মৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ।
অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পদ্মিনী পদ্মশোভিতা॥
যথাখ্যাতমগস্ত্যেন মুনিনা ভাবিতাত্মনা।
ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা চক্রবাকোপ শোভিতা।
নাতিদূরে ন চাসন্তে মৃগযূথ নিপীড়িতা॥ ৩।১৫।১১-১৩

অর্থাৎ, এখানে (সন্ধ্যাকালের) সূর্যের মত অরুণ বর্ণ সুগন্ধযুক্ত পদ্ম দ্বারা শোভিত এবং প্রজ্ঞাবান মুনি অগস্ত্য যেমন বলেছিলেন অদূরে রম্যা (গোদাবরীকে দেখা যাচ্ছে)। পুষ্পভূষিত তরু দ্বারা পরিবৃত, নানা জাতীয় হংস ও চক্রবাক দ্বারা শোভিত এই সেই গোদাবরী ; অনতি দূরে মৃগযুথ অধ্যুষিত অঞ্চল।

তারপর অরণ্যকাণ্ডের একেবারে প্রান্তে স্থাপিত আর একটি মনোরম নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয়। সীতাকে রাবণ

অপহরণ করে নিয়ে যাবার পর রাম লক্ষ্মণ সহ দক্ষিণ অভিমুখে তাঁর সন্ধানে চললেন। চলতে চলতে তাঁরা শবরীর আশ্রমে এলেন। সেখানে শবরীর সহিত সাক্ষাৎ হল। নিকটেই পম্পা সরোবর। তার শোভা রামকে সেখানে আকৃষ্ট করল। সেখানে রাম কি দেখলেন তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তার সবিস্তার উদ্ধৃতির এখানে প্রয়োজন নাই। তবে বর্ণনার সাহিত্যিক গুণের সহিত পাঠকের পরিচয় স্থাপনের জন্য দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

রম্যোপবনসম্বাধাং পদ্মসম্পীড়িতোদকাম্।
স্ফটিকোপমতোয়াং তাং শ্লক্ষবালুকাসংততাম্॥
মৎস্যকচ্ছপ সম্বাধাং তীরস্থদ্রুমশোভিততাম্।
সখীভিরিব সংযুক্তাং লতাভিরনুবেষ্টিতাম্॥ ৩।৭৫।১৭-১৮

অর্থাৎ (তিনি দেখলেন) পম্পা সুন্দর উপবন দ্বারা পরিবেষ্টিত, তার জলে পদ্ম ফুটে রয়েছে, তটে মনোরম বালুকার বিস্তার, তাতে অগণিত মৎস্য ও কচ্ছপ বাস করে, তীরদেশ নানা বৃক্ষ দ্বারা শোভিত এবং তাকে বেষ্টন করে নানা লতা সখীর মত তাকে ঘিরে রয়েছে।

(৫)

ঋতু বর্ণনা

সারা বছর জুড়ে সূর্যকে যখন পৃথিবী পরিক্রমণ করে তখন সৌরতাপের তারতম্য হেতু নানা ঋতুর আবির্ভাব হয়। তাদের প্রভাবে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তিত হয়। সেই পরিবর্তন আদিকাল হতে মানুষের মনকে দোলা দিয়ে এসেছে। তার রুদ্ররূপ যেমন তার মনে ভয় সঞ্চার করেছে, তেমন বসন্তের স্পর্শে নবীন রূপ মনকে উৎফুল্ল করেছে। বর্ষার অকৃপণ হস্তে মেঘের বারিবর্ষণ যেমন তাকে উদাসী করেছে, তেমন হেমন্তের কুহেলি ও নবজাত শস্যের দাক্ষিণ্য তাকে পুষ্টি দিয়ে সুখী করেছে। তাই দেখি

মানুষের মনে বিভিন্ন ঋতু যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা চিরকাল কবিদের কাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। আদিকবির আদিকাব্যে কিন্তু আমরা তার প্রথম আবির্ভাব ঘটতে দেখি। ছয়টি ঋতুর মধ্যে রামায়ণে তিনটি ঋতুর সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই তিনটি ঋতু হল বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত। ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রকৃতি কেমন রূপ পরিবর্তন করে তার সুন্দর পরিচয় এই রচনাগুলিতে মিলবে। তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখন দেওয়া যেতে পারে।

যদিও হেমন্ত ঋতু বর্ষা ও শরতের পরে আসে, হেমন্ত দিয়েই এই আলোচনা আরম্ভ করা প্রশস্ত হবে মনে হয়; কারণ, হেমন্তের বর্ণনাটি সবার আগে স্থাপিত হয়েছে। তখন রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ সবে পঞ্চবটী বনে বাস করতে সুরু করেছেন। একদিন গোদাবরীতে প্রাতঃস্নান করতে তাঁরা তিন জন রওনা হলেন। তখন হেমন্ত এসে গেছে। লক্ষ্মণ তার প্রকাশ লক্ষ্য করে রামের তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করলেন। বর্ণনাটি দীর্ঘ, তার পূর্ণ পরিচয় দেবার প্রয়োজন নাই। হেমন্ত ঋতুর দুই রূপ; একদিকে তা পাকা ফসলের ডালি সাজায়, অপর দিকে তা শীতের কঠোর দিনের প্রস্তুতি হিসাবে সুন্দর রূপের সাজ ধীরে ধীরে ছাড়তে সুরু করে। গাছে ফুল ধরে না, কুয়াসায় চারিদিক ঢেকে যায়। একটি বিষাদের ছায়া যেন ঘনীভূত হতে থাকে। প্রকৃতির রিক্ত হবার প্রস্তুতি সূচক কয়েটিক শ্লোক এই প্রসঙ্গে এখানে স্থাপন করা যেতে পারে:

অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতসমা বৃতাঃ।
প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ॥
বাষ্পসংছন্ন সলিলা রুতবিজ্ঞেয় সারসাঃ।
হিমার্দ্রবালুকৈস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাম্প্রতম্॥ ৩।১৬।২৩-২৪

অর্থাৎ পুষ্পহীন বৃক্ষগুলি কুজ্ঝটিকা ও নীহারের আঁধারে আবৃত হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। নদীগুলির জল এখন বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; সারসের উপস্থিতি তাদের রব হতে অনুমান করতে হয়; তাদের তীরগুলি এখন হিমার্দ্র বালুকায় আবৃত।

বর্ষা ও শরতের বর্ণনা পাওয়া যায় একেবারে বনবাসে অতিবাহিত বৎসরগুলির শেষ প্রান্তে। তখন রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃতা হয়েছেন। তাঁর অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে রাম লক্ষ্মণ পম্পাসরোবরের কাছে সুগ্রীবের সহিত পরিচিত হলেন। সুগ্রীব তখন নিকটে অবস্থিত ঋষ্যমূক পর্বতে বালী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বাস করছেন। সঙ্গে হনুমান সহ পাঁচজন বিশ্বস্ত অনুচর। সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে রাম মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ঠিক হল রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। প্রতিদানে সুগ্রীব সীতাকে অন্বেষণ করে কোথায় আছেন জানাবেন এবং তারপর সীতাকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ অভিযানে নিজের সৈন্য দিয়ে রামের সহায়তা করবেন।

রামের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনতিবিলম্বে পালিত হয়ে গেল। বালীকে নিধন করে রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজপদে স্থাপিত করলেন। কিন্তু তখন বর্ষাকাল পড়ে গিয়েছিল। সে সময় না সীতার অনুসন্ধানকার্য, না যুদ্ধ-অভিযান সম্ভব। তাই রাম সুগ্রীবকে শরৎকাল না আসা পর্যন্ত রাজ্যসুখ ভোগ করতে উপদেশ দিলেন। নিজে লক্ষ্মণ সহ সেই সময় প্রস্রবণ গিরিতে অবস্থান করবেন ঠিক করলেন। এই প্রস্রবণ গিরির ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'সীতার বনবাস' নামক গ্রন্থে এমন একটি মনোরম বর্ণনা দিয়ে গেছেন যে তা বাঙালী ছাত্র মহলে বিশেষ পরিচিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে তা উদ্ধৃত হয়েছে। দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল। নৈসর্গিক শোভার পরিবেশে

বর্ষার নয়নরঞ্জন রূপ রামকে মুগ্ধ করল। রাম লক্ষ্মণের নিকট তার একটি মনোহর বর্ণনা দিয়েছেন। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সমগ্র অষ্টাবিংশ সর্গ জুড়ে ছেষট্টিটি শ্লোকে বাল্মীকি ঋষি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তার কিছু অংশ এখানে স্থাপিত হতে পারে।

শরতের আকাশে কত বিচিত্র মেঘের খেলা :

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রজীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বত সংনিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্থ॥ ৪।২৮।১৭

অর্থাৎ, নভোমণ্ডল কোথাও মেঘ মুক্ত, কোথাও তা মেঘে আবৃত, কোথাও পর্বতাকার মেঘ দাঁড়িয়ে আছে, তা শান্ত সমুদ্রের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মেঘের শান্ত রূপকে পাই।

আবার কোথাও মেঘের রুদ্ররূপ। যেমন :

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদাঃ
মত্ত গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥

অর্থাৎ, বিদ্যুতের পতাকা বহন করে, বলাকামালা দ্বারা শোভিত হয়ে বিরাট গিরিশিখরের মত আকার ধরে মেঘেরা যুদ্ধে নিযুক্ত মত্ত হস্তীর মত উচ্চনাদে গর্জন করছে।

কোথাও আবার নিসর্গ উল্লাসে সঙ্গীতমুখর হয়ে উঠেছে। যেমন :

ষট্‌পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং
প্লবঙ্গমোদীরিত কণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ
র্বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্। ৪।২৮।৩৬

অর্থাৎ, মধুমক্ষিকার তন্ত্রীতে মধুর রব ও মৃগযুথের কণ্ঠে ধ্বনিত তালের সঙ্গে মেঘের মৃদঙ্গধ্বনি যেন বনের মধ্যে সঙ্গীতের আসর বসিয়েছে।

প্রস্রবণ গিরিতে বাস করতে করতে বর্ষা অতিবাহিত হয়ে গেল। শরৎকাল এল। তার শোভাও রামকে মুগ্ধ করল। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ত্রিংশসর্গে রামের মুখে তার একটি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে। এখানে যে বর্ণনা পাই তাতে উপমার ছড়াছড়ি। তাদের মধ্যে তিনটি চয়ন করে এখানে উদ্ধৃত করা হল। প্রথমে রাত্রির বর্ণনা দিয়ে সুরু করা যাক:

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিত-সৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মীলিত-চারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি
নারীব শুভ্রাংশুক সংবৃতাঙ্গী॥ ৪।৩০।৪৩

অর্থাৎ, রাত্রি যেন শ্বেতবসনে সজ্জিত একটি নারী। উদিত শশাঙ্ক তার মনোরম মুখ, তারাগুলি তার চারুনেত্র এবং জ্যোৎস্নার আলো তার বসন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত রাত্রিকে কবি একজন শুভ্রবসনে সজ্জিত নারীরূপে চিত্রিত করে তার একটি সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট করে তুলেছেন। শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যাংশ 'বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত' এর কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার একটি সরোবরের বর্ণনা মিলবে এই শ্লোকটিতে:

প্রকীর্ণ হংসাকুলমেখালানাং
প্রবুদ্ধপদ্মোৎপল মালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মী-
র্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্। ৪।৩০।৪৯

অর্থাৎ, উত্তম সরোবরগুলির শোভা কলরব মুখর হংসের মেখলা

ধারণ করে, প্রস্ফুটিত পদ্মের মালায় ভূষিত হয়ে আজ বৰ্দ্ধিত হয়েছে। তারা যেন সুন্দরী ভূষণে সজ্জিত রমণীর মত। হংসের মেখলা এবং পদ্মের মালা যে কবি কল্পনা করতে পারেন, তিনি কেবল আদিকবি নয়, তীক্ষ্ণ-সৌন্দর্য্য-বোধ-সম্পন্ন কবি।

এবার নদীর বর্ণনা দেখা যাবে নীচে স্থাপিত শ্লোকটিতে :

নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ—
ৰ্ব্যাধূয়মানৈ র্মৃদু মারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি॥

৪।৩০।৫১

অর্থাৎ, নদীর কূলে নূতন প্রস্ফূটিত ফুলের হাসি ছড়িয়ে আছে এবং মৃদুপবনে আন্দোলিত কাশে শোভিত হয়ে তা ধৌত-অমল-ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিত নারীর শোভা ধারণ করেছে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, সেই প্রাচীন কালেও নদীর তটে কাশফুলের শোভা কবির মনকে মুগ্ধ করত।

রামের মুখে এমন বিস্তারিত ভাবে ঋতুর বর্ণনা স্থাপিত হওয়ায় মনে হতে পারে এখানে রচনায় একটি কৃত্রিমতা সঞ্চারিত হয়েছে। কবি যেন রামকে উপলক্ষ্য করে নিজের কাব্যশক্তির পরিচয় দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সে দোষ আদিকবিকে দেওয়া যায় বলে মনে হয় না। তিনি রামের চরিত্রটি এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে রামের মুখে ঋতুগুলির রূপের বর্ণনা স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠবার দাবী রাখে। তার প্রমাণের জন্য আমাদের আর একবার চিত্রকূট পর্বতে রামের অবস্থানের কথা স্মরণ করতে হবে। এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাম চিত্রকূটের পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে সীতার নিকট তার একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি সীতাকে এই কথা বলেছিলেন :

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিদং গিরিম্॥ ২।২৪।৩

অর্থাৎ সিংহাসন লাভ হতে বঞ্চিত হয়ে বা বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার এই রমণীয় গিরির শোভা দেখে মনে কোন কষ্ট বোধ হয় না। সুতরাং রামের চরিত্রের সৌন্দর্যবোধ একটি মৌলিক গুণ। নিসর্গশোভা দেখে তিনি এত আনন্দ পেতেন যে বনবাস তাঁকে কষ্ট দিতে পারতনা। এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে প্রকৃতির পরিবেশে বিভিন্ন ঋতু যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে তা দেখে উচ্ছ্বসিত এবং মুখর হওয়া রামের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

(৬)
প্রজ্ঞাবচন

একটি বড় কাহিনী বলতে নানা চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়, তারা জীবনপথে বিভিন্ন পরিবেশের সম্মুখীন হয়, ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই প্রসঙ্গে চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যে নানা প্রজ্ঞাবচন উচ্চারিত হয়। অবশ্য এই সকল প্রজ্ঞাবচনের উৎস স্বয়ং গ্রন্থকার। তিনি যত প্রজ্ঞাবান হবেন তাঁর গ্রন্থে তত বেশী সংখ্যায় প্রজ্ঞাবচন আত্মপ্রকাশ করবে। বিরাট রামায়ণ গ্রন্থখানি জুড়ে বহু প্রজ্ঞাবচন ছড়িয়ে আছে। তা প্রমাণ করে আদিকবি বাল্মীকি একজন বিচক্ষণ বহু-অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ প্রজ্ঞাবান ঋষি ছিলেন। তাই রামায়ণকে নানা প্রজ্ঞাবচন দিয়ে ভূষিত করে তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাঠকের আস্বাদের জন্য এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল।

রামের ভাগ্যে যখন বনবাসের নির্দেশ এল তখন রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে একটি বিতর্ক হল। রাম বনবাসকে বিনা দ্বিধায় ভাগ্যের বিধান হিসাবে মেনে নিতে চান। লক্ষ্মণ সে দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন

করেন না। লক্ষ্মণ পুরুষাকারে বেশী আস্থা রাখেন। এই প্রসঙ্গে দৈব ও পুরুষাকারের সমর্থনে দুটি প্রজ্ঞাবচন পাওয়া যায়। রাম দৈবর সমর্থনে বলেছেন—

সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যস্য কিংচিৎ তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম তৎ॥ ২।২২।২২

অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ, ভয় ও ক্রোধ, লাভ ও ক্ষতি, যার যা ভাগ্যে ঘটে সবই দৈব দ্বারা সংঘটিত হয়।

লক্ষ্মণ তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেছেন—

দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥ ২।২৩।১৭

অর্থাৎ যে মানুষ দৈবকে পুরুষকার দ্বারা ব্যাহত করতে পারে দৈবের প্রভাবে বিপন্ন হয়ে সে কষ্ট পায় না।

রামকে বনবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই সংবাদে দশরথের প্রথমা মহিষী অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে দশরথকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করেছিলেন। দশরথ তখন ক্ষোভে অভিভূত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তখন কৌশল্যা লজ্জায় ভেঙে পড়ে দশরথের নিকট নিজের অশোভন আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে শোকের আতিশর্য্যে ধৈর্যচ্যুতি হেতুই তিনি এই অন্যায় কার্য করেছেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

শোকো নাশয়তে ধৈর্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ॥ ২।৬২।১৫

অর্থাৎ শোক ধৈর্য নাশ করে, বিদ্যাবুদ্ধি নাশ করে, সব কিছু নাশ করে; শোকের মত আর রিপু নাই। কৌশল্যা রাজা দশরথকে বোঝাতে চেয়েছেন যে রামের সহিত বিচ্ছেদ হতে সঞ্জাত গভীর শোকের প্রভাবেই তিনি দশরথের মনে এমনভাবে আঘাত করে বসেছেন।

তার কিছুকাল পরে রামের বিচ্ছেদ শোকে রাজা দশরথ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করলেন। এদিকে রাম বনবাসী। কাজেই রাজপদ শূন্য। এই পরিস্থিতিতে মার্কণ্ডেয় ঋষি এসে উপদেশ দিলেন যে রাজপদ শূন্য রাখতে নেই, তাতে অরাজকতা আসে। তাই বশিষ্ঠ তখন ভরতকে তাঁর মাতুলালয় হতে চলে আসতে নির্দেশ দিলেন। মার্কণ্ডেয়ের মন্তব্যটি এই ঃ

নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ২।৬৭।৩১

অর্থাৎ রাজাবিহীন দেশে কারও সম্পত্তি নিরাপদ নয়; মৎস্যের মত মানুষ পরস্পরকে ভক্ষণ করে বসে। ইতিহাসে মৎস্যন্যায় কথাটির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রজ্ঞাবচন হতেই তার উৎপত্তি।

ভরত যখন বশিষ্ঠের নির্দেশে অযোধ্যায় এসে জানলেন দশরথ সিংহাসন শূন্য রেখে চলে গেছেন এবং অগ্রজ রাম কৈকেয়ীর নির্দেশে বনবাসী হয়েছেন তখন বশিষ্ঠ তাঁকে সিংহাসন অধিকার করতে অনুরোধ করলেন। ভরত সম্মত হলেন না; কারণ তাঁর ধারণা জ্যেষ্ঠপুত্রেরই সিংহাসনে অধিকার। তিনি রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। পথে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম হয়ে চিত্রকূট পর্বতে রামকে পেলেন। তিনি যখন পিতার মৃত্যু সংবাদ রামকে দিলেন, রাম তখন অবিচলিত রইলেন; বরং ভরতকেই প্রবোধ দিলেন যে মৃত্যুকে প্রত্যাহত করা যায় না, তাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গেই রামের মুখে এই প্রজ্ঞাবচনটি পাই—

সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুনিবর্ততে ॥ ২।৫০।২২

অর্থাৎ মৃত্যু মানুষের নিত্যসাথী, সঙ্গে চলে, সঙ্গে বসে, দীর্ঘপথ

অতিক্রম করে দূরে গেলেও মৃত্যু আবার সঙ্গ নেয়। মৃত্যু হতে কারও অব্যাহতি নাই, তা সারাজীবন মানুষের অনুসরণ করে।

একই প্রসঙ্গে রাম আর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। মৃত্যুর দূত হল জরা ; তা যৌবনকে পরাহত করে মানুষকে অপ্রতিরোধনীয় ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। শ্লোকটি এই ঃ

গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং কৃত্বা প্রভাবয়েৎ ॥ ২।৫০।২৩

অর্থাৎ জরা মানুষকে জীর্ণ করে দেয়, তার চর্মে বলিরেখা দেখা দেয়, মাথার চুলগুলি পেকে যায়। তাকে নিরোধ করবার উপায় নাই। শঙ্করাচার্য রচিত 'মোহমুদ্গরে' জরার একটি মনোরম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তার প্রেরণা কি এই শ্লোকটি ?

তারপর ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে শূন্য সিংহাসন অধিকার করতে অনুরোধ করলেন। রাম কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল, তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর কাল বনবাসে যাপন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা ভঙ্গ করতে পারেন না। তখন জাবালি মুনি এসে তাঁকে বোঝাতে চাইলেন ভরতের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাই করে থাকে। তিনি যুক্তি হিসাবে বলতে চাইলেন সংসারে কেহ কারও নয়। প্রাসঙ্গিক শ্লোকে কথাটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যং কস্য কেমচিৎ।
একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি ॥ ২।১০৮।৩

অর্থাৎ, কে কার বন্ধু ? কেউ কাউকে কিছু দেয় না। মানুষ একাকী সংসারে আসে, একাকী মরে। কথাটি আত্মকেন্দ্রিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সুন্দর পরিচয় দেয়।

এবার যে প্রজ্ঞাবচনটি উদ্ধৃত হবে তা যেমন জনপ্রিয় তেমন মূল্যবান ঃ

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ ৩।৩৭।২

অর্থাৎ, সর্বক্ষণ প্রিয়কথা বলে এমন মানুষ সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় হলেও যে কথা পথ্যস্বরূপ তার যেমন বক্তা তেমন শ্রোতা দুর্লভ। এটি সত্যই একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রজ্ঞাবচন। চাটুকার বহু পাওয়া যায় যারা প্রিয় কথা বলে মনোরঞ্জন করে ; কিন্তু যে অপ্রিয় উপদেশ মঙ্গল আনে এবং অমঙ্গলকে ব্যাহত করে, তা বলবার মত সৎসাহস-সম্পন্ন মানুষও পাওয়া যায় না ; অহমিকা-বোধহীন শোনবার মত ধৈর্যশীল মানুষও পাওয়া যায় না। কথাগুলি বলেছিলেন মারীচ রাবণকে। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করবার জন্য মারীচের সাহায্য চান তখন মারীচ তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সীতাকে হরণ করা দুই কারণে রাবণের উচিত নয়। প্রথম, রাম অতি সদাশয় মানুষ, তাঁকে অকারণে নিপীড়ন করা অনুচিত। দ্বিতীয়, রাম মহাবীর্যবান ; তাঁর সঙ্গে শত্রুতা আচরণ রাবণকে রীতিমত বিপদে ফেলতে পারে। কথাগুলি অপ্রিয় হলেও রাবণের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই মারীচ এই প্রজ্ঞাবচনটি প্রয়োগ করেছিলেন।

আর একটি জনপ্রিয় প্রজ্ঞাবচন উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। লঙ্কার যুদ্ধে রাবণ যখন শক্তিশেল দিয়ে আঘাত করে লক্ষ্মণকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূপাতিত করেন ; তখন রাম শোকে অভিভূত হয়ে এই কথাটি বলেছিলেন ঃ

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।

তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।। ৫।১০১।১৫

অর্থাৎ দেশে দেশে কলত্র মিলবে, বন্ধু মিলবে, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা মিলবে না।

(৭)

মনোরম পদসমষ্টি সৃজন

কোনও শক্তিধর সাহিত্যিক যদি মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করে তাঁর সাহিত্যকে পুষ্ট করেন তা হলে তিনি আনুষঙ্গিক ভাবে তার সাহিত্যিক ভাষারও উৎকর্ষ সাধন করেন। তা সংঘটিত হয় প্রধানত দুই ভাবে নানা প্রজ্ঞাবচন রচনা বা নানা মনোরম পদ সমষ্টি (phrase) রচনা করে। দ্বিতীয় অবস্থায় সেই প্রজ্ঞাবচন তখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে এবং সেই পদসমষ্টি তখন পরবর্তী কালের সাহিত্যিক আত্মসাৎ করে নিজের রচনায় প্রয়োগ করেন। ফলে ভাষার প্রকাশ শক্তি বর্দ্ধিত হয়। তবে এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে বিশেষ ভাবে প্রতিভাবান লেখক না হলে তাঁর পক্ষে এমন ভাবে, তিনি যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, তাকে পুষ্ট করা সম্ভব হয় না। তাই দেখা যায় যাঁরা বিশ্বের প্রথম সারির সাহিত্য স্রষ্টা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যেই এই কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে এইভাবে কালিদাস রচিত সাহিত্য সংস্কৃত ভাষাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কালিদাস কবে বলে গেছেন 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'। তা এখন প্রবাদ বচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তিনি লিখেছেন 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু' ; এখন কথাগুলি অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে তাকে ব্যবহার করবার অধিকার জাহির করে নিজের রচনায় তাকে প্রয়োগ করেছেন। 'মেঘদূত' কাব্যে 'পথিক-বধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ' কথাটি ব্যবহার করে অনুরূপ ভাবে সংস্কৃত তথা তার কন্যাস্থানীয় ভাষাগুলির শব্দভাণ্ডার বাড়িয়ে নিয়ে গেছেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে মহাকবি শেক্সপীয়ারের এ বিষয় কৃতিত্বের তুলনা হয় না। তিনি একা ইংরাজী ভাষাকে নূতন মনোরম পদসমষ্টি উপহার দিয়ে যতখানি সমৃদ্ধ করেছেন, ততখানি আর কোনও ইংরেজ লেখক করেন নি। কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। 'Mercy seasons justice' কথাটি এখন যেখানে সেখানে ব্যবহৃত হয়। এটি শেক্সপীয়ারের উপহার। আমরা মানবজীবনের নশ্বরতার কথা বলতে বলে থাকি 'Life's brief candle'। কথাটি শেক্সপীয়ার প্রথম ম্যাকবেথের মুখে তুলে দিয়েছিলেন। 'As you Like it' নাটকের একটি প্রজ্ঞাবচনের মধ্যে স্থাপিত দুটি শব্দগুচ্ছ 'books in running brooks' এবং 'Sermon's in stones' কত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। 'Brause new world' পদসমষ্টির বর্তমান কালে বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এমন কি আলুডুম হাক্সলি রচিত একটি উপন্যাসের এই নামে নামকরণ হয়েছে। সেটি শেক্সপীয়ার প্রথম তুলে দিয়েছিলেন মিরাণ্ডার মুখে।

বাংলা সাহিত্যে এ বিষয় কৃতিত্বে সবার অগ্রণী হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কীর্তির সঙ্গে তুলনা চলতে পারে একমাত্র শেক্সপীয়ারের। একজন শ্রেষ্ঠ কবি; অপরজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয় আমাদের এত পরিচিত যে তাঁর রচনা হতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে স্থাপন করবার কোনও প্রয়োজন হবে না। নানা সাহিত্যিকের সেগুলি বর্তমানে উপজীব্য হয়ে তাঁদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এমন কি দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও রবীন্দ্রনাথ প্রযুক্ত বহু মনোরম পদসমষ্টির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যেতে পারে।

কিন্তু মহাকবি বাল্মীকির কৃতিত্ব এই যে আদিকবি হয়েও তাঁর রচনায় এমন বহু পদসমষ্টি পাওয়া যাবে যা অনুরূপ ভাবে সংস্কৃতে

লেখ্য ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা রীতিমত বর্দ্ধিত করেছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে স্থাপিত হল। সেগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে সংস্কৃত হতে উদ্ভূত ভাষাগুলিকেও সমৃদ্ধ করেছে।

রামায়ণে রামকে বর্ণনা করা হয়েছে 'ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ' বলে (১।১।১৮)। এই পদগুচ্ছটি এখন বহুল প্রচারিত।

আমরা 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' পদসমষ্টির বহুল প্রয়োগ দেখতে অভ্যস্ত। এটি রামায়ণে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। দশরথের দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ীর সঙ্গে তাঁর বয়সের অনেক ব্যবধান ছিল। তাই আদিকবি তাঁদের সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন যার আরম্ভ হল 'স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্যাম্' (২।১০।২৬)। সুতরাং এটি আদিকবির উপহার।

আমরা এই সুভাষিতটি শুনতে আজকাল অভ্যস্ত: 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' কথাটি সুন্দর, মনকে প্রেরণা দেয়। তা কোথায় প্রথম ব্যবহার হয়েছিল তার সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্তৃপদের বিশেষণ রূপে যা ব্যবহৃত হয়েছে তা একবচনে থাকা উচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণ বলে বিশেষ্যের যা বচন বিশেষণ তা পায়। তবে এও বলা হয় যে 'চ' অব্যয়টি প্রযুক্ত হলে একবচন প্রয়োগ করা চলে। সে যাই হক, এই সুভাষিতটি যে বাল্মীকির অনুসরণে রচিত তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কৈকেয়ী যে দশরথের বিশেষ প্রিয় ছিলেন তা বর্ণনা করতে তিনি 'প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী' পদসমষ্টির ব্যবহার করেছেন।

রামায়ণ আদিকাব্যে সীতার রামের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ বোঝাতে আদিকবি বলেছেন, তিনি 'ছায়েব অনুগতা পতিম্' (২।১০।২৫)। তা হতে 'ছায়েব অনুগামিনী' পদসমষ্টি সাহিত্যিকদের একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে।

আমরা অনেকে 'প্রাতরাশ' শব্দটি আজকাল প্রায় ব্যবহার করে থাকি। মনে হবে তা ইংরাজি শব্দ breakfast এর বাংলা অনুবাদ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা নয়। বাল্মীকি শব্দটিকে প্রথম ব্যবহার করেছেন। অশোকবনে সীতা যখন বন্দিনী অবস্থায় ছিলেন, তখন রাবণ সেখানে গিয়ে তাঁকে এই বলে শাসিয়ে ছিলেন যে সীতা যদি দুমাসের মধ্যে রাবণকে বিবাহ করতে সম্মত না হন, তা হলে রাবণ তাঁকে প্রাতরাশে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবেন (৫।২২।২৯)।

সংস্কৃত সাহিত্যে বিরহিণী পতিব্রতা নারীকে 'একবেণীধরা' বলে বর্ণনা করবার একটা রীতি আছে। অর্থাৎ স্বামীর বিচ্ছেদ হতে উৎপন্ন শোক হেতু তিনি প্রসাধন কর্ম ত্যাগ করেছেন। তাই যত-দিন না স্বামী ফিরে আসেন চুল আর বাঁধবেন না। কথাটি বাল্মীকিই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। সীতাকে অশোকবনে দেখে ফিরে এসে হনুমান তাঁর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে রামকে এই বলেছিলেন :

রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
একবেণীধরা দীনা ত্বয়ি চিন্তাপরায়ণা॥ ৫।৩৫।১৪

অর্থাৎ, (সীতাকে দেখলাম) আপনার চিন্তায় নিমগ্না একবেণী-ধরা অবস্থায় রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হয়ে রাক্ষসীদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে আছেন।

বিখ্যাত আলংকারিক দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' নামে গ্রন্থে উপমার দৃষ্টান্ত হিসাবে এক অপরিচিত কবি প্রযুক্ত এই রচনাটি স্থাপন করেছেন :

অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা।

'দৃষ্টি বিফলতাপ্রাপ্ত হল' এই পদসমষ্টি আদিকবি বাল্মীকি প্রথম ব্যবহার করেন। লক্ষ্মণ রাবণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে রাম বিলাপ করতে করতে এই পদসমষ্টির

ব্যবহার করেছিলেন ঃ

লজ্জতীব মে বীর্যং ভ্রশ্যতীব করাদ্ ধনুঃ।
সায়কা ব্যবসীদন্তি দৃষ্টির্বাষ্প-বশং গতা॥ ৬।১০১।৬

অর্থাৎ (আমার চোখের সামনে লক্ষ্মণকে পড়ে যেতে দেখে) আমার বীর্য লজ্জা পাচ্ছে, হাত হতে ধনু যেন স্খলিত হচ্ছে, সায়ক-গুলি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং চোখের জলে দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে। সম্ভবত দণ্ডী কর্তৃক উদ্ধৃত রচনাটি এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত।

(৮)

কালিদাসের সাহিত্যের উপর প্রভাব

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে এক স্থানে মন্তব্য করা হয়েছে যে আদিকবি বাল্মীকির আদিকাব্য রামায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যে রচিত প্রথম কাব্য হয়েও সাহিত্যিক গুণে এমন সমৃদ্ধ যে তার সহিত পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে একমাত্র মহাকবি কালিদাস ব্যতীত আর কেহ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে আরও বলা যায় যে আদিকাব্যের সাহিত্যিক উৎকর্ষ কালিদাসের সাহিত্যকে রীতিমত প্রভাবিত করেছিল। আমাদের এই দাবী আদিকবির প্রতি যুক্তিহীন ভক্তি হেতু নয়। তার প্রমাণ স্বরূপ বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। তা প্রমাণ করে বাল্মীকির রচনার উৎকর্ষ এত বেশী যে কালিদাসের মত কবিও তাঁকে ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এবার উপরে স্থাপিত প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু প্রমাণ স্থাপিত হবে।

কালিদাদের রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসাবে অনায়াসে 'ঋতু সংহারকে' চিহ্নিত করা যায়। তা যে অপরিণত বয়সের রচনা তা সহজেই বোঝা যায়। এখানে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা ও তাদের

তরুণী প্রিয়ার উপর কিভাবে প্রতিক্রিয়া হয় তা বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের অপরিণত রচনায় ভাবী সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তার ব্যাপক প্রকাশ নাই।

আমরা রামায়ণে বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত এই তিনটি ঋতুর বর্ণনা পাই। সে বিষয় ইতিমধ্যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেই বর্ণনা কাব্যগুণে আমাদের যেমন মুগ্ধ করেছে তেমন তরুণ বয়সে মহাকবি কালিদাসকেও মুগ্ধ করে থাকবে। সে ক্ষেত্রে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে রামায়ণের এই দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর মনে সবগুলি ঋতুকে অবলম্বন করে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনার ইচ্ছা সম্ভবত জেগেছিল।

এই প্রসঙ্গে বর্ষাঋতুর বর্ণনায় নিবেদিত ঋতুসংহারের এই শ্লোকটি দেখা যেতে পারে ঃ

সসীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর স্তড়িৎপতাকোঽ
শণিশব্দ মর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতি র্ঘনাগমঃ
কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে। ২।১

অর্থাৎ, প্রিয়ে, প্রণয়ীদের প্রিয় বর্ষা ঋতু তার জলকণাবাহী মত্ত হাতীর সহিত তুলনীয় মেঘ নিয়ে, তড়িৎকে পতাকা করে এবং বজ্র নিনাদ ঘোষিত করে রাজার মত উদ্ধতদ্যুতি নিয়ে সমাগত হয়েছে।

এই কবিতাটির সঙ্গে রামায়ণের এই শ্লোকটির প্রচুর সাদৃশ্য মিলবে ঃ

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসংন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণ নাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥ ৪।২৮।২০

অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত গজের মত গিরিশিখরের মত আকার

ধারণ করে, বলাকার মালা পরে, বিদ্যুতের পতাকা বহন করে মেঘ উচ্চনাদে গর্জন করছে। সাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট যে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শ্লোকটি ভিন্ন প্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

এবার শরৎঋতুর বর্ণনায় আসা যাক। ঋতুসংহারের এই শ্লোকটি দেখা যেতে পারে :

তারাগণপ্রবরভূষণ মুদ্বহন্তী
মেঘাবরোধপরিমুক্ত শশাঙ্কবক্ত্রা।
জ্যোৎস্নাদুকুলমমলং রজনী দধানা
বৃদ্ধিং প্রযাত্যনুদিনং প্রমদেব বালা॥ ৩।৭

অর্থাৎ, তারারূপ উৎকৃষ্ট ভূষণ ধারণ করে, চন্দ্ররূপ বদনখানি মেঘের আবরণ হতে মুক্ত করে, জ্যোৎস্নারূপ অমল বসন পরিধান করে রাত্রি (সুন্দরী) নারীর মত শোভা পাচ্ছে।

এই শ্লোকটি রামায়ণের একটি অনুরূপ শ্লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় :

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিত সৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি
নারীব শুভ্রাংশুকসংবৃতাঙ্গী॥ ৪।৩০।৪৬

অর্থাৎ রাত্রি যেন শ্বেতবস্ত্রে সজ্জিত একটি নারী। উদিত শশাঙ্ক তার মনোরম মুখ, তারাগুলি তার চারুনেত্র এবং জ্যোৎস্নার আলো তার বসন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এটিও অন্য প্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানেও নানা সাদৃশ্য চোখে পড়বে। এমনকি ভাষাও একাধিক ক্ষেত্রে এক।

এবার হেমন্ত বর্ণনায় আসা যাক। ঋতুসংহারে এই শ্লোকটি পাই :

প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি
মৃগাঙ্গনাযূথ বিভূষণানি।

মনোহর ক্রৌঞ্চৈর্নিনাদিতানি
সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ॥ ৪।৮

অর্থাৎ গ্রামের সীমান্তগুলি প্রচুর শালিধানে ভরে গেছে, মৃগযূথ দিয়ে সেগুলি ভূষিত, শ্রুতিমধুর ক্রৌঞ্চের নিনাদে মুখরিত হয়ে মনকে উৎসুক করে।

তার সঙ্গে রামায়ণের এই শ্লোকটি তুলনা করা যেতে পারেঃ

বাষ্পাছন্নান্যারণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ॥ ৩।১৬।২৬

অর্থাৎ সূর্যের উদয় হলে অরণ্যগুলি যব ও গোধূমে সমৃদ্ধ হয়ে এবং ক্রৌঞ্চ ও সারসে ভূষিত হয়ে শোভা পাচ্ছে। এখানে সাদৃশ্য তত প্রকট না হলেও উভয় শ্লোকেই পাকাফসল এবং ক্রৌঞ্চের উল্লেখ আছে।

মহাকবি কালিদাসের অন্যতম বিরাট কীর্তি হল রঘুবংশ মহাকাব্য। উনিশটি সর্গে সমাপ্ত এই বিরাট কাব্যখানিতে রঘু যে বংশ অলঙ্কৃত করেছিলেন তার কাহিনী বর্ণিত আছে। বংশের স্থাপক দিলীপ বশিষ্ঠের আশ্রমে বাস করে কৃচ্ছ্রসাধন করে তাঁর আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে এই বংশকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর একে একে তাঁর উত্তরপুরুষগণ নিজেদের কীর্তি দিয়ে সেই বংশের গৌরববর্দ্ধন করেন। তাঁর বংশধর রামের রাজত্বকালে সে বংশ খ্যাতির মধ্যগগনে আরোহণ করে এবং পরে ধীরে ধীরে তা অবনতির পথে এগিয়ে গিয়ে অগ্নিবর্ণের ভোগসর্বস্ব বিলাসের কালিমায় লিপ্ত হয়ে সেই খ্যাতি অস্তমিত হয়। এই বিরাট পরিকল্পনা এবং মহৎ বিষয় মহাকাব্যটির উপজীব্য।

মনে হয় এই দুঃসাধ্য কাজের মহাকবি দায়িত্ব গ্রহণের সাহস সংগ্রহ করেছিলেন বাল্মীকি রচিত রামায়ণ হতে। তাতে দশরথ ও তাঁর পুত্র রামের যে কীর্তিকাহিনী বর্ণিত আছে তা দেখায় বিষয়টি

সাহিত্যে আলোচিত হবার কতখানি উপযুক্ত। তার মধ্যে রঘুর সন্তানদের গুণের কাহিনী তাঁর শ্রুতিগোচর হওয়ার ফলেই তিনি এই দুরূহ কর্তব্য বাক্যের বিভবে দরিদ্র হয়েও সম্পাদনের দায়িত্ব নেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে রামের কাহিনী সঙ্গত কারণেই এই মহাকাব্যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। উনিশটি সর্গের মধ্যে দশম হতে পঞ্চদশ সর্গ রামের কাহিনী কীর্ত্তনে নিবেদিত। এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে বাল্মীকির দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আমরা আরও লক্ষ্য করব যে রঘুবংশের অন্তর্ভুক্ত যে রচনাগুলি সমধিক জনপ্রিয় হয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে অনুরূপ দৃশ্যগুলি বাল্মীকি রচিত রামায়ণেও পাওয়া যায়। সুতরাং প্রেরণা সেখান হতে সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে। যেমন রঘুবংশের অষ্টম সর্গে বর্ণিত অজের বিলাপ। ইন্দুমতীর আকস্মিক মৃত্যু রাজা অজকে এমন অভিভূত করল যে তিনি করুণ ভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। বাল্মীকির রামায়ণে একটি তুলনীয় রচনা আছে। আকস্মিক ভাবে রামের অনুপস্থিতিতে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হলে, রামও সীতার শোকে অভিভূত হয়ে বিলাপ করেছিলেন। তার বিস্তারিত বিবরণ মিলবে রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একষষ্ঠিতম সর্গে।

রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে রামের আকাশমার্গে পুষ্পকরথে আরোহণ করে লঙ্কা হতে অযোধ্যায় আসবার বর্ণনা আছে। তার বৈশিষ্ট্য হল সেখানে পথে যেতে যেতে রাম সীতাকে নানা স্থান দেখিয়ে তাঁর মনোরঞ্জন করেছেন। রামায়ণের একেবারে যুদ্ধকাণ্ডের শেষে একশত তেইশতম সর্গে ঠিক একই ধরণের বর্ণনা আছে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে এই সুন্দর পরিকল্পনাটি কালিদাস বাল্মীকির দৃষ্টান্ত হতে গ্রহণ করেছিলেন।

'বিক্রমোর্বশীয়ম্' কালিদাসের অপরিণত বয়সে রচিত একটি

নাটিকা; কিন্তু কাব্যগুণে তা বিশেষ সমৃদ্ধ। বিশেষ করে তার চতুর্থ অঙ্কে। তার পরিবেশটি এই। রাজা পুরুরবা হিমালয়ে অবস্থিত সূর্যমন্দিরে পূজা দিয়ে ফেরার পথে দৈত্যদ্বারা অপহৃতা স্বর্গের অপ্সরী উর্বশীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রেমে পড়ে যান। ইন্দ্রের সহৃদয়তায় তিনি উর্বশীকে পত্নী-রূপে পেলেন। দুজনে পর্বতভ্রমণে গেলেন। সেখানে পুরুরবার উপর অভিমান করে উর্বশী চলে যেতে যেতে অজ্ঞাতে কার্তিকের 'কুমার বনে' প্রবেশ করলেন এবং জাদুবলে একটি লতায় পরিণত হলেন। এদিকে উর্বশীর সহিত বিচ্ছেদে পুরুরবা উন্মাদের মত তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এই দৃশ্যটি সেখানে মনোরম ভাষায় দেখান হয়েছে। বনে ঘুরতে ঘুরতে যাকে দেখেন তাকেই জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আমার হারানো প্রিয়াকে দেখেছ? কোকিল, হাঁস, হাতী, নদী কেউই বাদ পড়ে না।

রাবণ সীতাকে অপহরণ করবার পর রাম সীতার অন্বেষণে বনে ঘুরেছিলেন। তার একটি দীর্ঘ বর্ণনা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একাধিক সর্গ জুড়ে স্থাপিত হয়েছে। (২) সেখানে রাম অধীর হয়ে গোদাবরী নদীকে জিজ্ঞাসা করেছেন; কিন্তু নদী নিরুত্তর। তিনি প্রস্রবণ গিরিকে প্রশ্ন করেছেন; উত্তর না পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হচ্ছেন। হরিণদের প্রশ্ন করছেন; তারা পালিয়ে যাচ্ছে। এই সব বর্ণনা আছে। এ ক্ষেত্রে এমন অনুমান করা যায় যে রামের এই উন্মাদবৎ আচরণ 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে পুরুরবার অনুরূপ আচরণের প্রেরণার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকবে। উভয় ক্ষেত্রে একই পরিকল্পনা কাজ করেছে; কেবল কালিদাস রচিত নাটকে তা আরও মার্জিত রূপ ধারণ করেছে।

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' খণ্ডকাব্য অপরূপ গ্রন্থ।

২। অরণ্যকাণ্ড, ষষ্ঠিতম হতে ত্রিষষ্ঠিতম সর্গ

সম্ভবত তা কবির পরিণত বয়সের রচনা। এখানে কবির ছন্দের উপর অধিকার, ভাষার মাধুর্য এবং প্রকৃতি, স্বর্গ এবং বিরহীর মনের করুণ রূপ পরিস্ফুট করবার শক্তির চূড়ান্ত পরিচয় মেলে। দেখলে অবাক হতে হয় যে মহাকবি কালিদাসের এই গ্রন্থ রচনায় আদি-কবি বাল্মীকির নিকট ঋণ যেন সর্বাধিক। প্রথমে কবিতার পরি-বেশের কথাই ধরা যাক। বিরহীর বার্তা নিয়ে মেঘ সুদূরে তাঁর আবাসগৃহে যাত্রা করবে, এই কল্পনাটি একান্তই অভিনব। মহাকবি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন তিনি সেটি পেয়েছিলেন রামায়ণের কাহিনী হতে। এই প্রসঙ্গে উত্তরমেঘে স্থাপিত এই শ্লোকটি দেখা যেতে পারে ঃ

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিত হৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব্য।

উত্তর মেঘ। ৩৭

শ্লোকটির অংশমাত্র উদ্ধৃত হল। প্রসঙ্গটি এই। যক্ষ মেঘকে উপদেশ দিচ্ছেন অলকায় গিয়ে তাঁর বিরহিণী প্রিয়াকে সম্বোধন করে নিজের পরিচয় দিয়ে যেন বলেন, 'আমি আপনার স্বামীর বন্ধু'। সেই কথা শোনার পর যক্ষপত্নীর কি অবস্থা হবে তা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে 'তুমি এই কথা বললে মৈথিলী যেমন পবনতনয়কে উন্মুখী হয়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন তেমন ভাবে যক্ষপত্নী উৎকণ্ঠায় উচ্ছ্বসিত হৃদয় হয়ে তাঁকে দেখবেন এবং গ্রহণ করবেন। কালি-দাস এই খণ্ডকাব্যে মেঘের যে ভূমিকা কল্পনা করেছেন, আদিকবি হনুমানের জন্য অনুরূপ ভূমিকা যে রচনা করে নিয়েছেন, তা এই-ভাবে এখানে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং 'মেঘদূত' খণ্ডকাব্যে মেঘকে দূত করে পাঠানর পরিকল্পনাটির প্রেরণা আদিকাব্য রামায়ণে হনুমানের দূতের ভূমিকার বর্ণনা হতে এসে থাকবে বলা যেতে পারে।

অতিরিক্ত ভাবে দেখা যাবে পথে যেতে যেতে মেঘ যে সব বিচিত্র দৃশ্য দেখবেন তার সহিত তুলনীয় কিছু বিবরণও রামায়ণে পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ এখানে স্থাপিত হল।

'মেঘদূতে' দেখা যাবে মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রশংসায় মুখর হয়েছেন। তার সৌন্দর্যে তিনি এতখানি মুগ্ধ যে তিনি দাবী করেছেন যে পুণ্যবান মানুষরা স্বর্গবাস করে কিছু পুণ্যফল মূল্য-স্বরূপ দিয়ে স্বর্গের একটি অংশকে যেন এনে উজ্জয়িনী গড়ে তুলেছেন। প্রাসঙ্গিক কাব্যাংশটি এই :

স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥
পূর্বমেঘ।৩০

একটি অনুরূপ বর্ণনা রামায়ণেও পাওয়া যায়। রাবণের রাজধানী লঙ্কাপুরী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তা যেন স্বর্গকে মহীতলে স্থাপিত করবার মত। 'মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণম্' (৫।৭।৬)। দুটির চিন্তার মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়।

পথে যেতে যেতে মেঘ নানা মনোরম দৃশ্য দেখবে এবং নানা ভূমিকা নেবে। সমগ্র পূর্বমেঘ জুড়ে তার মনোরম বর্ণনা মিলবে। সেই বর্ণনাগুলিতেও রামায়ণের কিছু কিছু রচনার সহিত বিশেষ রকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুটি দৃষ্টান্ত নীচে স্থাপিত হল।

'মেঘদূতে' এই রচনাটি পাই :

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্ গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়দাশ্বসত্যঃ॥
পূর্বমেঘ।৮

অর্থাৎ, তোমাকে আকাশে যেতে দেখে প্রবাসী মানুষের পত্নীগণ কপাল হতে কেশরাশি সরিয়ে দিয়ে বিশেষ প্রত্যয় নিয়ে নিরীক্ষণ করবে। তার একটা কারণ আছে। সেকালে দূরদেশে মানুষ

বর্ষা ঋতু অতিক্রান্ত হলে যেত ; কারণ তখন পথ চলা দুঃষ্কর ছিল না। আর বর্ষার আগমন ঘোষণা করে আকাশে প্রথম মেঘের উদয় হলে প্রবাসীরা ঘরে ফিরত। কাজেই প্রোষিতভর্তৃকা নারীর কাছে প্রথম মেঘের উদয় বিশেষ শুভাশংখী তাৎপর্য বহন করে। তাই তারা উদগ্রীব হয়ে মেঘের দিকে চেয়ে দেখে।

রামায়ণে বর্ষার যে বর্ণনা পাই তাতেও একটি অনুরূপ মন্তব্য আছেঃ প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্ (৪।২৮।১৫)। অর্থাৎ প্রবাসী মানুষ বর্ষায় মেঘের ঘনঘটা দেখলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। অবশ্য কালিদাস একই ভাবনাকে আরও মনোরম করে স্থাপন করেছেন। তবু বলা যায় এই চিত্রটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আদিকবি কালিদাস।

এবার মেঘদূতের এই কাব্যাংশটি দেখা যেতে পারেঃ

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র।
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপযুজ্য॥
পূর্বমেঘ।১৩

অর্থাৎ, মেঘ যেমন শিখরে শিখরে পা রেখে খিন্ন হলে বিশ্রাম করে করে উড়ে যাবে, তেমন স্রোতস্বিনীদের বারিধারা দিয়ে পুষ্ট করে ক্ষীণ হয়ে লঘু হবে।

রামায়ণেও বর্ষার বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি তুলনীয় রচনা পাওয়া যায়ঃ

বিসৃজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশ্রান্তা নৃপাত্মজ॥ ৪।৩০।২৩

অর্থাৎ, সলিল বর্ষণ করতে করতে মেঘেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখানে সাদৃশ্য যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে।

সপ্তম অধ্যায়

রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র

(১)

প্রাথমিক কথা

আদিকবি বাল্মীকি আরও একটি বিষয়ে তাঁর শক্তি দেখিয়েছেন। চরিত্র চিত্রণেও তিনি অসাধারণ পটুত্ব দেখিয়েছেন। যে রচনায় কাহিনীই মুখ্য উপজীব্য তাতে ঘটনাই প্রাধান্য পায়। কাহিনীর মূল চরিত্রগুলিকে ভাল করে ফুটিয়ে তোলার প্রতি সাধারণ ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কিন্তু আদিকাব্য রামায়ণে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মনে হয় মূল চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। বিশেষ পরিবেশে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন বেশ সবিস্তারে স্থাপিত হয়েছে। ফলে পরস্পরের কথার মধ্যে চরিত্রগুলির চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। দক্ষ নাট্যকারের মত তিনি আচরণ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে মূলচরিত্র-গুলির রূপ দিয়েছেন। তাই চরিত্রগুলি যেন চোখের সামনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হয়ে ভাসতে থাকে। সংলাপ এত সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত যে বিশেষ বিশেষ দৃশ্য তার সাহায্যে সুন্দর ভাবে অভিনয় করা যায়।

তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে কতকগুলি মহৎ চরিত্র স্থায়ীভাবে সাহিত্যের আশ্রয়ে সংরক্ষিত হয়েছে। চরিত্রগুলির পরিস্ফুটনে দুটি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমত আচরণে বিশেষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়ত পরস্পরের আলাপে মনের

চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে যেখানে একটি চরিত্রের বিপরীত চরিত্রের সহিত আলাপ স্থাপিত হয়েছে সেখানে তাদের পরস্পরের বিতর্কের মধ্যে তাদের চরিত্রের বিভিন্নতা এবং আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। জাবালি মুনির সঙ্গে রামের বিতর্ক এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। জাবালি মুনির সুবিধাবাদী স্বার্থপরের দৃষ্টিভঙ্গি। অপরপক্ষে রাম একটি উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত; সেই আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে তিনি চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। সীতাকে অপহরণের পূর্বে রাবণের সঙ্গে সীতার বিতর্কও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাবণের দম্ভ এবং রামের প্রতি অবজ্ঞার সীতা যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, তা যেমন দৃপ্ত তেমন সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ।

ফলে রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণে যুগপৎ দুটি কাজ সাধিত হয়। প্রথমত, চরিত্রগুলি সজীব হয়ে ফুটে ওঠায় রামায়ণ চিত্তবিনোদনের একটি নির্মল অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত মহৎ চরিত্র পরোক্ষভাবে পাঠক এবং শ্রোতাদের মনে উচ্চভাবের প্রেরণার উৎসের ভূমিকা গ্রহণ করে। তার এই উন্নয়নকারী শক্তি যে মৌলিক নীতিগুলি সমাজের স্বাস্থ্যকে সংরক্ষিত করে তাদের সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীকে সচেতন করে এসেছে। রামের সত্যনিষ্ঠা, ভরতের আত্মত্যাগ, লক্ষ্মণের অগ্রজের প্রতি আনুগত্য এবং সীতার সর্বাত্মক পতিপ্রেম আবহমানকাল আবালবৃদ্ধ ভারতবাসীর, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে শুধু নির্মল আনন্দ দেয়নি, নীতিশিক্ষাও দিয়েছে।

বর্তমান অধ্যায়ে রামায়ণের মূল চরিত্রগুলির সবিস্তার আলোচনার প্রস্তাব করি। রামায়ণে বহু চরিত্র আছে। বিশেষ চরিত্রের উৎকর্ষ ফুটিয়ে তুলতে বিরোধী চরিত্রও স্থাপিত হয়েছে। সবগুলির

আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যে মহৎ চরিত্রগুলি আবহমানকাল ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে তাদের মধ্যে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবার প্রস্তাব করি। তাদেরই মূল চরিত্র বলে গ্রহণ করা যায়। অন্যগুলি প্রধানত পরিপোষক চরিত্র বা মূল চরিত্রের প্রচ্ছদপটের ভূমিকা নিয়েছে। যেমন কৈকেয়ী ও রাবণ রাম ও সীতার চরিত্রের প্রচ্ছদপট। তাঁদের প্রতিকূল আচরণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এঁদের চরিত্রের মহত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই নীতির প্রয়োগের ফলে রামায়ণে চারটি মূল চরিত্র আমরা পাই। তাঁরা হলেন রামায়ণের নায়ক রাম, তাঁর পত্নী সীতা এবং তাঁর দুই ভ্রাতা ভরত ও লক্ষ্মণ।

আরও দুটি চরিত্র আছে যাঁদের উপেক্ষা করা শক্ত হয়ে পড়ে। তাঁরা হলেন বিভীষণ এবং হনুমান। বিভীষণ একটি বিতর্কমূলক চরিত্র। তাঁর স্বপক্ষত্যাগ তাঁর প্রতি অনেকের ঘৃণা উদ্রেক করে। প্রশ্ন হল বিভীষণ কি সুবিধাবাদীর মনোবৃত্তি প্রণোদিত হয়ে রামের আশ্রয় নিয়েছিলেন? না, একটি উচ্চ আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বজাতিকে ত্যাগ করলেন? উভয় মতের সপক্ষেই বহু কথা বলা যায়। আদিকবি তাঁর চরিত্র এমন ভাবে গড়েছেন যে এ বিষয় চূড়ান্ত মীমাংসা করা শক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বিভীষণের চরিত্রও আলোচিত হবে।

মূল চরিত্রগুলির সমস্থানীয় না হলেও হনুমান ও একটি আদর্শ চরিত্র। তাঁর মধ্যে যে গুণটি সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তা হল তাঁর আনুগত্য। প্রথমে তিনি সুগ্রীবের অনুগত বন্ধু ছিলেন; পরবর্তী জীবনে তিনি রামের অনুগত ভক্তে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর বীর্য এবং তাঁর ভক্তি চিরকাল ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে। কাজেই তাঁর চরিত্রের আলোচনাও আমরা বর্জন করতে পারি না।

(২)

রামের চরিত্র

রামায়ণের আরম্ভ হয়েছে দেবর্ষি নারদের মুখে রামের উদ্দেশ্যে রচিত একটি প্রশস্তি বচন দিয়ে। বর্তমান আলোচনাও তাই দিয়ে স্থরু হতে পারে। নারদ বলেছেন ঃ

স চ সর্বগুনোপেতঃ কৌসল্যানন্দ বৰ্দ্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব॥
বিষ্ণুণা সদৃশো বীর্যে সোমবৎপ্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নি সদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবী সমঃ॥

(১।১।১৭-১৮)

অর্থাৎ তিনি সকল গুণে ভূষিত ঃ গাম্ভীর্যে তিনি সমুদ্রের সহিত তুলনীয়, ধৈর্যে হিমালয়ের সহিত, বীর্যে বিষ্ণুর সহিত, রূপে চন্দ্রের সহিত, ক্রোধে কালাগ্নির সহিত এবং ক্ষমায় পৃথিবীর সহিত। বোঝাই যায় এই প্রশস্তি জনশ্রুতিকে ভিত্তি করে রচিত।

তাঁর আর একটি প্রশস্তি কোসলবাসী মানুষের মুখে শোনা যায়। সেটি স্থাপিত হয়েছে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমে। দশরথ জরাগ্রস্ত হয়ে রাজ্যভার হতে নিজেকে মুক্ত কররার জন্য একদিন পরিষদে ঘোষণা করলেন যে তিনি রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে রাজ্যের শাসনভার তাঁর উপর ন্যস্ত করতে চান। তখন সভাসদ্‌গন তাঁর সেই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করে তাঁর গুণাবলীর একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন। সেটি এই ঃ

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবাননসূয়কঃ।
ক্ষান্তঃ সান্ত্বয়িতা শ্লক্ষ্ণঃ কৃতাজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়॥
মৃদুশ্চ স্থিরচিত্তশ্চ সদা ভব্যোঽনসূয়কঃ।
প্রিয়বাদী চ ভূতানাং সত্যবাদী চ রামঃ॥

২।২।৩১-৩২

অর্থাৎ, রাম ছিলেন ধর্মজ্ঞ, সত্যে নিষ্ঠাপরায়ণ, ভদ্র, অসূয়াহীন, ক্ষমাবান, দুঃখে সান্ত্বনা দিতে উৎসাহী, কৃতজ্ঞতাবোধে সমৃদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়, মৃদুভাষী, প্রিয়বাদী ও সত্যবাদী।

দুটি তালিকার গুণাবলী একত্র করলে একটি আদর্শ মানুষকে পাওয়া যায়। মোটামুটি যে গুণগুলি তাঁর চরিত্রে বিশেষ লক্ষিত হয়েছিল, তারা হল ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য, দ্বেষবিহীনতা, চিত্তের স্থিরতা, বীর্য, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা এবং সর্বোপরি সত্যের উপর অচল নিষ্ঠা। কিন্তু কতকগুলি বিমূর্ত গুণের প্রয়োগ করে রামের চরিত্রের সজীব রূপখানি পাওয়া যায় না। তা প্রকাশ করা যায় তাঁর আচরণ এবং আলাপের সাহায্যে। সেই রীতিই এখানে অবলম্বন করা হবে।

কোনও মানুষের প্রকৃত পরিচয় মেলে একটি প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলে। তখন তিনি সেই প্রতিকূলতার যে ভাবে মোকাবিলা করেন, তার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে পড়ে তাঁর প্রকৃত পরিচয়। রাম জীবনের আরম্ভেই এমন একটি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার ফলেই তাঁর চরিত্রের মহত্তম গুণটি আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেল। সেই গুণটি হল সত্য পালনের প্রতি নিষ্ঠা। তার জন্যই তিনি আবহমান কাল ভারতের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছেন। সেই কারণেই তিনি আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর এতখানি প্রিয় ছিলেন। রামধুন সঙ্গীত তাঁর প্রাত্যহিক প্রার্থনার অঙ্গ ছিল।

যে সংঘাত রামের এই মহৎগুণটিকে উদঘাটিত করল তার পরিবেশ ছিল এই। রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। জরাভারে পীড়িত হয়ে তিনি রাজ্যশাসনের দায়িত্ব হতে মুক্তি চাইলেন। তাই তিনি পরিষদবর্গের নিকট প্রস্তাব করলেন যে জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে তিনি রামের হাতে রাজ্যভার তুলে দেবেন।

তাঁরা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করলে রাজা ঘোষনা করলেন যে রামকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করবেন।

কিন্তু আকস্মিক ভাবে বাধা এল প্রিয়তমা পত্নী কৈকেয়ীর কাছ হতে। পূর্বে রাজা তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দুটি ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৈকেয়ী বলেছিলেন সে প্রসঙ্গে পরে তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। তাঁর সেবিকা মন্থরার প্ররোচনায় তিনি সপত্নী পুত্রের এই সৌভাগ্যের সম্ভাবনা সহ্য করতে পারলেন না; তিনি চাইলেন এই ব্যবস্থা পণ্ড করে দিতে। তাই পূর্বে প্রদত্ত দুটি প্রতি-শ্রুতির ভিত্তিতে দাবী বসলেন যে রাম চতুর্দশ বৎসর কাল বনে নির্বাসিত হবেন এবং রামের স্থলে তাঁর আত্মজ ভরত যুবরাজের পদে অধিষ্ঠিত হবেন। রাজা প্রাণের অধিক প্রিয়া ভার্যার এই প্রতিকূল আচরণে ভেঙে পড়লেন। রামকে কৈকেয়ীর ইচ্ছামত নির্দেশ দেবার মত মনের বল তাঁর রইল না। তখন কৈকেয়ী রামকে নিজে ডেকে আনলেন এবং পিতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তাঁকে পিতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করতে অনুরোধ করলেন।

রাম তাতে কোনও আপত্তিকর মন্তব্য করলেন না। তিনি যে উচ্চ নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন তা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্তব্য কি হবে তা নির্দ্ধারণ করে দিল। তিনি সোজাসুজি বিনা দ্বিধায় কৈকেয়ীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তিনি বললের, তাই হবে আমি জটাচির ধারণ করে পিতার প্রতিজ্ঞা পালন করতে বনে বাস করতে যাব। (২।১১।২) তাঁর যুক্তি হল অতি সরল। তিনি বললেন পিতা দেবতা স্বরূপ; দেবতার নির্দেশ হিসাবে পিতার ইচ্ছা আমি পালন করব। (২।৬৪।৫১)।

সুতরাং রাম বনে গেলেন। পতিগতপ্রাণা সীতা ছায়ার মত তাঁর অনুগমন করলেন। নিত্যসঙ্গী প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ

তাঁদের সঙ্গে গেলেন। ভরদ্বাজ মুনির উপদেশ অনুসারে তাঁরা দণ্ডকারণ্যের উত্তর প্রান্তে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

কিন্তু অনুজ ভরত ও মহত্বে কম যান না। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি মাতুলালয় হতে অযোধ্যায় ফিরে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত হলেন। নিজের মাতা কৈকেয়ী যে নিজের পুত্রের প্রতি অত্যধিক বাৎসল্য হেতু পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রামকে বনবাসে পাঠিয়েছেন এবং তার আনুসঙ্গিক ফল হিসাবে পুত্রের সহিত বিচ্ছেদের শোকে যে বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু ঘটেছে, এই সমস্ত বিষয় অবগত হলেন। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং কঠোর ভাষায় মাতাকে ভৎর্সনা করলেন। তিনি বললেন যে হেতু রাম জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁর সিংহাসনে অধিকার নাই। তিনি রামের অনুসন্ধানে যাবেন এবং তাঁকে বনবাস জীবন ত্যাগ করে ফিরে এসে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বলবেন।

সুতরাং ভরত যখন সদলে নানা অনুসন্ধানের পর চিত্রকুট পর্বতে গিয়ে রামের সহিত সাক্ষাৎ করে তাঁকে এই অনুরোধ করলেন, রাম একটা দুর্দমনীয় লোভের সম্মুখীন হলেন। পিতার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যাঁকে সিংহাসন দেওয়া হয়েছিল তিনি স্বেচ্ছায় সে অধিকার প্রত্যাখ্যান করে রামকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত অধিকারে স্থাপন করতে চেয়েছেন। এই ভাবে এক প্রচণ্ড প্রলোভনের মধ্য দিয়ে রামের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। ভরতের প্রস্তাবে যদি তিনি সম্মতি দিতেন কোনও প্রতিকূল সমালোচনার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু রামের সূক্ষ্ম পর্যায়ের বিবেকবোধ তাঁকে বাধা দিল। তিনি বিনা দ্বিধায় ভরতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পিতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; ভরতের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা ভঙ্গ করতে হয়; তাঁর সত্যভ্রষ্ট হতে হয়।

তখন জাবালি মুনি এসে তাঁকে বোঝাতে চাইলেন ভরতের

প্রস্তাব গ্রহণ করাই বিবেচনার কাজ হবে। তিনি যে যুক্তি দেখালেন তা সাধারণ স্বার্থপর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রলোভনকে গ্রহণযোগ্য করে স্থাপন করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি উপদেশ দিলেন সংসারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মত রামের নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া উচিত। তিনি বললেন, সংসারে মানুষ একা আসে একা যায় (২।১০৮।৩); যা প্রত্যক্ষ তাই নাও, আর যা পরোক্ষ তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর। (২।১০৮।৭)

এই হীন দৃষ্টিভঙ্গি রামকে অত্যন্ত রুষ্ট করেছিল। তিনি প্রত্যুত্তরে জাবালি মুনিকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন। তারপর তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা বুঝিয়ে দেয় তিনি ভিন্ন আদর্শের মানুষ। তিনি বলেছিলেন, লক্ষ্মী চন্দ্র হতে স্খলিত হতে পারে, হিমালয় তার তুষারের আবরণ বর্জন করতে পারে, সাগর বেলাভূমি হতে সরে যেতে পারে; কিন্তু আমার পিতার কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আমি পরিত্যাগ করব না। (২।১১২।১৮)

এই প্রসঙ্গেই রাম তাঁর নিজস্ব জীবন দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছিল। তাই ছিল তাঁর জীবনের নির্দেশক নীতি। তিনি বলেছিলেন সত্য হতে কখনও ভ্রষ্ট হতে নেই; কারণ, সমাজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী; সুতরাং তার একটি সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শ্লোকটি এই:

সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিত।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্॥ (১)

অর্থাৎ, বিশ্বে সত্যই সব নিয়ন্ত্রণ করে; ধর্ম সর্বকালে সত্যে আশ্রিত; সব কিছুর মূলে সত্য; সত্য হতে মহত্তর কিছু নাই। সুতরাং এখানে দেখি সত্যকে বেশ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১। ২।১০৯।১৬

এই প্রসঙ্গে সত্য শব্দটির অর্থের পরিবর্তনের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই শব্দটির ভারতীয় চিন্তায় প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে। সেখানে আছে :

ঋতং চ সত্যং চাভিদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। (২)

অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত তপস্যা হতে ঋত ও সত্যের উৎপত্তি হল। সায়ণ ঋতের অর্থ করেছেন যজ্ঞ আর সত্য অর্থে আমরা যা বুঝি তাই ; অর্থাৎ তা মিথ্যার বিপরীত। অর্থাৎ যার সম্বন্ধে সত্য বিশেষণটি প্রয়োগ করি বুঝতে হবে তা আছে। সুতরাং সত্য অর্থে বুঝি বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব বা বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব। এখানে সত্যের সংজ্ঞা জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

আমরা দেখি প্রাচীন উপনিষদে সত্যকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে শিক্ষাব্রতীকে সমাবর্তনের দিনে আচার্য উপদেশ দিচ্ছেন 'সত্যং বদ' (৩)। একই উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (৪)।

মনুসংহিতায় ও এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেখানেও একই অর্থে সত্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা মনুর এই প্রজ্ঞাবচনটির সকলেই পরিচয় রাখি :

সত্যং ব্রয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। (৫)

কিন্তু আমরা রামায়ণে প্রথম দেখি সত্য শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে ; অর্থাৎ তাকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। দশরথ যখন রামকে নিজ মুখে বনবাসে যেতে নির্দেশ দিতে পারলেন না,

২। ঋগ্‌বেদ ১০।১৯০।১

৩। তৈত্তিরীয় ১।১১

৪। তৈত্তিরীয় ২।১

৫। মনু ৪।১৩৮

কৈকেয়ী তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, যদি পিতাকে সত্যপ্রতিষ্ঠ দেখতে চাও তা হলে আমার কথা শোন (৬)। তিনি আরও বললেন, 'সত্যং ন ত্যজেদ্ রাজা' (৭)। রাজার সত্যকে ত্যাগ করা উচিত হবে না। অর্থাৎ এখানে প্রতিজ্ঞা পালনকেই সত্যের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান কালেও আমরা বলে থাকি রাম পিতৃসত্য পালন করেছিলেণ। অর্থাৎ সত্য অর্থে এখানে প্রতিশ্রুতি পালনও বোঝায়।

জাবালি মুনির সহিত বিতর্কের প্রসঙ্গে দেখা যায় রাম আরও ব্যাপক অর্থে সত্য শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন ধর্মও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ধর্ম শব্দটিকেও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধর্ম আমরা যে বিভিন্ন রীতির আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করে থাকি তা নয়। ধর্ম শব্দটি আর একটি অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। তা হল বিশেষ শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর মানুষের পালনীয় কর্তব্য। যেমন বিভিন্ন বর্ণের ধর্ম। ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের বিভিন্ন জীবনযাপন রীতি আছে। তেমন রাজার এক ধর্ম, নারীর এক ধর্ম, শিক্ষার্থীর এক ধর্ম। মনুসংহিতায় এই শ্রেণীর ধর্মের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাই মনুসংহিতার আর একনাম মানব ধর্মশাস্ত্র। রাম এই ব্যাপক অর্থেই সত্যের ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এই অর্থে বলা যায় সমগ্র সমাজের কল্যাণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং রাম এখানে সত্য শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সত্য অর্থে শুধু সত্যকথন নয়, শুধু প্রতিশ্রুতি পালন নয়, নীতিসম্মত জীবন যাপন। তা ধর্ম বা নীতিসম্মত আচরণকেও সূচিত করে; সমাজকে ধ্বংস হতে তা রক্ষা করে। তাই রাম বলেছেন সমগ্র সমাজের কল্যাণ সত্যের উপর নির্ভরশীল।

৬। অযোধ্যাকাণ্ড ১৮।৩৪

৭। অযোধ্যাকাণ্ড ১৮।২৪

এই প্রসঙ্গে রাম যে বনবাস করবার প্রতিশ্রুতি পিতাকে দিয়েছিলেন তা কতখানি নিষ্ঠার সহিত পালন করতেন তার দুটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। তা দেখায় যে যেহেতু তিনি নগরে যে সুখের জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন তা হতে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখতেন। অরণ্যবাসী ঋষি যে সরল বিলাসলেশশূন্য জীবন যাপন করেন তিনি সেই ভাবে জীবন যাপন করবেন ঠিক করেছিলেন।

প্রথম দৃষ্টান্তটি পাই অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চাশতম সর্গে। রাম যখন অযোধ্যা ত্যাগ করে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ গঙ্গা পার হয়ে শৃঙ্গবেরপুরে পৌঁছালেন, স্থানীয় রাজা গুহ এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। গুহ রামকে ভোজনের জন্য খাদ্য, শয়নের জন্য শয্যা এবং বহনের জন্য অশ্ব দিতে চাইলেন। রাম সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে :

কুশচীরাজিনধরং ফলমূলাশনং চ মাম্।
বিদ্ধি প্রণিহিতং ধর্মে তাপসং বনগোচরম্॥ (৮)

অর্থাৎ, আপনি জানুন, আমি এখন বনবাসী তাপস, নিজের ধর্মপালনে নিযুক্ত আছি; আমি কুশাসন, চীরবসন এবং অজিন ভিন্ন কিছু ব্যবহার করি না এবং ফলমূল আহার করি।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি পাই কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে। বালী নিহত হবার পর সুগ্রীবের যখন কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করবার সুযোগ ঘটল, তখন হনুমান রামের কাছে প্রস্তাব করলেন রাম যেন তাঁদের সঙ্গে কিষ্কিন্ধায় আসেন কারণ, সুগ্রীব তাঁকে তাঁর সুহৃদগণকে সঙ্গে নিয়ে মাল্য ও রত্ন দিয়ে সংবর্ধনা করবেন, এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে। রাম সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে :

চতুর্দশসমাঃ সৌম্য গ্রামং বা যদি বা পুরম্॥
ন প্রবেক্ষ্যামি হনুমন্ পিতুর্নির্দেশ পালকঃ। (৯)

৮। অযোধ্যাকাণ্ড ।৫০।৪৪
৯। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ।২৬।৯-১০

অর্থাৎ, হে সৌম্য, আমি পিতার নির্দেশ পালন করতে চতুর্দশ বৎসর কাল গ্রাম ও নগরে প্রবেশ করব না। রামের এই মন্তব্য দেখিয়ে দেয় তিনি কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে পিতাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেয়েছিলেন।

রামের দ্বিতীয় গুণ হল তাঁর সুগভীর পত্নীপ্রেম। সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে বোধ হয় এমন পত্নীপ্রেমের নির্দশন আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। সীতার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর চিন্তা, সীতার সহিত একত্র বাসে গভীর আনন্দ এবং সীতার সহিত বিচ্ছেদে তাঁর অন্তহীন শোক তার সুন্দর পরিচয় দেবে। কিছু দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

কৈকেয়ীর ইচ্ছা পূরণ করতে যখন রাম চতুর্দশ বৎসর কাল বনে গিয়ে বাস করবেন বলে ঘোষণা করলেন, সীতা সঙ্গে যেতে চাইলেন। কিন্তু যিনি রাজপ্রাসাদে সুখের জীবন যাপনে অভ্যস্ত তাঁর পক্ষে বনবাস জীবন যে কত কষ্টকর রাম তা বুঝতেন। তাই সীতাকে সে দুর্ভোগ হতে নিবৃত্ত করবার জন্য তিনি বনবাসে কত কষ্ট তা সীতাকে বোঝাতে চাইলেন। বিষয়টি অযোধ্যাকাণ্ডের আটাশতম অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, সেখানে সিংহ ও হস্তীর দৌরাত্ম্য আছে, লতা ও কণ্টকে তা আচ্ছন্ন, পথে পথে নদীর মত কুটিলগামী সর্প, বৃশ্চিক, দংশ ও মশকের অত্যাচার আছে, খাদ্যাভাবে উপবাসের সম্ভাবনা আছে। শেষ করলেন এই বলে ঃ

কায়ক্লেশাশ্চ বহবো ভয়ানি বিবিধানি চ।
অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদা বনম্॥ (১০)

অর্থাৎ, যে অরণ্যে বাস করে তার অনেক ক্লেশ সহ্য করতে হয়, বিধির ভয়ের সম্মুখীন হতে হয়। বনবাস সর্বথা দুঃখের। তবু সীতাকে তাঁর ইচ্ছা ত্যাগ করাতে পারলেন না।

১০। অযোধ্যাকাণ্ড।২৮।২৩

কিন্তু বনবাস জীবনের দুঃসহ দুর্ভোগের চিত্র ফুটিয়ে তিনি সীতাকে তাঁর সহগামিনী হবার ইচ্ছা হতে নিবৃত্ত করতে চাইলেও বনের প্রতিকূল পরিবেশে অতিবাহিত দিনগুলি সীতার সাহচর্য পেয়ে রামের কাছে রীতিমত উপভোগ্য হয়ে উঠল। রামের মনের এই অভিনব প্রতিক্রিয়া অযোধ্যাকাণ্ডের চুরানব্বইতম সর্গে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় রাম সীতার নিকট চিত্রকূট পর্বতের পরিবেশের নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা করে তাঁর মনোরঞ্জন করছেন। সেই প্রসঙ্গে রাম একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যে চিত্রকূটের শোভা দেখে রাজ্য হতে বিচ্যুত হবার বা বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখ তিনি ভুলে গেছেন। তা দেখায় রামের প্রকৃতির শোভার প্রতি কি গভীর অনুরাগ ছিল। এ বিষয় পূর্বে সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন যে বনবাসের ফলে তিনি দুটি সুফল পেয়েছেন: পিতৃদায় হতে মুক্তি পেয়েছেন এবং ভরতের সিংহাসন লাভ সহজ করে দিয়ে তাঁর মঙ্গল সাধিত হয়েছে। তা দেখায় তাঁর সত্যপালনে নিষ্ঠা এবং ভরতের প্রতি গভীর স্নেহ। তাঁর তৃতীয় মন্তব্যটি বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সেটি উদ্ধৃত হল:

দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে।
অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ॥ (১১)

অর্থাৎ, প্রাসাদে বাস হতে তোমার সঙ্গসহ চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর শোভা উপভোগ আমার নিকট অধিক প্রিয়। সুতরাং কষ্টকর বনবাস জীবনও সীতা সঙ্গে থাকলে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রেমের গভীরতা, প্রেমের মাধুর্য বোধ হয় সব থেকে সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে বিরহের অবস্থায়। মিলনে মাদকতার উচ্ছ্বাস গভীরতাকে বুঝতে দেয় না। মানুষের অনুভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ

১১। অযোধ্যাকাণ্ড।৯৫।১২

ঘটে প্রেমে। আর তার শ্রেষ্ঠ রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বিরহের বেদনার মধ্যে। যাকে ভালবাসি তাকে কতখানি ভালবাসি তা যেন সঠিক জানা যায় তাকে হারালে মনের অবস্থা কি হয় তাই দিয়ে। সুতরাং সীতার জন্য রামের প্রেমের গভীরতা কতখানি ছিল তা ভাল বোঝা যায় রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার পর রামের মনের অবস্থা কি হয়েছিল তার দ্বারা। রামের মনের সেই অবস্থা রামায়ণের তিন স্থানে বর্ণিত হয়েছে ঃ অরণ্যকাণ্ডে, কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ও সুন্দরকাণ্ডে। তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে স্থাপিত হল।

মায়ামৃগরূপী মারীচকে হত্যা করবার পর রাম লক্ষ্মণসহ ফিরে যখন দেখলেন কুটীর শূন্য রেখে সীতা অন্তর্হিত হয়েছেন, তখন তিনি অনুমান করতে পারলেন রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হয়েছেন। ফলে তিনি দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তখন রাম যে ভাবে বিলাপ করেছিলেন তা অরণ্যকাণ্ডের তেষট্টিতম সর্গে বর্ণিত হয়েছে। তার একটি প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে স্থাপন করা যেতে পারে ঃ

রাজ্যপ্রণাশঃ স্বজনৈর্বিয়োগঃ
পিতুর্বিনাশো জননী বিয়োগঃ।
সর্বানি মে লক্ষ্মণ শোকবেগ
মাপূরয়ন্তি প্রবিচিন্তিতানি॥
সর্বং তু দুঃখং মম লক্ষ্মণেদং
শান্তং শরীরে বনমেত্য ক্লেশম্।
সীতা বিয়োগাৎ পুণরপ্যুদীর্ণং
কাষ্ঠৈরিবাগ্নিঃ সহসোপদীপ্তঃ॥ (১২)

এখানে রাম বলছেন ঃ "রাজ্য হতে বিচ্যুতি, স্বজনের সহিত বিয়োগ, পিতার মৃত্যু, জনীর সহিত বিচ্ছেদ—এই সব কথা স্মরণ

১২। অরণ্যকাণ্ড।৬৩।৫-৬

করে আমার শোকবেগ বর্দ্ধিত হয়েছিল। বনে এসে সকল দুঃখ-ক্লেশ কিন্তু প্রশমিত হয়েছিল ; কিন্তু সীতার বিয়োগ হেতু পুনরায় প্রজ্বলিত হচ্ছে। যেমন স্তিমিত অগ্নি নূতন ইন্ধন পেয়ে পুনরায় সহসা উদ্দীপ্ত হয়।" সুতরাং সীতাকে হঠাৎ হারাবার দুঃখ যে দুর্ভাগ্যের কথা রাম ভুলেছিলেন তার সহিত যুক্ত হয়ে প্রদীপ্ত অগ্নির মত জ্বলে উঠেছে।

রামের সেই সময়কার দুর্দশার বর্ণনা প্রসঙ্গে আদিকবি বলেছেন,

বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং প্রধাবন্ স গিরীংশ্চাপি নদীনদম্।
বভ্রাম বিলপন্ রামঃ শোক পঙ্কার্ণবপ্লুতঃ ॥ (১৩)

অর্থাৎ, তখন রাম বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে ছুটে গিয়ে গিরি এবং নদ-নদীতে ঘুরে ঘুরে শোকসাগরে ভাসমান হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

রামের অবস্থার আর এক করুণ বর্ণনা পাই কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে। সুগ্রীবকে সিংহাসনে স্থাপন করে রাম লক্ষ্মণসহ প্রস্রবণ গিরিতে বর্ষাকাল যাপন করতে লাগলেন। তখন সীতার বিচ্ছেদ তাঁর জীবনকে কতখানি দুঃসহ করেছিল তার পরিচয় মিলবে কিষ্কিন্ধাকাণ্ড হতে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে :

সুসুখে হি বহুদ্রব্যে তস্মিন্ হি ধরণীধরে।
বসতস্তস্য রামস্য রতিরল্পাপিনা ভবৎ ॥
হৃতাং হি ভার্যাং স্মরতঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
উদয়াভ্যুদিতং দৃষ্টা শশাঙ্কং চ বিশেষতঃ ॥ (১৪)

অর্থাৎ সেই সুখকর বহুদ্রব্যে শোভিত পর্বতে বাস করে ও রামের প্রাণের অধিক প্রিয়া ভার্যার কথা স্মরণ করে বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে রাত্রে চন্দ্রের উদয় হলে সীতার

১৩। অরণ্যকাণ্ড।৬০।১১
১৪। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ২৭।৩০-৩১

বিরহজ দুঃখ হেতু তাঁর বাষ্পাকুল নয়নে রাত্রে নিদ্রা আসত না।

সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের মুখে আরও কিছু বর্ণনা মিলবে। অশোকবনে হনুমানের সহিত পরিচয় হবার পর সীতা যখন রামের কথা শুনতে চাইলেন, তখন হনুমান তাঁর বিরহ অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার কিছু আভাস মিলবে নীচের উদ্ধৃতি হতে:

অনিদ্রঃ সততং রামঃ সুপ্তোঽপি চ নরোত্তমঃ।
সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে॥
দৃষ্টা ফলং বা পুষ্পং বা যচ্চান্যৎ স্ত্রীমনোহরম্।
বহুশো হা প্রিয়েত্যেবং শ্বসংস্তামভিভাষতে॥ (১৫)

অর্থাৎ, রাম সতত অনিদ্রায় দিন যাপন করেন; যদি ঘুমিয়ে পড়েন সীতার মধুর নাম বলতে বলতে জেগে ওঠেন। যদি রমণীর মত মনোহর কোনও ফল, পুষ্প বা অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, বহুবার হা প্রিয় বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনার কথা স্মরণ করেন।

কিন্তু এত গভীর প্রেম সত্বেও দেখা যায় রাবণের সহিত যুদ্ধে বিজয়লাভের পর সীতা যখন তাঁর নিকট স্থাপিত হলেন, তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্যরকম আচরণ করলেন। যিনি সীতার বিরহে মাসের পর মাস উদ্ভ্রান্তের মত আচরণ করেছেন তিনি বিজয়-লাভের পর, প্রথম সুযোগেই অশোকবনে ছুটে গিয়ে সীতাকে বুকে টেনে নেবেন—এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তিনি একেবারে বিপরীত আচরণ করলেন। বিভীষণ যখন সীতাকে আনবার প্রস্তাব করলেন রাম বললেন, তিনি চান স্নান করে সুসজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যে জনতার মধ্যে এসে সীতা তাঁর সহিত দেখা করুন। যাঁকে তিনি প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী' মনে করতেন তাঁর প্রতি এই আচরণ অতিনিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন।

সীতা তাঁর নির্দেশ মত জনতার মধ্যেই যখন তাঁর কাছে এলেন

১৫। সুন্দরকাণ্ড ৩৫।৪৪-৪৫

তার একটি চিত্তগ্রাহী বর্ণনা আদিকবি দিয়েছেন এই শ্লোকে :

বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ স্নেহাচ্চ পতিদেবতা।
উদৈক্ষত মুখং ভর্তুঃ সৌম্যং সৌম্যতরাননা ॥ (১৬)

অর্থাৎ, যে পতিকে তিনি দেবতা জ্ঞান করেন তাঁর সুন্দর মুখ সেই সুন্দরতর মুখের অধিকারিণী মহিলা বিস্ময়, হর্ষ এবং স্নেহ ভরে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু হায় লোকাপবাদের ভয়ে রাম যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেন, সীতা তার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সীতাকে বললেন : তোমাকে রাবণ অপহরণ করলে পৌরুষের দ্বারা যা করা সম্ভব তা আমি করেছি। অপমান এবং দৈবসংঘটিত যে দোষ শত্রুকে নিহত করে তা জয় করেছি। কিন্তু সৎকুলে জাত কোন মানুষ পরগৃহে বাস ঘটেছে এমন স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করবে ? তাই এই নিষ্ঠুর নির্দেশ দিলেন :

প্রাপ্তচারিত্র সন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া ॥
তদ্ গচ্ছ ত্বানুজানেঽদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্যমিস্তি ন মে ত্বয়া ॥ (১৭)

অর্থাৎ, "তোমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়েছে ; সে হেতু আমার সম্মুখে উপস্থিত থেকে চোখের পীড়া হলে দীপ যেমন অসহ্য হয় তেমন তুমি আমার একান্ত অপ্রিয় হয়েছে। অতএব জনকাত্মজে, তোমার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই। এই দশ-দিকের যে দিকে খুসী যাও ; আমি তোমাকে সম্মতি দিচ্ছি।" এমন নিষ্ঠুর আঘাত রামের মত মানুষ যে হানতে পারে তা কল্পনাতীত।

পরে অবশ্য সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর রাম তাঁকে গ্রহণ করে-

১৬। যুদ্ধকাণ্ড ১১৪।৩৫
১৭। যুদ্ধকাণ্ড।১১৫।১৭-১৮

ছিলেন ; কিন্তু সীতার সহিত এই অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ তাঁর চরিত্রের দুর্বলতাকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। তিনি সীতার জন্য যে সুগভীর প্রেম হৃদয়ে বহন করতেন তাও এই নিষ্ঠুর আচরণ হতে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারল না ; একটি যুক্তি দ্বারা সমর্থনযোগ্য নয় এমন সংস্কারের প্রভাব জয়ী হল। তাঁর কাছে পত্নীর প্রতি কর্তব্য অপেক্ষা কুলের সুনাম রক্ষা বেশী মূল্যবান মনে হয়েছিল। উত্তরকাণ্ডে যে প্রজাদের অপবাদ বন্ধ করবার জন্য সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিত করবার কাহিনী বর্ণিত আছে তাও এক্ষেত্রে রামের এই চারিত্রিক দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।

রামের কতকগুলি মহৎ গুণ ছিল। তাদের মধ্যে প্রধানগুণগুলি এই ঃ তিনি অসূয়াহীন এবং ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। পাপকে তিনি ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। উচ্চবর্ণ এবং শূদ্রবর্ণের সঙ্গে কোনও ভেদ তিনি মানতেন না। আশ্রয়প্রার্থী মানুষকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না ; তিনি ঐকান্তিক ভাবে আশ্রিতবৎসল ছিলেন।

প্রথমে রাম যে অসূয়াবোধ হতে মুক্ত ছিলেন সে বিষয় আলোচনা করা যাক। তাঁর আচরণ এবং মন্তব্য হতে তার সত্যতা প্রমাণিত হবে। বিমাতা কৈকেয়ী তাঁর সহিত সর্বাধিক প্রতিকূল আচরণ করেছিলেন। তিনিই স্বার্থবোধ প্রণোদিত হয়ে রামকে শুধু সিংহাসন লাভ হতে বঞ্চিত করেন নি, তাঁর চতুর্দশবৎসর ব্যাপী বনবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তবু দেখি কৈকেয়ীর প্রতি কোনও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন না। কৈকেয়ী যখন তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে পিতার পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বলে তাঁকে রাজ্যচ্যুতি ও বনবাসের দণ্ড দিলেন, তিনি বিনা প্রতিবাদে তা গ্রহণ করলেন। তারপর লক্ষ্মণের সহিত এ বিষয় যখন তাঁর আলোচনা হল তিনি বোঝাতে চাইলেন যে এই দুর্বিপাকের জন্য বিমাতা কৈকেয়ী আদৌ দায়ী নয় দৈবই দায়ী। তিনি বললেন,

সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যস্য কিংচিদ তথাভূতং নন্থ দৈবস্য কর্ম তৎ॥ (১৮)

অর্থাৎ সুখ-দুখ, ভয়-ক্রোধ, লাভ-ক্ষতি জন্ম-মৃত্যু যার ভাগ্যে যা ঘটে তা নিশ্চিত দৈবের বিধান। তিনি আরও বললেন সৎপ্রকৃতি-সম্পন্ন এবং রাজকন্যা হয়েও তা না হলে কৈকেয়ী কেন প্রাকৃত নারীর মত আমার পিতার উপস্থিতিতে আমার পীড়াদায়ক এমন নির্দেশ দেবেন।

একই কারণে, কৈকেয়ীর পরেই রামের মনে ভরতের প্রতি বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হবার প্রবল সম্ভাবনা ছিল ; কারণ, ভরতের স্বার্থেই তাঁর বিমাতা এমন অন্যায় ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রামের ভরতের প্রতি আদৌ বিদ্বেষভাব ফুটে ওঠে নি। এমন কি তিনি সীতার সহিত আলাপ করতে করতে মন্তব্য করেছিলেন যে বনবাসজীবন বরণ করে নেবার জন্য দুটি সুফল হয়েছে : প্রথমত পিতাকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দায় হতে মুক্ত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত অনুজ ভ্রাতা ভরতের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাঁর অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণের মনের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন রূপ। তিনি ভরতের প্রতি এক সময় গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

তার সুন্দর পরিচয় মিলবে অযোধ্যাকাণ্ডের ছিয়ানব্বইতম সর্গে। পরিবেশটি এই : রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ তখন চিত্রকূট পর্বতে বাস করছিলেন। এদিকে ভরত সিংহাসন অধিকার না করে শূন্য সিংহাসনে রামকে স্থাপন করবার জন্য সসৈন্য রামের অনুসন্ধানে বাহির হয়েছেন। পথে শৃঙ্গবেরপুর এবং ভরদ্বাজের আশ্রম হয়ে রাম যে চিত্রকূট পর্বতে বাস করেছেন সে সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর বাহিনীর ভয়ে অরণ্যবাসী জীবেরা ছোটাছুটি করছে দেখে লক্ষ্মণ এক উঁচু গাছে উঠে বিরাট

১৮। অযোধ্যাকাণ্ড।২২।২৮

সৈন্যবাহিনী লক্ষ্য করে ভাবলেন নিশ্চয় ভরত রাম ও লক্ষ্মণকে হত্যা করতে আসছেন। (১৯)

ভরতের আচরণের এই ভুল ব্যাখ্যা লক্ষ্মণের পক্ষে সহজ ছিল; কারণ, তিনি তাঁর মাতার অসঙ্গত আচরণের জন্য ভরতের প্রতি অসূয়া বহন করতেন। রাম কিন্তু ভরতের প্রতি অসূয়া আদৌ পোষণ করতেন না। তাই তাঁর পক্ষে ভরতের আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা তিনি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভ্রাতার নির্বাসনের সংবাদ পেয়ে মাতার প্রতি রুষ্ট হয়ে, তাঁকে অপ্রিয় কথা শুনিয়ে, পিতাকে প্রসন্ন করবার জন্যে রামকে রাজ্যভার দিতে ভরত আসছেন। অবশ্য রাম তখনও জানতেন না যে পিতা দশরথ ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মণকে বলেছিলেন—

স্নেহেনাক্রান্তহৃদয়ঃ শোকেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
দ্রষ্টুমভ্যাগতোহ্যেষ ভরতো নান্যথাগতঃ॥ (২০)

অর্থাৎ, হৃদয়ে আমার প্রতি গভীর স্নেহ অনুভব করে, শোকে আকুল হয়ে ভরত আমাকে দেখতে আসছে, অন্য কারণে নয়।

তারপর নন্দীগ্রামে ভরতের সহিত রামের পুনর্মিলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে যখন দুই ভ্রাতার মিলন হল ভরত রামের চরণ বন্দনা করলেন। ভরতের প্রতি রামের স্নেহ তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তখন এই আত্মত্যাগী ভক্তিমান ভ্রাতাকে তিনি তুলে নিয়ে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন।

সুতরাং রামের অসূয়াযুক্ত হৃদয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে রামের ভ্রাতৃবৎসল্যের পরিচয় আংশিকভাবে মিলে গেছে। ভরতের প্রতি তাঁর সুগভীর স্নেহের পরিচয় দেয় এমন আচরণ ও মন্তব্যের উল্লেখ

১৯। আবাং হন্তুং সমভ্যেতি কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ।
অরণ্যকাণ্ড।৯৬।১৭

২০। অযোধ্যাকাণ্ড।৯৭।১১

করা হয়ে গেছে। এখন লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর স্নেহের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

লক্ষ্মণ ছিলেন আবাল্য রামের নিত্যসঙ্গী। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে তাঁরা পরস্পর হতে কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হননি। কাজেই উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। অতিরিক্তভাবে লক্ষ্মণের সর্বাত্মক ভ্রাতৃভক্তি ও আনুগত্যের জন্য রাম তাঁর প্রতি যে স্নেহ হৃদয়ে বহন করতেন তা বিশেষভাবে পুষ্টি লাভ করেছিল। সেই স্নেহের গভীরতার পরিচয় মিলবে লঙ্কাকাণ্ডের একটি দৃশ্যে। লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে আহ্বান করে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁকে নিহত করেন। রাবণ পুত্রশোকে উন্মাদ হয়ে অনতিবিলম্বে যুদ্ধক্ষেতে লক্ষ্মণকে পেয়ে শক্তিশেলের আঘাতে তাঁকে ধরাশায়ী করে লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন রামের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তার একটি মর্মান্তিক বর্ণনা পাওয়া যায় যুদ্ধকাণ্ডের একশএকতম সর্গে।

তখন লক্ষ্মণ নিহত হয়েছেন এই ধারণায় রাম করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর পরিতাপ এই যে তাঁর চোখের সামনে রাবণ লক্ষ্মণকে ধরাশায়ী করলেন, তিনি ভ্রাতাকে রক্ষা করতে পারলেন না। এমন প্রিয় অনুগত ভাইকে যখন তিনি হারালেন তখন তাঁর কাছে জীবন বা সুখ সবই নিরর্থক। এই বীর্যবান স্থিতধী মানুষটি ভরত যখন পিতার মৃত্যুসংবাদ এনে দিয়েছিলেন তখন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। এখানে কিন্তু তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর দুর্দশার একটি করুণ বর্ণনা আদি-কবি রামের মুখেই স্থাপন করে দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

লজ্জতীব হি মে বীর্যং ভ্রশ্যতীব করাদ্ ধনুঃ।
সায়কা ব্যবসীদন্তি দৃষ্টির্বাষ্পবশং গতা ॥ (২১)

২১। যুদ্ধকাণ্ড ।১০১।৬

অর্থাৎ, "আমার বীর্য যেন লজ্জায় অভিভূত হয়েছে, হাত থেকে আমার ধনু যেন ভ্রষ্ট হতে চলেছে, আমার সায়কগুলি শোকে অভিভূত হয়েছে এবং আমার দৃষ্টি অশ্রুজলে আচ্ছন্ন হয়েছে। তিনি আত্মীয়দের মধ্যে ভ্রাতা যে কত দুর্লভ বস্তু তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তার প্রেরণা হতেই তিনি সেই সুন্দর মন্তব্যটি করেছিলেন যা অমর হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, দেশে দেশে কলত্র মিলবে দেশে দেশে বন্ধু মিলবে ; কিন্তু এমন দেশতো দেখিনা যেখানে সহোদর ভ্রাতা মিলবে। মূল শ্লোকটি অন্য প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হয়েছে।

রামের মন অত্যন্ত উদার ছিল। তিনি পাপকে ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। তার সুন্দর পরিচয় মিলবে আদিকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত অহল্যা সম্পর্কিত কাহিনী হতে। অহল্যা ছিলেন গৌতম মুনির পত্নী। রামায়ণে অহল্যার কাহিনীর যে বিবরণ পাই তা পরবর্তীকালে যে কাহিনী প্রচলিত হয়েছে তা হতে ভিন্ন। প্রচলিত কাহিনীতে আছে যে গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষি পত্নী অহল্যার রূপে আকৃষ্ট হয়ে মুনির বেশ ধরে তাঁর সহিত মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অহল্যা সে ফাঁদে ধরা দিলেন। পরে ইন্দ্র ফিরবার পথে ধরা পড়ে গেলেন এবং ঋষি তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে তাঁর এই অপকর্ম হেতু তাঁর সর্বাঙ্গ যোনিচিহ্ন দ্বারা লিপ্ত হবে। তাই নাকি তাঁর সহস্রাক্ষ নাম। আর অহল্যাকে শাপ দিলেন যে তিনি পাষাণে পরিণত হবেন এবং রামের পদস্পর্শ লাভ হলে তাঁর শাপমুক্তি ঘটবে।

আদিকবি তাঁর কাব্যে যে কাহিনী স্থাপন করেছেন তার উপরে বর্ণিত কাহিনীর সহিত মৌলিক পার্থক্য আছে। তাতে আছে গৌতম ঋষির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র ঋষির বেশে এসেছিলেন ঠিকই ; কিন্তু অহল্যা তাঁর ছদ্মবেশ ধরে ফেলেছিলেন। তা

সত্ত্বেও তিনি ইন্দ্রের সহিত স্বেচ্ছায় মিলিত হয়েছিলেন এই কারণে গৌতম ঋষি ইন্দ্রকে শাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর যৌন সম্ভোগক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। আর পত্নী অহল্যাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন সেই আশ্রমে কঠোর তাপস্যা করে দিন যাপন করেন যত দিন না রাম এসে তাঁকে শাপ হতে মোচন করেন। তাঁকে পাষাণে পরিণত করার কথা আদৌ উল্লিখিত হয় নি। মনে হয় কৃত্তিবাস তাঁর রচিত রামায়ণে পরিবর্তিত কাহিনীটির অনুসরণ করেছিলেন।

সে যাই হক আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি। আমাদের বক্তব্য হল রাম পাপকে ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। তার প্রমাণ মিলবে রামের অহল্যার প্রতি আচরণ হতে। এই প্রসঙ্গের আলোচনা অহল্যাকে ঋষি যে অভিশাপ দিয়েছিলেন তাই দিয়ে সুরু হতে পারে। প্রাসঙ্গিক শ্লোক এই ঃ

ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি ॥
বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতালায়াশ্রমেহস্মিন্ বসিষ্যসি ॥ (২২)

অর্থাৎ, "এখানে বহু সহস্র বৎসর ধরে বায়ু ভক্ষণ করে; নিরাহারে থেকে, ভস্মশয্যায় শয়ন করে সকলের অদৃশ্য থেকে তুমি এই আশ্রমে বাস করবে।" তার পরের শ্লোকে আছে রাম সেই আশ্রমে এলে তিনি শাপমুক্ত হবেন।

এই পরিবেশেই বিশ্বামিত্র ঋষি মিথিলা যাবার পথে রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে সেই আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাঘব ভ্রাতৃদ্বয় সেখানে আসলে তিনি শাপমুক্ত হয়ে মানুষের দৃষ্টিগোচর হলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে দুই ভাই তাঁর পা দুটি স্পর্শ করলেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

২২। বালকাণ্ড ।৪৮।২৯-৩০

রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতু মুর্দা।
স্মরন্তা গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ॥ (২৩)

অর্থাৎ, রাম ও লক্ষ্মণ তখন অহল্যার পাদুটি আনন্দে স্পর্শ করলেন, এবং তিনি গৌতমের নির্দেশ অনুসারে তাঁদের স্বাগত জানালেন। অহল্যার কাহিনী রাম বিশ্বামিত্রের মুখে শুনেছিলেন। অহল্যা যে ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন রাম তা জেনেছিলেন। তবু রাম অহল্যার চরণদ্বয় স্পর্শ করে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে, তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। তিনি যে পাপীকে ঘৃণা করতেন না, তার চূড়ান্ত প্রমান রামের এই উদার আচরণ হতে প্রমাণিত হয়। অহল্যা স্বেচ্ছায় কলঙ্কিনী হলেও তিনি মাননীয়া ঋষি পত্নী। অহল্যা অতিরিক্ত ভাবে তাঁর পাপের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তও করেছেন। তাই রাম তাঁর চরণ স্পর্শ করে শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধা বেধে করেন নি।

তারপর আমাদের প্রতিপাদ্য রাম উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে কোনও ভেদ রাখতেন না। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রামায়ণের কাহিনী বৈদিক যুগে স্থাপিত। তখন চারটি বর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি তিনটি বর্ণ উচ্চবর্ণের মর্যাদা পেত; আর চতুর্থ শূদ্রবর্ণ অবরবর্ণ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হতে বোঝা যায় যে উচ্চ ও অবরবর্ণের মধ্যে কোন ও ঘৃণা বা বিদ্বেষ বোধ ছিল না। এমন কি বর্ণগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে কোনও কঠোর অনমনীয় নির্দেশ প্রযুক্ত হত না। শূদ্রবর্ণের মানুষ উচ্চ বর্ণের জন্য রক্ষিত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত। ঋগবেদে পাই যদু ও তুর্বশ নামে দুই দাস রাজা ছিলেন। (২৪) রাময়েণেও তার দৃষ্টান্ত পাই।

২৩। বালকাণ্ড।৪৯।১৭

২৪। ঋগ্‌বেদ। ১০।৬২।১০

শৃঙ্গবেরপুরে গুহ নামে এক দাস রাজা ছিলেন। অমরা অযোধ্যা-কাণ্ডে পাই তিনি রামের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণসহ রাম যখন বনবাসে যাবার পথে গঙ্গা পার হয়ে সেখানে এসেছিলেন গুহ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিলেন।

আরও দৃষ্টান্ত পাই যা একাধিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে যাবার পর রাম ও লক্ষ্মণ তাঁর অনুসন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পম্পা সরোবরে এসে হাজির হলেন। পম্পার তীরে অবস্থিত এক শবরী শ্রমণীর আশ্রম ছিল। আগে সেখানে মতঙ্গ মুনির শিষ্যদের আশ্রম ছিল। তাঁরা চলে গেলে তাঁদের পরিচারিকা শবরী নিজেই আশ্রমে তপস্যা করতেন। সেই কথা শুনে রাম ও লক্ষ্মণ শবরীর আশ্রমে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে এই কথা বললেন—

কচিৎ তে নির্জিতা বিঘ্নাঃ কচিৎ তে বর্ধতে তপঃ
কচিৎ তে নিয়তঃ কোপঃ আহারশ্চ্য তপোধনে ॥ (২৫)

অর্থাৎ, "তোমার বিঘ্ন পরাহত হয়েছে তো? তোমার তপস্যা বর্ধিত হচ্ছে তো? তোমার ক্রোধে রিপু নিয়ন্ত্রিত আছে তো? তোমার আহারের ব্যবস্থা আছে তো?" অর্থাৎ রাম তাঁর কুশল প্রশ্ন করলেন। রামকে পেয়ে শবরী কৃতার্থ। তিনি বললেন আজ আমার তপস্যার সিদ্ধিলাভ হল, আজ আমার জন্ম সফল হল।

এর প্রথম তাৎপর্য হল রামায়ণের কালেও আশ্রমে নারী তপস্যা করতেন। এটি বৈদিক যুগের বিশেষত্ব। আধ্যাত্মিজ্ঞানের চর্চা সেকালে হত নগরে নয়, অরণ্যে অবস্থিত আশ্রমে। বেদের যুগে অনেক মহিলা ঋষিও ছিলেন। ঋগ্‌বেদে অনেক মহিলা ঋষির রচিত সূক্ত স্থান পেরেছে। শবরী আশ্রমে তপস্যারত ছিলেন। সুতরাং বৈদিক ঐতিহ্য তখনও সবল ছিল। দ্বিতীয় তাৎপর্য আরও

২৫। অরণ্যকাণ্ড। ৭৪। ৮

সুদূরপ্রসারী। তা দেখায় শবরী অবরবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ও তপস্যা করবার স্বাধীনতা ভোগ করতেন। আনুসঙ্গিক ভাবে প্রমাণ হয় রাম অবরবর্ণের মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা দিতেন।

এই প্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত শম্বূকের শূদ্রবংশ জাত হয়েও তপস্যা করার কাহিনীটি প্রসঙ্গত এসে পড়ে। তাতে বলা হয়েছে এক ব্রাহ্মণের বালক পুত্রের অকাল মৃত্যু হলে তিনি রামের কাছে সে বিষয় অভিযোগ করেন। তখন নারদ এসে রামকে খবর দেন যে শম্বূক নামে এক শূদ্র বর্ণধর্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে তপস্যা করছেন বলে ব্রাহ্মণের বালকপুত্রের অকালমৃত্যু ঘটেছে। তখন রাম শম্বুককে তপস্যা মগ্ন অবস্থায় হত্যা করে তাঁর দণ্ড দেন। (২৬)

এই কাহিনী কিন্তু উপরে বর্ণিত শৃঙ্গবেরপুরের শূদ্র রাজা গুহ এবং তপস্বিনী শবরীর কাহিনীর সঙ্গে আদৌ সঙ্গতি রক্ষা করে না। বৈদিক যুগে চারটি বর্ণ সৃষ্ট হয়ে থাকলেও বর্ণ অনুসারে বৃত্তির নির্দেশ কঠোরভাবে পালিত হত না। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ও অরণ্যকাণ্ডে স্থাপিত কাহিনী দুটি তার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে। শম্বুকের কাহিনী সঙ্গতি রক্ষা করে না। সুতরাং এই রকম অনুমান করাই সঙ্গত যে শম্বুকের কাহিনী পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। উত্তরকাণ্ডে আদৌ মূল রামায়ণের অঙ্গীভূত ছিল কিনা সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ যে পোষণ করা হয় তা অহৈতুক নয়। শম্বুকের কাহিনী তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

রামের আর একটি গুণ হল আশ্রিতের প্রতি সহৃদয়তাপূর্ণ আচরণ। তাঁর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলবে যুদ্ধকাণ্ডের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ সর্গে। পরিবেশটি এই : রাবণের কাছে যখন খবর গেল যে রাম সসৈন্যে সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন তখন রাবণ পরামর্শ সভা ডাকলেন। সে সভায় ইন্দ্রজিৎ উপদেশ দিলেন

২৬। এই প্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডের ৭৩-৭৬ সর্গ দ্রষ্টব্য

যুদ্ধ যদি হয় তিনিই রামকে সমুচিত শিক্ষা দেবেন। বিভীষণ বারবার উপদেশ দিলেন যে সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করে যুদ্ধ পরিহার করাই কর্তব্য। রাবণ তাতে রুষ্ট হয়ে তাঁকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করলেন। তিনি বললেন রামের মত অনার্যের সহিত মিত্রতার যে পরামর্শ দেয় সে কুলপাংসন; তাকে ধিক। তাতে রুষ্ট হয়ে বিভীষণ তাঁর অনুগত চারজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে লঙ্কা ত্যাগ করলেন।

তিনি ঠিক করলেন সমুদ্রের অপরপারে গিয়ে রামের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। সেখানে তাঁকে দেখতে পেয়ে সুগ্রীব চারজন সঙ্গীসহ তাঁকে নিয়ে রামের নিকট স্থাপন করলেন। সুগ্রীব রামকে বললেন, বিভীষণ রাবণের অনুজ ভ্রাতা। আমার ধারণা যে রাবণ কর্তৃক প্রেরিত। তাকে শত্রু বিবেচনা করে বধ করা উচিত। অঙ্গদ বললেন বিভীষণকে বিশ্বাস করা যায় না।

রামের কিন্তু প্রতিক্রিয়া হল ভিন্ন রকমের। তিনি সুগ্রীব ও অঙ্গদের উপদেশ গ্রহণ করলেন না। তাঁর মন একটি স্বতন্ত্র আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হত। তিনি বললেন:

আর্তো বা যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ।
অরিঃ প্রাণাম্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা॥ (২৭)

অর্থাৎ, যে শত্রু আর্ত অবস্থায় বা দৃপ্ত অবস্থায় শরণ ভিক্ষা করে, যে মানুষ জীবনকে সার্থক করতে চায়, তার উচিত হবে তাকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করা। অতএব তিনি বিভীষণকে অভয় দিয়ে গ্রহণ করলেন। তিনি আরও বললেন, আমার ব্রত হল সকলকে অভয় দেওয়া।

সর্বোপরি রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। রাজদণ্ড ধারণ করে তিনি এমন নিষ্ঠার সহিত প্রজাদের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত

২৭। যুদ্ধকাণ্ড।১৮।২৮

ছিলেন যে তিনি অভাবনীয় ভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা পরবর্তীকালে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে ভারতবাসীর মনে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয় গেছে। তাই এখনও আদর্শ রাজ্যের কথা বলতে তাকে রামরাজ্য বলা হয়।

তিনি যে কি বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তার পরিচয় মিলবে যুদ্ধকাণ্ডের একেবারে প্রান্তে। তার একটি উদ্ধৃতি এখানে অপরিহার্য হয়ে পড়ে ঃ

নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা লোভবিবর্জ্জিতাঃ।
স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরিব কর্মভিঃ॥
আসন্ প্রজা ধর্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ।
সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ॥ (২৮)

অর্থাৎ, মূল এবং ফলের কোনও সময় অভাব হত না। তরুগুলি পুষ্পশোভিত থাকত। মেঘ ইচ্ছামত বর্ষণ করত, বায়ুর স্পর্শ সুখকর ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মানুষ সকলেই লোভবর্জ্জিত ছিল, নিজেদের কর্মে যুক্ত থেকে নিজ নিজ কাজ করত। রামের শাসনকালে প্রজাগণ সদ্গুণ বিশিষ্ট সত্যবাদী এবং ধর্মপরায়ণ ছিল।

কাজেই প্রজাগণ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নাই। তাই

রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।
রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ (২৯)

২৮। যুদ্ধকাণ্ড।১২৮।১০৩-১০৫
২৯। যুদ্ধকাণ্ড।১২৮।১০২

অর্থাৎ, প্রজাদের মুখে একটি মাত্র কথা উচ্চারিত হতঃ রাম, রাম, রাম। রামের প্রশাসন কালে জগৎ রামময় হয়ে গিয়েছিল।

(৩)

সীতার চরিত্র

আমাদের দেশের লোকের ধারণা সীতা ছিলেন আদর্শ সতী; কিন্তু মনে হয় তিনি সতী হতেও বড় ছিলেন। সতীর আদর্শ হল স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি এবং অতিরিক্তভাবে দৈহিক বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সর্বভাবে প্রচেষ্টা। এই দুটি আদর্শের ভিত্তি হল দুটি পৌরাণিক কাহিনী। সতী শব্দটিরই উৎপত্তি হয়েছে এমন একটি কাহিনী হতে। সতী ছিলেন প্রজাপতিপুত্র দক্ষের কন্যা। তাঁর সহিত শিবের বিবাহ হয়েছিল। দক্ষ শিবের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে সতীর উপস্থিতিতে তাঁর যজ্ঞসভায় শিবের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিহেন। পিতার মুখে পতির নিন্দা অসহ্য হওয়ায় তিনি এমন পিতা হতে উদ্ভূত তাঁর দেহ ত্যাগ করে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। এটি পতির প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি ও আনুগত্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সেই কারণে অনুরূপগুণে ভূষিত নারীকে সতী বলা হয়ে থাকে।

পরপুরুষের স্পর্শ হতে নিজেকে রক্ষা করার আদর্শও একটি অনুরূপ পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। সেটি হল যযাতির কাহিনী। দৈত্যরাজের কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সম্পর্ক বন্ধুতাপূর্ণ ছিল না। একবার বনে ভ্রমণ করতে করতে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে মৃগয়া করতে করতে যযাতি তাঁকে আবিষ্কার করে তাঁকে হাত ধরে তুলে আনেন। সেই কারণে দেবযানী যযাতির সহিত বিবাহবন্ধনে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ

হন। অন্য কোনও জনকে বিবাহ করলে তিনি পরপুরুষের স্পর্শদোষ দ্বারা কলঙ্কিত হবেন। দৈহিক বিশুদ্ধতা রক্ষার এটি একটি চূড়ান্ত আদর্শ।

সীতা যে এই দুটি আদর্শকে মূল্য দিতেন না তা নয়। তিনি পরপুরুষের স্পর্শ হতে নিজেকে রক্ষা করতে যত্ন নিতেন; কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ভাবে তা ঘটে গেলে তার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করতেন না। সেটি প্রমাণিত হবে অশোক বনে বন্দিনী অবস্থায় হনুমানের সহিত তাঁর যে কথোপকথন হয়েছিল তা হতে। সেখানে সীতার সহজমুক্তির জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে সীতা যদি সম্মত হন, হনুমান তাঁকে পৃষ্ঠে স্থাপন করে উদ্ধার করতে পারেন। সীতা তাতে সম্মত হন নি। তার অন্যতম কারণ হল অন্য পুরুষের সহিত তাতে গাত্র সংস্পর্শ ঘটে। এই প্রসঙ্গে সীতা আরও মন্তব্য করেছিলেন যে রাবণ যখন তাঁকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে আসেন তখন অবশ্য পরপুরুষের স্পর্শ ঘটেছিল; কিন্তু তা ইচ্ছাকৃত নয়, কাজেই দোষণীয় নয়।

অপরপক্ষে পতিনিন্দা শুনলে ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করা এমন একটি ঘটনা যা পতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রমাণ করে; কিন্তু তা সর্বথা যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না। পতিকে যে নিন্দা করে তাকে যে রমণী সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়ে তাঁর মীমাংসা করেন তিনিও শ্রদ্ধার পাত্রী এবং সম্ভবত অধিকতর গুণবতী বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। সীতা সেই শ্রেণীর তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। রাবণ যখন রামের নিন্দা করেছিলেন তিনি কঠোর ভাষায় তার উচিত উত্তর দিয়েছিলেন।

ঠিক বলতে কি সীতা পতিকে অন্ধভাবে ভক্তি করতেন না। তিনি রামকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন তাঁর সহধর্মিণী হিসাবে। রামের গুণ তাঁর প্রেমকে গভীরতর করত। তাই তাঁকে ছায়ার

মত অনুগামিনী বললে ভুল হবে। তিনি বনে রামের অনুগমন করেছিলেন, পতিব্রতা ছিলেন বলে নয়, রামকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বলে। পতির কাছে থাকতে পারবেন বলে বনবাসের কঠোর জীবনের কষ্ট তিনি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। অপর দিকে তিনি আত্মসম্মান বোধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। স্বামীর অযৌক্তিক উপেক্ষা তিনি সহ্য করতেন না; প্রয়োজন হলে কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করতেন। তিনি ততটা আদর্শ সতী নয়, যতটা আদর্শ সহধর্মিনী। এই প্রতিপাদ্য তাঁর আচরণ এবং নানা প্রসঙ্গে প্রদত্ত তাঁর মন্তব্য হতে পরিস্ফূট হবে।

সীতার রামের প্রতি যে ঐকান্তিক প্রীতি লক্ষ্য করা যায়, তার প্রেরণা তিনটি। রামের হৃদয়ভরা প্রেমের প্রতিক্রিয়া হল তার প্রথম প্রেরণা। প্রীতি পেলে প্রীতি আসে; তখন তা উভয়মুখী হয়। দ্বিতীয়ত, রামের মধ্যে নানা মহৎগুণের আবিষ্কারের ফলে সীতার হৃদয়ে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উৎপাদিত হয়। যাকে শ্রদ্ধা করি, তাকে প্রীতি করি। তৃতীয়ত সীতার নিজস্ব একটি পতিসেবার আদর্শ ছিল। তা একান্তই মৌলিক। তাঁর আদর্শ অনুসারে দোষ-গুণ বিচারের উপর তা নির্ভরশীল হবে না; তা হবে অহৈতুক। তা হবে পরিপূর্ণ ভাবে একনিষ্ঠ। রাম ছাড়া তাঁর হৃদয়ে আর কারও স্থান হবে না। মনে, কর্মে, বচনে, তিনি কোন অবস্থাতেই এই আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হবেন না।

সীতার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর জীবনের তিনটি দুর্বিপাকের মুহূর্তে তাঁর আচরণ ও মন্তব্য হতে পরিস্ফূট হবে। প্রথম পরীক্ষা আসে রাম যখন কৈকেয়ীর ইচ্ছাপূরণ করে পিতাকে সত্য পালনের দায়িত্ব হতে মুক্তি দেবার জন্য যুবরাজের পদ প্রত্যাখ্যান করে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসের সংকল্প গ্রহণ করেন। সীতা যখন রামের সংকল্পর কথা শুনলেন তিনি তার কোনও প্রতিবাদ

করলেন না। সত্যপালন যে রামের কর্তব্য সে বিষয় তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি শুধু চাইলেন তিনি রামের অনুগামিনী হবেন। রাম এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে কত অনুনয় করলেন, বনবাসী জীবনের কত কষ্ট তার সবিস্তার বর্ণনাও দিলেন; কিন্তু সীতার ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটাতে পারলেন না। তার কারণ কি সেটা তার অব্যবহিত পরের ঘটনা হতে প্রকট হয়ে পড়ল।

বনগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে তিনি কৌশল্যার কাছে বিদায় নিতে গেলেন। কৌশল্যা তখন শ্বশ্রূসুলভ রীতি অনুসারে সীতাকে প্রবাসজীবনে রামের প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। উত্তরে সীতা যে মন্তব্য করলেন তাতে সূক্ষ্মভাবে একটি প্রতিবাদ সূচিত হয়। তিনি একটি নূতন কথা শোনালেন যা কোনও নারী পূর্বে কোনও দিন বলেন নি। তিনি উত্তরে বললেন, রামের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন আছেন। তবে সে তো বাহিরের কথা; নিজের অন্তরের তাগিদেই তিনি রামের সেবা করবেন। এই বাক্যালাপটি অযোধ্যাকাণ্ডের ঊনপঞ্চাশতম সর্গে আছে। সীতা যে নূতন কথা বলেছিলেন, তা তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক। তিনি বলেছিলেন,

নাতন্ত্রী বাদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥ (৩০)

অর্থাৎ. তন্ত্রী না থাকলে বীণা বাজে না; চক্রবিহীন রথ চলে না; শতপুত্রের মাতা হলেও নারী পতি হতে বিছিন্ন হলে সুখ পায় না। অর্থাৎ পতির জন্য নারীর প্রেম এমন তীব্র হয় যে তার সহিত বিচ্ছেদ ঘটলে সে যে দুঃখ পায় তাকে কোনও সুখ পরাভূত করতে পারে না। তিনি একা থাকতে পারবেন না বলেই রামের অনুগামিনী হবেন।

৩০। অযোধ্যাকাণ্ড।৩৯।২৯

একই প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি সুন্দর কথা বলেছেন যা আর কেউ বলেন নি। কৌশল্যা যে রামের প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি সেই কথাটি বলেছিলেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কো ন পূজয়েৎ॥ (৩১)

অর্থাৎ নারীকে পিতা যা দেয়, ভ্রাতা যা দেয়, পুত্র যা দেয় তা সীমিত ; কিন্তু ভর্তা যা দেন তা সীমাহীন। সুতরাং তাঁকে কে না সেবা করবে? আদর্শ পতির এর থেকে মনোরম প্রশস্তি আর রচিত হয় নি। রামের কাছে সীতা পেয়েছিলেন সীমাহীন প্রেম ; কাজেই তিনি স্বভাবতই রামের সেবা স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে করবেন।

রামের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে সীতা তাঁর চরিত্রের আশ্রিত নানা মহৎগুণের পরিচয় পেয়েছিলেন। ফলে রামের প্রতি দিনে দিনে তাঁর শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল। কাজেই তিনি রামকে যে নয়নে দেখতেন অপর কোনও মানুষ তো তাঁর ধারে কাছেও আসতে পারতেন না। কাজেই সীতা যে বলতেন 'মনসা কর্মনা বাচা' রাম ভিন্ন তিনি অপরের চিন্তা করেন না, তা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল।

সীতার রামের প্রতিগভীর শ্রদ্ধা প্রকট হয়েছিল সীতার জীবনের এক চরম দুঃসময়ে। শূর্পনখা রাবণকে সীতার অনন্যসাধারণ রূপের কথা শুনিয়ে ভীষণ প্রলুব্ধ করিয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রী অকম্পন তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত রাবণের মনে কাজ করেছিল। খর ও দুষণের রামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হবার সংবাদ পেয়ে রাবণ অকম্পনের উপদেশ চেয়ে-

৩১। অযোধ্যাকাণ্ড। ৩৯।৩০

ছিলেন। অকম্পন বলেছিলেন রাম এমন বীর্যবান যে তাঁকে রাবণের যুদ্ধে পরাজিত করা দুঃসাধ্য কাজ হবে। অপরপক্ষে রামকে সরাবার একটি সহজ উপায় আছে। রাম সীতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। এই অবস্থায় সীতাকে যদি হরণ করা যায়, তা হলে সীতার সহিত বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে মারা যাবেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই ঃ

তস্যাপহর ভার্যাং ত্বং তং প্রমথ্য মহাবনে।
সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব ন ভবিষ্যতি ॥ (৩২)

অর্থাৎ মহাবনে রামের ভার্যাকে অপহরণ করুন ; সীতার সহিত বিচ্ছেদ ঘটলে রাম বাঁচবেন না। সুতরাং রামের সহিত যুদ্ধ করে নয়, কৌশলে রামকে দূরে সরিয়ে রেখে সাধুর বেশে সীতার কাছে তিনি এলেন। তাঁর আশা ছিল নিজের শক্তি ও সম্পদের পরিচয় দিলে সীতা তাঁকে গ্রহণ করবেন। তাও সীতার এক রকম অগ্নিপরীক্ষা। সে পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন, রাবণ অপমানিত হয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন। সুতরাং রাবণ তাঁকে অপহরণ করতে বাধ্য হলেন।

সীতার কুটীরে আসার পর রাবণ দম্ভভরে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি রাক্ষসরাজ রাবণ। সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত আমার মহাপুরী লঙ্কা। রাম তো সামান্য মানুষ, আমার একটি অঙ্গুলির সমানও নয়। তুমি আমাকে বরণ কর। তুমি এত সুন্দরী ; তোমার ভাগ্যে সেটা প্রাপ্য। তিনি আরও লোভ দেখালেন, তুমি যদি সম্মত হও আমি তোমাকে অগ্রমহিষী করব ; তোমাকে সকল অলঙ্কারে ভূষিত করব, তোমার জন্য পাঁচ সহস্র দাসী নিয়োগ করব। (৩৩)

৩২। অরণ্যকাণ্ড। ৩১।৩১

৩৩। অরণ্যকাণ্ড, সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশ তম সর্গ

সীতা প্রত্যুত্তরে যা বললেন তা যেমন দৃপ্তভাষায় বর্ণিত তেমন রামের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় দেয়। তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যেতে পারে। রামের গুণাবলীর পরিচয় দিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন।

ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহোচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা॥ (৩৪)

অর্থাৎ, আমি সিংহী ; তুমি জম্বুক হয়ে আমার মত দুর্লভাকে পেতে চায়। তুমি আমাকে স্পর্শ করবার ও শক্তি ধর না, যেমন সূর্যের প্রভা তোমার স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। তারপর দীর্ঘ তুলনা চলল রামের সঙ্গে রাবণের। রামের তুলনায় রাবণ কতখানি তুচ্ছ সেই কথাই নানা উপমার সাহায্যে বর্ণিত হচ্ছে।

যদন্তরং কাঞ্চনসীস লোহয়ো-
র্যদন্তরং চন্দন বারি পঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তিবিড়ালয়ো বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈবচ॥ (৩৫)

অর্থাৎ "কাঞ্চন ও সীসের মধ্যে যে পার্থক্য, চন্দনবারি ও পঙ্কের মধ্যে যে পার্থক্য, বনে হস্তী ও বিড়ালের মধ্যে যে পার্থক্য রামের সঙ্গে তোমার সেই পার্থক্য"। উপরে স্থাপিত উপমাগুলি বলে দেবে রামের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁর সম্বন্ধে সীতা কত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

উপরে স্থাপিত তথ্যগুলি বলে দেবে রামের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের ফলে রামের মধ্যে সীতা নানা মহৎগুণ আবিষ্কার করে কতখানি শ্রদ্ধা করতে পেয়েছিলেন। এই ক্রমবর্দ্ধমান শ্রদ্ধা রামের প্রতি তাঁর প্রেমকে সুদৃঢ় করেছিল।

৩৪। অরণ্যকাণ্ড। ৪৭।৩৭

৩৫। অরণ্যকাণ্ড। ৪৭।৪৬

কিন্তু এও বাহ্য ; সীতার প্রেম আরও মূল্যবান। তা অহৈতুক। তা কোনও কারণের সহিত যুক্ত নয় ; দোষ-গুণ-নির্বিশেষে রামে তাঁর প্রেম স্থিতি লাভ করেছে। তার প্রমাণ মিলবে রাবণের সহিত সীতার আর এক বাদানুবাদে। সেটা ঘটেছিল অশোক বনে হনুমানের অলক্ষিত উপস্থিতিতে। রাবণ সেখানে এসে সীতার নিকট আর একবার তাঁকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন। এবার তিনি নূতন কৌশল অবলম্বন করলেন। একদিকে সম্মতি দিলে যে বিলাসবহুল জীবন সীতার নাগালে আসবে তার লোভ দেখালেন। অপর দিকে শাসালেন যে দুই মাসের মধ্যে যদি সম্মতি না মেলে তা হলে সীতাকে প্রাতরাশ হিসাবে ভক্ষণ করবেন।

এই প্রসঙ্গেই রাবণের সপক্ষে যে রাক্ষসীগণ সীতাকে পাহারা দিচ্ছিল তারা তাঁকে কিছু উপদেশ দিল। তারা বলল, রাবণ ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর। তিনি যা বললেন তা শোনা উচিত। তারা আরও বলল

মানুষী মানুষং তং রামমিচ্ছসি শোভনে।
রাজ্যাদ্‌ ভ্রষ্টমসিদ্ধার্থং বিক্লবন্তমনিন্দিতে॥ (৩৬)

অর্থাৎ, অনিন্দিতে, আপনি মানুষ হয়ে মানুষ রামকে কেন চাইছেন ? তিনি রাজ্য হতে বঞ্চিত তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি, তিনি হতাশ হয়েছেন।

তাদের এই মন্তব্য সীতার মনে প্রচণ্ড আঘাত হানল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তখন এই কথা বললেন।

দীনো বা রাজ্যহীনো বা যো মে ভর্তা স মে গুরুঃ।
তং নিত্যমনুরক্তাস্মি যথা সূর্যং সুবর্চলা॥ (৩৭)

অর্থাৎ, দীন হক রাজ্যহীন হক তিনি আমার স্বামী, তিনি আমার গুরু ; আমি তাঁর প্রতি নিত্য অনুরক্ত, যেমন প্রভা

৩৬। সুন্দরকাণ্ড। ২৪।৫
৩৭। সুন্দরকাণ্ড। ২৪।৯

সূর্যের নিত্য অনুরক্ত। (৩৮)। সুতরাং সীতার রামের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম অহৈতুক; রামের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তার কোনও সংযোগ নাই।

সুতরাং সীতার গভীর একনিষ্ঠ প্রেমই তাঁকে রামের ছায়ার মত অনুগামিনী হবার প্রেরণা দিয়েছিল। তিনি ততখানি পতিব্রতা ছিলেন না যতখানি পতিপ্রাণা ছিলেন। তাই দেখি তিনি আত্মসম্মানবোধকে বিসর্জন দিয়ে রামের প্রতি আনুগত্য দেখাতে উৎসুক ছিলেন না। তাঁর একটি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ছিল। তাই অসঙ্গত আচরণ ঘটলে পতিকে ও ভৎসনা করতে বা প্রতিবাদ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি নিজে যে পরিপূর্ণভাবে নির্মলচরিত্র ছিলেন সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই রামের অনাদর বা অবজ্ঞা তিনি সহ্য করতেন না। তা যুক্তিহীন হলে তিনি তার সমুচিত উত্তর দিতেন। তার প্রমাণ মিলবে যুদ্ধকাণ্ডের শেষে। যুদ্ধজয়ের পর রাম তাঁকে একটি তুচ্ছ যুক্তিহীন সংস্কারের প্রভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। এ বিষয় পূর্বে সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সীতার মনে এবং আচরণে তার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমাদের প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করবে।

তিনি প্রত্যুত্তরে যা বলেছিলেন এবং করেছিলেন তার সবিস্তার বর্ণনা মিলবে যুদ্ধকাণ্ডের একশত ষোলতম সর্গে। তিনি ত জানেন যে একমাত্র হরণের সময় রাবণের সহিত গাত্র-সংস্পর্শ ব্যতীত তিনি সম্পূর্ণ অন্য পুরুষ দ্বারা অস্পৃষ্ট। সে ত তাঁর ইচ্ছাকৃত নয় দৈবই তার জন্য দায়ী। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

৩৮। যুদ্ধকাণ্ড। ১১৬।৯

যদধীনং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যামনীশ্বরী ॥ (৩৯)

অর্থাৎ, "আমার অধীন আমার মন ; তা তো তোমাতে বর্তমান। আমার গাত্র সম্বন্ধে আমি পরাধীন হলে আমি কি করতে পারি ? রামই তাঁর হৃদয় জুড়ে অধিষ্ঠিত, সেই ত বড় কথা। অনিচ্ছায় অন্যের সহিত গাত্র সংস্পর্শ ঘটলে ত তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তাই তিনি রামের যুক্তিহীন আচরণে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন এই বলে ঃ

কিং মামসদৃশং বাক্যমিদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতং প্রাকৃতামিব ॥ (৪০)

অর্থাৎ, "হে বীর, তুমি কেন এমন দারুণ রুক্ষ বাক্য আমাকে শোনাচ্ছ ? প্রাকৃত মানুষই প্রাকৃতা মানুষকে এমন কথা বলে"। রামের এই আচরণ যে পরিশীলিত মনের পরিচয় দেয় না, তা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন, আমার দুর্ভাগ্য তুমি আমার ভক্তি, আমার শীল - সবই ভুলে গেলে। এ আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেন নি! তাই 'রুদতী বাষ্পগদ্গদভাষিণী' অবস্থায় তিনি লক্ষ্মণকে এই নির্দেশ দিলেন ঃ

চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাযদাহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ (৪১)

অর্থাৎ, সৌমিত্র, আমার জন্য চিতা প্রস্তুত কর। তাছাড়া এই দুর্ভাগ্যের প্রতিকার নাই। মিথ্যা অপবাদে আহত হয়ে আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নাই। সীতার এই দৃপ্ত অথচ করুণ আচরণ তুলনায় রামকে এখানে একান্তই মলিন করে দেয়।

৩৯। যুদ্ধকাণ্ড। ১১৬।৫
৪০। যুদ্ধকাণ্ড। ১১৬।১৮
৪১। অযোধ্যাকাণ্ড। ৭৪।৬-৭

(৪)

ভরত ও লক্ষ্মণের চরিত্র

ভরত ও লক্ষ্মণের চরিত্রের আলোচনা এক সঙ্গে হওয়াই ভাল। কারণ, তাঁরা পরস্পরের সহিত তুলনীয় চরিত্র। উভয়েই রামের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা বহন করতেন। সেই কারণে উভয়ের পক্ষেই রামের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগ সম্ভব হয়েছিল। অগ্রজ ভ্রাতার প্রতি আনুগত্যে তাঁদের মধ্যে যেন পরস্পরের তুমুল প্রতিযোগিতা চলেছিল। কে যে জিতেছিলেন বলা যাবে না। উভয়েরই ভ্রাতৃপ্রেমের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর গৌরব সম্মান প্রাপ্য বলে মনে হয়।

লক্ষ্মণের আনুগত্যের পরিচয় সারা রামায়ণ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তিনি রামের নিত্যসঙ্গী। সুখে সঙ্গী দুঃখে সঙ্গী। দীর্ঘকালব্যাপী বনবাসকালে তিনি প্রাসাদের সুখের জীবন এবং পত্নী উর্মিলার সঙ্গ ত্যাগ করে রামকে সেবা করবার জন্য তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। বনবাস জীবনে সেবা দিয়ে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার জীবনকে যতখানি সম্ভব সুখকর করতে চেষ্টা করেছেন। সীতা অপহৃত হলে রাম যখন শোকে ভেঙ্গে পড়েছেন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। রাবণের সহিত যুদ্ধের সময় তিনি ভ্রাতার পাশে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন।

ভরতও ও আনুগত্যে কম যান না। তাঁর মাতার স্বার্থপরতা প্রণোদিত আচরণের ফলে রামের যুবরাজ পদে অভিষেকের পরিবর্তে চতুর্দশবৎসর ব্যাপী বনে নির্বাসন ঘটল। ভরত তার জন্য দায়ী নন। তাঁর অজ্ঞাতসারে তা ঘটেছিল। পিতার মৃত্যুর পর অযোধ্যায় এসে সব সংবাদ অবগত হয়ে তিনি মাতাকে ভর্ৎসনা করলেন। তার পর মন্ত্রীপরিষদের অনুরোধ সত্ত্বেও পিতার শূন্যসিংহাসন অধিকার করতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন

জ্যেষ্ঠেরই সিংহাসনে অধিকার। তাই রামকে অন্বেষণ করে চিত্রকূট পর্বতে তাঁর সহিত মিলিত হয়ে তাঁকে বনবাসের সংকল্প ত্যাগ করে অযোধ্যায় ফিরে এসে সিংহাসন অধিকার করতে অনুরোধ করলেন। কিছুতেই যখন রামের সম্মতি আদায় করতে পারলেন না, তখন রামের পাদুকা নিয়ে নন্দিগ্রামে স্থাপন করে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে রামের দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুপস্থিতিকালে রামের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসনের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। নিজেকে রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসের জীবন হতে দূরে রাখবার জন্যই নন্দিগ্রামে শাসন-কেন্দ্র স্থাপন করলেন এবং রামের মত জটা-চীর ধারণ করলেন। দুজনেই ভ্রাতার কারণে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

অথচ আমরা দেখি অগ্রজের প্রতি আনুগত্যের আদর্শ হিসাবে লক্ষ্মণের নাম বেশী পরিচিত। 'ভাই বলতে লক্ষ্মণ'—একথা এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আছে 'লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে' এই মন্তব্যটি আছে। যে কবি লক্ষ্মণ পত্নী উর্মিলাকে কাব্যে উপক্ষো করবার জন্য আদিকবিকে অভিযুক্ত করেছেন, তিনি নিজেও ভরতের প্রতি সুবিচার করেন নি। অপরপক্ষে আদিকবি কিন্তু ভরতকে আদৌ উপেক্ষা করেন নি। তিনি সমান নিষ্ঠার সহিত ভরত ও লক্ষ্মণের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। উভয়কেই তিনি তুল্যগুণের অধিকারী করে চিত্রিত করেছেন।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে আমরা এবার তাঁদের চরিত্র একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবার প্রস্তাব করি।

কৈকেয়ী যখন রামকে বনবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন তখন ভরত অযোধ্যায় ছিলেন না, তিনি মাতুল-আলয়ে ছিলেন। তিনি উপস্থিত থাকলে রামের নির্বাসন ও ঘটত না, পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু ও হত না। কারণ, ভরতের অগ্রজ রামের প্রতি যে আনুগত্য

এবং সিংহাসনে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে ন্যায়সম্মত ধারণা তা কিছুতেই এ অন্যায় ঘটতে দিত না।

পরে দশরথের মৃত্যুর পর বশিষ্ঠ যখন তাঁকে ডাকিয়ে পাঠান তখনও পিতার মৃত্যু সংবাদ তাঁকে জানান হয় নি। তিনি অযোধ্যায় এসে মাকে প্রণাম করলে মায়ের মুখেই তাঁর অপকর্মের কথা শুনলেন। কিন্তু তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হল তা মায়ের কাছে অভাবনীয়। ভরত বিলাপ করতে করতে মাকে তাঁর অপকর্মের জন্য কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করলেন। তিনি বললেন,

ত্বৎকৃতে মে পিতা বৃত্তো রামস্তারণ্যমাশ্রিতঃ।
অযশো জীবলোকে চ ত্বয়াহং প্রতিপাদিতঃ॥
মাতৃরূপে মমামিত্রে নৃশংসে রাজ্যকামুকে।
নতেঽহমভিভাব্যোঽস্মি দুর্বৃত্তে পতিঘাতিনী॥ (৪২)

অর্থাৎ, তোমার কারণে আমার পিতা মারা গেলেন এবং রাম অরণ্য আশ্রয় করলেন; তুমি আমাকে জীবলোকে অযশে লিপ্ত করলে। মাতা হয়েও তুমি আমার অমিত্র, তুমি নৃশংস রাজ্যলোভী মানুষ, তুমি দুর্বৃত্ত এবং পতিঘাতিনী; আমি তোমার স্নেহ চাই না।

ভরতের ন্যায়বোধ বলে পিতার মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সিংহাসনে অধিকার। তাই বশিষ্ঠ প্রভৃতি তাঁকে শূন্য সিংহাসন অধিরোহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি রামকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ছুটেলেন। অনুসন্ধান করতে করতে তিনি চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে রামকে পেলেন। রামকে পিতার মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে তিনি বললেন,

তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্তুমহমি।
অভিষিঞ্চস্ব চাদ্যৈব রাজ্যেন রাঘবানিব॥ (৪৩)

৪২। অযোধ্যাকাণ্ড ১০১।৮

৪৩। অযোধ্যাকাণ্ড ১১২।২৩-২৪

অর্থাৎ, আমি তোমার দাস; আজই সিংহাসনে অভিষিক্ত আমাকে প্রসাদিত কর।

রাম কিন্তু অবিচলিত; তাঁর পিতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন তিনি করবেনই। ভরতের শত অনুরোধ ও তাঁকে সংকল্প হতে নাড়াতে পারল না। অগত্যা তিনি প্রস্তাব করলেন রাম যতদিন না ফেরেন রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে নন্দিগ্রাম হতে তিনি রামের প্রতিনিধি রূপে কোসল রাজ্য শাসন করবেন। তাঁর মন্তব্য ছিল এই ঃ

স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষানি জটাচীরধরো হ্যহম্॥
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ॥ (৪৪)

অর্থাৎ, ভরত রামের পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম করে তাঁকে বললেন, "হে রঘুনন্দন, আমি ফল-মূল খেয়ে জীবনধারণ করে, জটা-চীর ধারণ করে নগরের বাহিরে তোমার আগমন আকাঙ্খা করে চতুর্দশ বৎসর বাস করব"। ভরতের অগ্রজের স্বার্থে এই আত্মত্যাগ এবং কৃচ্ছসাধন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এর সঙ্গে কোনও প্রতিশ্রুতি বা নির্দেশ জড়িত নেই।

লঙ্কা হতে ফিরবার পথে রাম ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে থামলেন। সেখানে হনুমানকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আগে গিয়ে শৃঙ্গবের-পুরে সখা গুহকে এবং তারপর নন্দিগ্রামে ভ্রাতা ভরতকে তাঁর আগমনের শুভসংবাদ দেন। নন্দিগ্রামে গিয়ে হনুমান ভরতকে যে অবস্থায় দেখলেন, তা আদিকাব্যে এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসন কর্শিতম্॥

৪৪। যুদ্ধকাণ্ড। ১২৫।৩০-৩১

ফলমূলশিনং দান্তং তাপসং ধর্মচারিণম্।
সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিনবাসসম্॥ (৪৫)

অর্থাৎ, হনুমান ভরতকে দেখলেন উন্নত জটাভার ধারণ করে, বল্কল এবং অজিন ধারণ করে, ফল-মূল খেয়ে তপস্বীর মত সংযত হয়ে বাস করছেন ; ভ্রাতার দুর্ভাগ্য হেতু পীড়িত হয়ে তিনি কৃশ হয়ে গেছেন এবং দেহ মলিন হয়ে গেছে। অর্থাৎ চিত্রকূট পর্বতে রামের নিকট যা বলে গিয়েছিলেন সেই কৃচ্ছ্রময় জীবন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তিনি পালন করছিলেন।

এই ছিলেন ভরত। তাঁর আত্মত্যাগের তুলনা হয় না। তাঁর এই চূড়ান্ত আত্মত্যাগের জন্য গুহ রাজা যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তা তাঁর প্রাপ্য। রামকে ফিরিয়ে আনবার পথে শৃঙ্গবেরপুরে গুহের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ভরতের কাছে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা শুনে গুহ বলেছিলেন :

ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি॥
শাশ্বতী খলু তে কীর্তির্লোকাননুচরিষ্যতি।
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি॥ (৪৬)

অর্থাৎ, তুমি ধন্য, সংসারে তোমার তুল্য মানুষ দেখিনা। তুমি অযত্নে যে রাজ্য পেয়েছিলে তা ত্যাগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছ। তুমি যে রামকে ফিরিয়ে এনে দুর্ভোগ হতে মুক্তি দিতে চাইছ, তোমার এই কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে বিশ্বে প্রচারিত হবে।

ওদিকে লক্ষ্মণ হলেন রামের বনবাস জীবনে নিত্য সঙ্গী। সেই প্রতিকূল পরিবেশে তিনি ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে যতখানি সম্ভব তাঁদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য মণ্ডিত করতে চেয়ে

৪৫। অযোধ্যাকাণ্ড। ৮৫।১২.১৩
৪৬। অরণ্যকাণ্ড।৪৫।৬

ছিলেন। পঞ্চবটীবনে নূতন করে ঘর বাঁধতে হবে সে কাজের ভার রাম দিলেন লক্ষ্মণের ওপর। উভয়ের সেবাই তখন লক্ষ্মণের একমাত্র ব্রত। তিনি একধারে তাঁদের সেবক, প্রহরী এবং সুহৃদ। এমন স্বার্থগন্ধহীন সেবার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও মিলবে না।

অথচ অদৃষ্টের এমন পরিহাস যে এহেন দেবরকে সীতা কটু কথা শুনিয়ে ছিলেন ; এমন কি এ অপবাদ ও দিয়েছিলেন যে সীতার প্রতি লোভ হেতু লক্ষ্মণ চান রাম বিপদে পড়ুন। ঘটনাটি ঘটেছিল এই পরিবেশে। রাবণ যে জাল পেতেছিলেন তাতে ধরা দিয়ে রাম যখন মায়ামৃগরূপী মারীচকে ধরতে না পেরে শরাঘাতে নিপাতিত করলেন, মারীচ তখন রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে লক্ষ্মণকে স্মরণ করেছিল। তা শুনে সীতা রামের নিরাপত্তার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে যেতে বললেন কিন্তু রামের পূর্বে দেওয়া নির্দেশ হেতু এবং রামের আত্মরক্ষার ক্ষমতায় অচল বিশ্বাস হেতু তিনি সীতার নির্দেশ মানলেন না। তখনি সীতা রুষ্ট হয়ে এই মর্মান্তিক কঠোর কথা শুনিয়ে ছিলেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

যস্ত্বমস্যা মবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপশ্যসে।
ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে॥ (৪৭)

অর্থাৎ, তুমি যে এই অবস্থায় ভ্রাতার সাহায্যের জন্য যাচ্ছ না তা বোঝায় তুমি চাও রাম বিনষ্ট হক যাতে তুমি আমাকে লাভ করতে পারো।

এই অনুযোগ এমন কুৎসিত ইঙ্গিত পূর্ণ যে লক্ষ্মণের মত সংযত ধৈর্যবান ব্যক্তিও তার প্রতিবাদ না করে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন,. বনচর জীবগণ শুনে রাখুক, আমি ন্যায়পালন করি অথচ তিনি আমাকে কি পরুষবাক্য শোনালেন ; কাণের মধ্যে তা যেন তপ্ত নারাচের মত আমাকে আঘাত করল।

৪৭। কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ।৬।২২-২৩

লক্ষ্মণ যে নীতিসম্মত জীবন যাপন করতেন তা তাঁর পরবর্তী একটি মন্তব্য হতে সুন্দর প্রমাণিত হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী সম্বন্ধে তিনি কতখানি সংযত আচরণ করতেন তার পরিচয় তাতে মিলবে। পরিবেশটি এই। সীতা অদৃশ্য হবার পর তাঁর অন্বেষনে রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমুখ পর্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলেন। সুগ্রীব বললেন আকাশপথে নীয়মান অবস্থায় এক মহিলা তাঁদের দেখে তাঁর অঙ্গ হতে কিছু ভূষণ নিয়ে ভূমিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনি সেগুলি দুই ভায়ের কাছে সনাক্ত করবার জন্য স্থাপন করলেন। ভূষণগুলি পাবার পর রাম লক্ষ্মণকে বললেন, দেখত এগুলি সীতার ভূষণ কিনা চিনতে পারছ কি? তার উত্তরে লক্ষ্মণ এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন :

নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে ॥
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ। (৪৮)

অর্থাৎ "আমি কেয়ূর দুটি চিনতে পারব না, কুণ্ডল দুটি ও চিনতে পারব না ; তবে নূপুর দুটি চিনতে পারছি। নিত্য পাদস্পর্শ করবার সময় তাদের দেখেছি।" এই মন্তব্যটি দেখিয়ে দেয় সীতার প্রতি তাঁর আচরণ যেমন শ্রদ্ধাপূর্ণ তেমন সংযত। কেয়ূর হল বাজু, বাহুর ভূষণ। কুণ্ডল হল কাণের ভূষণ। তিনি সেগুলি চিনবার ক্ষমতা রাখেন না ; কারণ সীতার বিভিন্ন অঙ্গের প্রতি তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। নূপুর তাঁর দৃষ্টিগোচর হত সীতাকে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করবার সময়। তাঁর প্রতি এইরূপ অভিসন্ধি আরোপিত হলে তিনি যে মর্মান্তিক দুঃখ পাবেন তা খুবই স্বাভাবিক।

লক্ষ্মণ শুধু রামের সেবা করতেন না ; প্রয়োজন হলে তাঁর সচিবের ভূমিকা নিতে। রামের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় প্রতিকূল অবস্থায় তিনি আত্মস্থ থাকতে পারতেন না, অধীর হয়ে

৪৮। অরণ্যকাণ্ড।৬৬।৫

পড়তেন। যেমন ঘটেছিল লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে আহত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন; বা যেমন সীতার বিরহদুঃখে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। তুলনায় লক্ষ্মণের ধৈর্যশক্তি সকল অবস্থায় অবিচলিত থাকত। সেই কারণে রামের যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটত তিনি রামকে উপদেশ দিয়ে, এমন কি ভর্ৎসনা করে আত্মস্থ হতে সাহায্য করতেন। তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্তমান আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাবার পর রাম শোকে এত কাতর হয়ে পড়লেন যে আত্মসংযম ত হারালেনই, উপরন্তু অধৈর্য হয়ে চোখের সামনে যা দেখেন তা ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁকে নানাভাবে শান্ত করতে চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। তিনি রামকে বলেছিলেন একজনের অপরাধের জন্য সকলকে ধ্বংস করা অনুচিত। তিনি বলেছিলেন দুর্ভাগ্য কেহ এড়াতে পারে না। তা আসলে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি? আরও বলেছিলেন তোমার মত শিক্ষিত, উন্নত-চরিত্র মানুষ যদি দুঃখ না সহ্য করে, সাধারণ মানুষ তা করবে কি করে? তোমার উচিত ধৈর্য ধারণ করে তাদের কাছে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই:

যদি দুঃখমিদং প্রাপ্তং কাকুৎস্থ ন সহিষ্যসে।
প্রাকৃতশ্চাল্পসত্ত্বশ্চ ইতরঃ কঃ সহিষ্যতি॥ (৪৯)

অর্থাৎ, হে কাকুৎস্থ, এই দুঃখ যদি তুমি না সহ্য কর, অল্পপ্রাণ সাধারণ মানুষ কি করে তা সহ্য করবে?

(৫)

হনুমানের চরিত্র

হনুমান সম্বন্ধে যে ধারণা সাধারণত প্রচলিত তা তাঁকে রামের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে চিত্রিত করে। আদিকবির আদিকাব্যে তাঁর

৪৯। কিষ্কিন্দাকাণ্ড। ২৩৯।

যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা প্রচলিত ধারণা হতে ভিন্ন। সেখানে তিনি একটি মহৎ চরিত্ররূপে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁর চরিত্রে বহু মহৎ গুণের দুর্লভ সমাবেশ পাওয়া যায়। তাঁর প্রজ্ঞা, নীতি-বোধ, পৌরুষ, বিচক্ষণতা, কর্তব্য-সচেতনতা এবং সর্বোপরি মনুষ্য-চরিত্রকে বোঝবার ক্ষমতা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। আদিকবি তাঁকে যেমটি এঁকেছেন তার এখানে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হবে।

হনুমানকে আমরা প্রথম দেখি কিষ্কিন্দাকাণ্ডের আরম্ভে। পরিবেশটি এই। সুগ্রীব বালী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হনুমান সহ ঋষ্যমূখ পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সীতার অন্বেষণে রাম ও লক্ষ্মণ পম্পাসরোবরে যখন আসেন, সুগ্রীব তাঁদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল তাঁরা বালী কর্তৃক প্রেরিত চর হতে পারেন। হনুমান তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে তাঁরা চর হতে পারেন না ; কারণ বালীর এ অঞ্চলে আসার ক্ষমতা নাই। তখন সুগ্রীব হনুমানকে রামের সহিত সাক্ষাৎ করে তাঁদের অভিসন্ধি কি জেনে আসতে বলেন।

হনুমান কিন্তু নিজের বিচক্ষণতার গুণে সুগ্রীবের সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার পথ পরিষ্কার করে দেন। তিনি ভিক্ষুর বেশে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিষ্ট ও বিনীত আচারণ ও শুদ্ধভাষায় আলাপ করে তিনি রামকে মুগ্ধ করে দেন। রামও তাঁর ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি দেখে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন :

নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহুব্যাহরতা যেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥ (৫০)

অর্থাৎ, ইনি নিশ্চিত সমগ্র ব্যাকারণের নানাভাবে পাঠগ্রহণ করেছেন ; এত কথা বললেন অথচ শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটল না।

৫০। কিষ্কিন্দাকাণ্ড। ২১। ২১

এইভাবে রামের মনে উচ্চধারণা উৎপাদন করে রামের বিষয় অবহিত হয়ে তিনি নিজ বেশ ধারণ করে তাঁকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। তারই ফলে সুগ্রীবের সহিত রামের মৈত্রীবন্ধন এবং বালিবধের পর কিষ্কিন্দার সিংহাসন লাভ।

হনুমান অন্যের প্রতি যেমন সহানুভূতি পূর্ণ আচরণ করতেন তেমন আদর্শ সচিব হিসাবে রাজাকে কর্তব্য কর্ম স্মরণ করিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাই দেখি বালীর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী তারা যখন শোকে ভেঙে পড়লেন হনুমান তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। তিনি বললেন, মানুষের দেহ ত বুদ্‌বুদের মত, আজ আছে কাল নেই; কাজেই কার জন্য কে শোক করবে? কশ্চ কস্যানুশোচ্যোহস্তি দেহেহ স্মিন্ বুদ্‌বুদোপমে।' (৫১)

সুগ্রীবের সিংহাসনে অভিষেকের পর বর্ষাকাল এসে পড়ায় রাম সীতা-উদ্ধারের অভিযান স্থগিত রেখে হেমন্ত পর্যন্ত প্রস্রবণগিরিতে গিয়ে বাস করবেন ঠিক করলেন। এদিকে বর্ষা শেষ হলেও সুগ্রীব রাজ্যসুখভোগে এমন ডুবেছিলেন যে সীতার অন্বেষণের কাজে মন দিতে ভুলে গেলেন। তখন হনুমান তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, মিত্রের যে কাজ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে তার সময় উত্তীর্ণ হল; এখন বৈদেহীর অন্বেষণের কাজ সুরু করা উচিত। (৫২)

এরপর দেখি সীতাকে অন্বেষণ করবার কঠিন দায়িত্বপালনের জন্য সুগ্রীব হনুমানকেই নির্বাচন করলেন। কিন্তু তা অকারণে নয়। তাঁর কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সুগ্রীবের উচ্চধারনাই তার কারণ। তাই দেখি সুগ্রীব হনুমানকে বলছেন ঃ

৫১। কিষ্কিন্দাকাণ্ড। ২৯। ২৫
৫২। কিষ্কিন্দাকাণ্ড। ৪৫। ৬

তেজসা বাপি তে ভূতং ন বাপি ভুবি বিদ্যতে।
তদ্‌যথা লভ্যতে সীতা তৎ ত্বমেবানুচিন্তয়। (৫৩)

অর্থাৎ, তেজে তোমার মত অতীতে কেউ ছিল না, এখনও নেই। সুতরাং যাতে সীতার উদ্ধার হয় সে বিষয় তুমিই চিন্তা কর।

তারপর সীতার অন্বেষণে হনুমান সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কাপুরীর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বিজ্ঞ; তাই ভাবলেন অমিত্রের দেশে তাঁর কর্তব্য হল সীতাকে খুঁজে বার করা। কাজেই খুব গোপনে চলাফেরা করতে হবে। তাই ঠিক করলেন রাত্রির জন্য অপেক্ষা করবেন। রাত্রের আঁধারে আত্মগোপন করে তিনি লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থিত প্রাসাদগুলিতে অন্বেষণ করবেন। কিন্তু রাত্রে রাবণের প্রাসাদে ঢুকে সীতাকে না দেখে হতাশ হলেন। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে মন্দোদরীর লাবণ্যমণ্ডিত মূর্তি দেখে তিনি ভাবলেন ইনিই হয়ত সীতা হবেন। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ, মানুষের চরিত্র বুঝতে পারেন। সীতার চরিত্রের যে পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়েছেন, তাতে মনে হয় না তিনি রাবণের অন্তঃপুরে আশ্রয় নেবেন। তাই স্বগতভাবে চিন্তা করলেন।

ন রামেণ বিযুক্তা সা স্বপ্তুমর্হতি ভামিনী।
ন ভোক্তুং নাপ্যলঙ্কর্তুং ন পাপমুপসেচিতম্॥ (৫৪)

অর্থাৎ, রাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি এখানে শয়ন করতে বা আহার করতে বা অলঙ্কার ধারণ করতে বা পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারেন না।

তারপর যেখানে অন্তঃপুরবাসণীরা শুয়ে নিদ্রাভোগ করছিলেন সেখানে আরও কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে তাঁর নীতিবোধ সচেতন হয়ে

৫৩। সুন্দরকাণ্ড। ১১। ২
৫৪। সুন্দরকাণ্ড। ১১। ৩৮

উঠল। তাঁর মনে হল নিদ্রিত অবস্থায় পরস্ত্রীকে অবলোকন ধর্মসম্মত হবে না। তাই সীতার অন্বেষণে প্রাসাদসংলগ্ন উপবনে গেলেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্।
ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্মলোপং করিষ্যতি॥ (৫৫)

সীতার অন্বেষণে যাবার আগেই মনে হয় হনুমানের রাম ও সীতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ঘণীভূত হয়েছিল। তা সম্ভব ; কারণ, ইতিমধ্যে রামের মুখে সীতার পরিচয় লাভ করে এবং রামের বীর্য ও মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে হনুমানের উভয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক হয়ে থাকবে। তাই অশোকবনে অন্বেষণের আগে সাফল্যকে নিশ্চিত করবার জন্য তিনি কতকগুলি বৈদিক দেবতাকে নতি জানালেন এবং অতিরিক্তভাবে প্রণাম জানালেন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে। (৫৬) এরপর দেখি রামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এত ঘণীভূত হল যে যখন তিনি রাবণের নিকট রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় স্থাপিত হলেন, তিনি নিজেকে রামের দাস এবং দূত বলে পরিচিত করলেন। (৫৭)

যুদ্ধকাণ্ডের আরম্ভে হনুমানের লোকচরিত্র বোঝবার ক্ষমতার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যখন রাবণ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে বিভীষণ রামের কাছে আশ্রয় নিতে এলেন, সুগ্রীব তাঁকে রাবণের চর বলে সন্দেহ করে হত্যা করবার উপদেশ দিলেন। রাম তখন এ বিষয় হনুমানের পরামর্শ চাইলেন। হনুমান বললেন, বিভীষণের আচরণে তিনি কোনও দুষ্টতা লক্ষ্য করেন নি, তাঁর বদন প্রসন্ন ; সুতরাং তাঁর ধারণায় বিভীষণ ছলনা করতে আসেন নি। তিনি আরও বললেন, রামের বীর্যের খ্যাতি এবং ইতিপূর্বে বালীকে

৫৫। সুন্দরকাণ্ড। ১১। ২৯

৫৬। যুদ্ধকাণ্ড। ১৭। ৫৮

৫৭। রামদাসস্য দূতস্য বানরস্য। সুন্দরকাণ্ড। ৫৯। ৩৮

বধ করে তাঁর অনুজ সুগ্রীবকে শূন্য সিংহাসনে স্থাপনের সংবাদ শুনে সম্ভবত সিংহাসন প্রাপ্তির আশায় রামের আশ্রয় নিতে এসেছেন। সম্পর্কিত মন্তব্যটি এই ঃ

দৌরাত্ম্যং রাবণে দৃষ্টা বিক্রমং চ তথা ত্বয়ি।
যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ॥ (৫৮)

অর্থাৎ, "রাবণের দৌরাত্ম্য দেখে এবং আপনার বিক্রম জেনে তাঁর এখানে আগমন তাঁর স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।" হনুমান যে বিভীষণের গুপ্ত বাসনা ঠিক ধরেছিলেন তা বিভীষণের পরবর্তী আচরণ হতে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

হনুমানের চারিত্রিক গুণ যিনি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তিনি হলেন সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্না সীতা। তাঁর অপহরণের গ্লানি ও দুর্ভোগ হতে মুক্তির মূল কারণ যে রামের বীর্য তা স্বীকার্যঃ তবু হনুমানের পৌরুষ, বিচক্ষণতা এবং আনুগত্য না মিললে তা সম্ভব হত না। সীতা তা বুঝেছিলেন। তাই দেখি মহিষীপদে অভিষিক্ত হবার পর সীতা তাঁর গলার হার খুলে হনুমানকে পুরস্কৃত করেছিলেন। আর উদারচেতা গুণগ্রাহী রাম তাঁর অনুমোদন জানিয়েছিলেন এই বলে ঃ

তেজো ধৃতির্যশো দাক্ষ্যং সামর্থ্যং বিনয়েনয়ঃ।
পৌরুষং বিক্রমো বুদ্ধি র্যস্মিন্নেতানি নিত্যম্॥ (৫৯)

অর্থাৎ, তেজ, ধৃতি, যশ, দক্ষতা, সামর্থ্য, বিনয়, রাজনীতি, পৌরুষ, বিক্রম এবং বুদ্ধি—যাঁর মধ্যে এতগুলি গুণের নিত্য সমাবেশ। তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্য।

৫৮। যুদ্ধকাণ্ড ১২৮।৮২
৫৯। সুন্দর কাণ্ড।৩৭।৯

(৬)

বিভীষণের চরিত্র

বিভীষণ আবহমান কাল একটি কলঙ্কলিপ্ত চরিত্র রূপে প্রচারিত। তা অকারণে নয়। তিনি স্বজাতিকে ত্যাগ করে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তা সুনীতিদ্বারা সমর্থিত নয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তাঁর পক্ষ হতেও কিছু বলবার ছিল। অপরের পত্নী অপহরণ করা এবং প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকার করা ন্যায়সম্মত আচরণ নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই তিনি আত্মপক্ষ ত্যাগ করে-ছিলেন এমন কথাও তাঁর সমর্থনে বলা যায়।

কিন্তু আদিকবি তাঁর যে চরিত্র এঁকেছেন তাতে এইরূপ মহৎ আদর্শের প্রেরণায় স্বজাতিবর্জনের সমর্থনের সুযোগ মিলবে না। সুতরাং বাল্মীকি রচিত রামায়ণের মধ্যে বিভীষণের এই দুর্নামের ভিত্তি মিলে যাবে। তবে আদিকবি যে চরিত্রটি ফুটিয়েছেন তাতে বিভীষণ ঠিক রাহুগ্রস্ত চন্দ্রে পরিণত হন না। তিনি প্রথমে নীতিবোধ প্রণোদিত হয়েই রামের সপক্ষে কাজ করেছিলেন। কাজেই প্রথম হতেই তিনি স্বার্থবোধ দ্বারা পরিচালিত হন নি। পরে পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে স্বার্থবোধ প্রবল হয়ে তাঁকে কলঙ্কিত করে। সুতরাং বিভীষণের চরিত্র পরিবর্তনশীল; তার মধ্যে একটি অধোগতির ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে রামায়ণের প্রাসঙ্গিক অংশ স্থাপন করবার প্রস্তাব করি।

রাম লঙ্কা আক্রমণ করবার পূর্বেই যে বিভীষণ সীতার কল্যাণ কামনা করে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করেছিলেন, তার প্রমাণ সীতার মুখেই মিলবে। সুন্দরকাণ্ডে পাই সীতা হনুমানকে বলছেন যে তিনি বিভীষণের কন্যার নিকট শুনেছেন যে সীতাকে নিপীড়ন হতে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর পিতা বিভীষণ ভ্রাতা রাবণের নিকট অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাতে ফল হয় নি। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই :

বিভীষণেন চ ভ্রাত্রা মম নির্যাতনং প্রতি।
অনুনীতঃ প্রযত্নেন ন চ তৎ কুরুতে মতিম্ ॥ (৬০)

অর্থাৎ, ভ্রাতা বিভীষণ যত্ন সহকারে আমার নির্যাতন সম্পর্কে প্রতিকারের জন্য অনুনয় করেছিলেন; কিন্তু রাবণ সে বিষয়ে মনোযোগ দেন নি।

তা হলে দেখা যায় প্রথম অবস্থায় বিভীষণের একটি স্বকীয় নীতি-বোধ ছিল। লঙ্কা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনার আগেই তিনি তা না হলে সীতার মুক্তি চাইবেন কেন? আরও প্রমাণ আছে। হনুমান যখন লঙ্কায় নানা উৎপাত করবার পর রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় রাবণের নিকট স্থাপিত হলেন, রাবণ তাঁর বধের আদেশ দিলেন। বিভীষণ তখন আপত্তি জানালেন এই বলে হনুমান যখন রামের দূত তাঁকে বধ করা নিয়ম বিরুদ্ধ। 'দূতা ন বধ্যাঃ সমরেষু রাজন্।' (৬১) রাবণ সে উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর লেজে আগুন জ্বালিয়ে মুক্তি দিয়েছিলেন।

তারপর রাম যখন সসৈন্যে লঙ্কায় অভিযানের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের দক্ষিণ-তীরে উপস্থিত হলেন, বিভীষণ রীতিমত বিচলিত হলেন। তাই রাবণকে বারবার সীতাকে মুক্তি দিয়ে যুদ্ধ বর্জন করতে চাইলেন। স্পষ্টই বোঝা যায় তখনও তাঁর উদ্দেশ্য স্বার্থজড়িত ছিল না। অন্যায়ের প্রতিকার এবং রামের বিক্রমের সহিত সংঘর্ষ ঘটলে স্বজননাশ আশঙ্কাই তাঁকে বেশী বিচলিত করেছিল। বিভীষণ রাবণকে বলেছিলেন,

ন হি ক্ষমং বীর্যবতা তেন ধর্মানুবর্তিনা।
বৈরং নিরর্থকং কর্তুং দীয়তামস্য মৈথিলী ॥ (৬২)

৬০। সুন্দরকাণ্ড। ৫২। ১৩
৬১। সুন্দরকাণ্ড। ৫২। ১৩
৬২। যুদ্ধকাণ্ড। ৯। ৬৬

অর্থাৎ, রাম বীর্যবান, ধর্ম তাঁর সহায়, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা অর্থহীন ; মৈথিলীকে ফিরিয়ে দেওয়া হক।

রাবণ কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। আত্মবিশ্বাসে অটল হয়ে তিনি বললেন, ভয়ং ন পশ্যামি কুতাশ্চিদপ্যহম্। আমি ত কোথাও ভয় দেখি না। সুতরাং 'ন রাঘবঃ প্রাপ্স্যতি জাতু মৈথিলীম্'। রাঘব মৈথিলীকে ফিরিয়ে পাবে না। এখানে বিভীষণের উপদেশ যে সুবুদ্ধিপরিচালিত এবং স্বার্থগন্ধহীন, তা বেশ অনুমান করা যায়।

পরে বিপদ যখন আরও ঘনিয়ে এল রাবণ পরামর্শের জন্য সভা ডাকলেন। সেখানেও বিভীষণ আবার উপদেশ দিলেন যে স্বজাতির স্বার্থে এবং লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস হতে রক্ষা করার জন্য সীতাকে মুক্তি দেওয়া উচিত :

ইদং পুর্যাস্য সরাক্ষসস্য রাজ্ঞশ্চ পথ্যং সুহৃদ্জনস্য।
সম্যগ্ হি বাক্যং স্বমতং ব্রবীমি নরেন্দ্রপুত্রায় দদাতু মৈথিলী ॥ (৬৩)

অর্থাৎ, আমি সুহৃদ হিসাবে আমার অভিমত বলছি ; এই পুরীর এবং সকল রাক্ষস সহ রাজার কল্যাণের জন্য নরেন্দ্রপুত্রের কাছে সীতাকে প্রত্যর্পণ করা উচিত।

রাবণের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন :

ন ব'সেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবসেৎ শত্রুসেবিনা ॥ (৬৪)

অর্থাৎ, শত্রুর সহিত বাস করতে নেই; সর্পের সহিত বাস করতে নেই, আর বাস করতে নেই সেই মিত্রের সহিত যে শত্রুকে ভজন করে।

বিভীষণের প্রতিক্রিয়া বেশ সংযত এবং প্রশংসাযোগ্য। তিনি

৬৩। যুদ্ধকাণ্ড। ১৫। ২১
৬৪। যুদ্ধকাণ্ড। ১৬। ২

বললেন, আমি বুঝি যে জ্যেষ্ঠ পিতার মত মাননীয়। কিন্তু তিনি যদি ধর্মপথে না থাকেন; তা হলে তাঁর পরুষ বাক্য ক্ষমার যোগ্য নয়। (৬৫) তারপর তিনি ঠিক করলেন লঙ্কা ত্যাগ করবেন। যাবার আগে বললেন:

আত্মানং সততং রক্ষ পুরীং চেমাং সরাক্ষসাম্।

স্বস্তি তেঽস্তু ক্ষমিষ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা॥ (৬৬)

অর্থাৎ, "আমি চললাম। নিজেকে, লঙ্কাপুরীকে ও তার অধিবাসী রাক্ষসদের রক্ষার ব্যবস্থা কোরো। তোমার মঙ্গল হক তুমি আমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুখী হও।" এই শালীনতা মণ্ডিত আচরণ সত্যই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বিভীষণের মনে তখনও স্বার্থবোধ সঞ্চারিত হয় নি।

রাবণ যে বিভীষণকে ঠিক বিতাড়িত করেছিলেন তা নয়; কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। তাই দেখা যায় বিভীষণ চারজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে রামের শিবিরে এসে উপস্থিত হলেন। তাকে বন্দী করে রামের কাছে স্থাপন করা হল। সুগ্রীব উপদেশ দিলেন তাঁর শত্রুপক্ষের চর হওয়াই সম্ভব; সুতরাং তাঁকে বধ করা হক। তখন বিভীষণ ঠিকই বললেন যে তিনি বিতাড়িত হননি; কিন্তু অপমানিত হয়ে রামের কাছে এসেছেন। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই:

সোঽহং পরুষিতস্তেন দানব রাজেনাবমনিতঃ।

ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ॥ (৬৭)

অর্থাৎ, আমি রাবণ কর্তৃক তিরস্কৃত ও অপমানিত হয়ে, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে রামের শরণার্থী হয়েছি।

৬৫। যুদ্ধকাণ্ড ১৬। ১৯

৬৬। যুদ্ধকাণ্ড। ১৬। ২৬

৬৭। যুদ্ধকাণ্ড। ১৭। ১৬

রাম তখন হনুমানকে তাঁর মত কি জানতে চাইলেন ; বিভীষণ কি চর না সত্যই আশ্রয়প্রার্থী। হনুমান মনুষ্যচরিত্র ভাল বোঝেন। তিনি যে অভিমত দিলেন, তা তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। তিনি বললেন বিভীষণের বচনে দুষ্টতার আভাষ নেই এবং মুখের উপর প্রসন্নভাব পরিস্ফুট ; সুতরাং তিনি চর নন। আরও বললেন রাবণের অসদাচরণ দেখে এবং রামের বিক্রমের পরিচয় পেয়ে তাঁর বুদ্ধিতে রামের আশ্রয় প্রার্থনা করাই স্বাভাবিক। কেন স্বাভাবিক মনে করলেন তারও তিনি সুন্দর যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বিভীষণ লক্ষ্য করেছেন আপনার উদ্যোগে বালী হত হয়ে সুগ্রীব তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে ও আপনার পক্ষে যোগ দিলে, তাঁর লঙ্কার সিংহাসন পাবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ভেবে, চিন্তা করে রাজ্যলাভের আশায় তিনি এখানে এসেছেন। (৬৮)

হনুমানের অনুমান যে আভ্রান্ত তার পরিচয় মিলবে পরবর্তীকালে বিভীষণের আচরণ হতে। পরিবেশটি এই। লঙ্কার যুদ্ধের প্রথম দিকে ইন্দ্রজিৎ যখন অদৃশ্য থেকে রাম ও লক্ষ্মণকে শরাহত করে অজ্ঞান অবস্থায় নাগপাশে বদ্ধ করে চলে গেলেন, বিভীষণ ভাবলেন রাম বোধ হয় মারা যাবেন। তাই তিনি বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন। সে বিলাপ রামের প্রতি ভক্তিহেতু নয়, নিজের রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কায়। বিভীষণের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এই :

তাবিমৌ দেহনাশায় প্রযুক্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
জীবন্নস্থ বিপন্নোঽস্মি নষ্টরাজ্যমনোরথঃ॥ (৬৯)

অর্থাৎ, এই পুরুষর্ষভদ্বয় মরণোন্মুখ অবস্থায় সংজ্ঞা হারিয়েছেন ;

৬৮। রাজ্যং প্রার্থয়মানস্তু বুদ্ধিপূর্বমিহাগতঃ। যুদ্ধকাণ্ড। ১৭। ৩৯
৬৯। যুদ্ধকাণ্ড। ৫১। ১৯

ফলে আমি বিপদে পড়েছি; আমার রাজ্য পাবার আশা বিনষ্ট হতে চলেছে।

সুতরাং লোভের প্রভাবে বিভীষণের চরিত্রের অবনতি ঘটল। তিনি রাবণের হিতাকাঙ্ক্ষী রইলেন না। রাজ্যপ্রাপ্তির লোভে তিনি রাবণের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। তাই ঐকান্তিক উৎসাহের সহিত নিকুম্ভিলায় লক্ষ্মণকে নিয়ে এলেন যজ্ঞের সমাপ্তির পূর্বেই ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে। সেখানে ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যকে ভৎর্সনা করে যা বললেন, তাতে বিভীষণের মুখোস খুলে গিয়ে তাঁর প্রকৃত রূপ প্রকট হয়ে পড়ল। তিনি বললেন, হে দুর্মতি, জ্ঞাতিত্ব, সৌহার্দ্য, সজাতিত্ব, সহোদরত্ব, এমন কি ধর্মও তোমার কদর্য আচরণে বাধা দিতে পারল না, এমনই তুমি অধার্মিক। (৭০)

তিনি আরও বললেলেন, তোমাকে আমি অনুকম্পা করি। তুমি স্বপক্ষ ত্যাগ করে পরের ভৃত্যত্ব গ্রহণ করেছ বলে সাধুরা তোমার নিন্দা করবেন। তাঁর মন্তব্যটি মূল সংস্কৃতে শুনে নেওয়া যেতে পারে।

শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বৃত্তে নিন্দনীয়স্তু সাধুভিঃ।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ॥ (৭১)

বিভীষণ তার সমুচিত উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি একটি দুর্বল যুক্তি দেখালেন। বললেন, যে আত্মীয় ধর্ম ও শীল হতে ভ্রষ্ট হয়ে পাপে মজ্জিত হয়, তাকে বিষের মত ত্যাগ করাই উচিত। একথা তাঁর মুখে সাজত যদি তিনি রাজ্যলাভের আশায় রামের পক্ষে যোগ না দিতেন।

৭০। যুদ্ধকাণ্ড। ৬৭। ১৫
৭১। যুদ্ধকাণ্ড। ৬৭। ১৬

তবু বিভীষণ ত মানুষ। তাই আত্মীয়ের জন্য মমতাবোধ তাঁর একেবারে শিথিল হয়ে যায়নি। রক্তের টান বলে একটি জিনিস সত্যই আছে। তাই দেখি তিনি নিকুম্ভিলা চৈত্যে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করেননি এবং রণক্ষেত্রে যখন রামের শরে বিদ্ধ হয়ে রাবণ নিহত হলেন তখন বিভীষণ বিলাপ করেছিলেন। সে বিলাপে কোনও কপটতা ছিল না।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির উপর রামায়ণের প্রভাব

(১)

রামায়ণের প্রকৃতি

রামায়ণকে অনেকে এপিক নামে চিহ্নিত করেন। শব্দটী পাশ্চাত্য ভাষা হতে ধার করা। তাই তা রামায়ণের প্রকৃত পরিচয় দেয় না। এপিক-এর সংজ্ঞা হল : তা একটি দীর্ঘ কবিতা; একটি কাহিনী তার আলোচ্য বিষয়; তার উপজীব্য হল শৌর্যের পরিচায়ক কীর্তি; এবং তার বর্ণনারীতি উৎকৃষ্ঠ ধরণের হবে। হোমারের ইলিয়ড এই সংজ্ঞার সুন্দর উদাহরণ; কিন্তু রামায়ণ নয়। অনেকগুলি লক্ষণ হয়ত মিলবে; কিন্তু রামায়ণের যুদ্ধ-কাহিনী মূখ্য আলোচ্য বিষয় নয়। তা আনুষঙ্গিক। তাতে যে চরিত্রগুলি স্থাপিত করা হয়েছে তারা মহৎগুণের অধিকারী। সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, উদারতা, প্রেমে একনিষ্ঠতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণ তাতে বীরত্ব অপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে।

অনেকে তাকে মহাকাব্যও বলেন। কিন্তু এই শব্দটির একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। যখন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র রীতিমত বিকশিত হয় তখন এই শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা সুরু হয়। তার সংজ্ঞা বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত 'সাহিত্যদর্পণে' দেওয়া আছে। তা এত জটিল যে তা এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন দেখিনা। সংক্ষেপে বলা যায় তাতে যে লক্ষণগুলির উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে আছে রচনাটি সর্গাকারে বিন্যস্ত হবে, এক বা বহু নায়ক থাকবে, এক বা বহু রসকে তা

আশ্রয় করবে, ঐতিহাসিক ঘটনা বা সজ্জন আশ্রিত বিষয় তার আলোচ্য হবে। দেখাই যায় সংজ্ঞাটি ব্যাপক এবং সুস্পষ্ট পরিচয় দেয় না। কাজেই রামায়ণকে মহাকাব্য বললেও তার ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না।

এক্ষেত্রে মহাকবি বাল্মীকি তার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে মনে হয়। তিনি তাকে 'আদিকাব্য' নাম দিয়েছিলেন। তাই হল তার প্রকৃত পরিচয়। তার প্রকৃতি কিছুটা এপিক-এর অনুরূপ, কিছুটা মহাকাব্যের অনুরূপ। তবে তাই হল সংস্কৃত সাহিত্যে রচিত প্রথম কাব্য। সুতরাং আদি-কাব্য রূপেই আমরা তাকে চিহ্নিত করব।

রামায়ণ শুধু আদিকাব্য নয়; তা অসাধারণ কাব্য। এই দীর্ঘ কাহিনীতে মানব হৃদয়ে যত রকম অনুভূতির দ্বারা আলোড়িত হয় তাদের পরিচয় মিলবে। মহৎ চরিত্র আছে, হীন চরিত্র আছে, তাদের সংঘাত আছে, কিন্তু তাদের অতিক্রম করে মানবিক মহত্ত্বের উৎকর্ষ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার সাহিত্যিক গুণও বেশ উচ্চমানের। এই সব কারণে রামায়ণের ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব শুধু ব্যাপক নয় দীর্ঘস্থায়ী; তা এখনও ক্রিয়াশীল।

সেই দিক হতে বিবেচনা করলে রামায়ণেয় সমস্থানীয় সমকালীন বা সমপ্রকৃতির কাব্য তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা রাখেনা। তা অনন্য; তার সমস্থানীয় দ্বিতীয় কাব্য পাওয়া যাবে না। এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে বিশ্বের অন্য ভাষায় রচিত প্রাচীন আদিকাব্যের সহিত তার তুলনা করলে। এইপ্রসঙ্গে দুটি বিখ্যাত আদিকাব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সে দুটি গ্রন্থ হল হোমার কর্তৃক গ্রীক ভাষায় রচিত 'ইলিয়ড' এবং ভার্জিল কর্তৃক লাতিন ভাষায় রচিত 'ইনিয়ড'। দুটি গ্রন্থই এপিক নাম দ্বারা চিহ্নিত।

প্রথমে ইলিয়ডের কথা ধরা যাক ; কারণ তা এদের মধ্যে প্রাচীনতর। তার লেখক হিসাবে হোমারের নাম উল্লেখ করা হয়। প্রবাদ অনুসারে তিনি এক অন্ধ কবি, খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর মানুষ। অনেকের মতে তিনি আরও প্রাচীন কালের মানুষ ছিলেন। এক শ্রেণীর গবেষকদের মতে 'ইলিয়ডের' কাহিনী ভাটদের মুখে মুখে প্রচারিত হত এবং সম্ভবত হোমার সেগুলি একত্রিত করেন।

ট্রয় নগরীর আর এক নাম ছিল ইলিয়াম। কাহিনীটি এই নগরীর অবরোধকে বিষয় করে রচিত বলে তার নাম হয়েছে 'ইলিয়ড'। ট্রয়কে নিয়ে যুদ্ধ দশ বৎসর ধরে চলেছিল। কাহিনীর আলোচ্য বিষয় শেষের কয়েকটি দিনের ঘটনা।

প্রাচীন গ্রীসে দেবতাদের সঙ্গে মানুষের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। দেবতারা ব্যবহার করত শক্তিমান স্বার্থপর ভোগবিলাসী মানুষের মত। তাই দেখি 'ইলিয়ডের' কাহিনী দেবতাদের মধ্যে কলহ দিয়ে সুরু। হেরা, এথিনা এবং এফ্রোদিতে তিন জন ক্ষমতাবতী দেবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিবাদ ঘটাবার জন্য অপর এক দুষ্টবুদ্ধি দেবতা এক ভোজসভায় একটি আপেল স্থাপন করলেন এবং বললেন, যে দেবীটি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বিবেচিত হবেন সেটি তাঁর প্রাপ্য হবে। এই সম্মানের জন্য এই তিন দেবতার মধ্যে বিবাদ সুরু হয়ে গেল। তখন বিচারের ভার পড়ল ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের পুত্র প্যারিসের উপর। তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার সুযোগ পেলেন না। তিনজন দেবতা তাঁকে নিজেদের পক্ষে রায় দেবার জন্য চাপ দিলেন বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে। হেরা বললেন তাঁর পক্ষে রায় দিলে প্যারিসকে সীমাহীন ক্ষমতার অধীশ্বর করবেন। এথিনা বললেন, তিনি দেবেন অনন্যসাধারণ কীর্তি। এফ্রোদিতে বললেন তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে তাঁর অঙ্কশায়িনী করবেন। প্যারিসের নিকট তৃতীয়

উৎকোচটি সব থেকে লোভনীয় মনে হল। সুতরাং তিনি এফ্রোদিতের সপক্ষে রায় দিলেন। এই ঘটনা হতেই কাহিনীর সুরু।

মেনেলাউস ছিলেন স্পার্টার রাজা তাঁর রাণী হেলেন ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী। প্যারিস এসে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। হেলেনের সঙ্গে তাঁর প্রেম হল। তিনি প্যারিসের সঙ্গে ট্রয় সহরে পালিয়ে গেলেন। গ্রীসের রাজারা এই অপমানের প্রতিকার চাইলেন, দাবী করলেন হেলেনকে ফিরিয়ে দেওয়া হক। হেলেন কিন্তু ফিরে আসতে রাজী হলেন না। সুতরাং গ্রীসের রাজারা এগামেমননের নেতৃত্বে ট্রয় অবরোধ করলেন। দশ বছর যুদ্ধ হল। শেষে দুই পক্ষের শ্রেষ্ঠ বীর হেক্টর ও একিলিস যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। তবু যুদ্ধের নিষ্পত্তি হল না। শেষে ইথাকার রাজা ইউলিসিস যে কৌশল প্রয়োগ করলেন তাতে ট্রয়ের পতন হল।

কাহিনীটির সাহিত্যিক গুন আছে, বীর্যের দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করবার মত কোনও মহৎ গুনের পরিচয় নাই। ইউলিসিসের চাতুর্য আমাদের মুগ্ধ করে, হেক্টর এবং একিলিসের বীরত্ব আমাদের অভিভূত করে; কিন্তু ওই পর্যন্ত। প্রাচীন গ্রীক জাতির চরিত্র এবং আদর্শের সঙ্গে তা সঙ্গতি রক্ষা করে। তারা ছিল বীর এবং ভোগী। ধীশক্তিতে তারা ধনী ছিল। তার কিছু আভাস ইউলিসিসের চরিত্রে মিলবে। কিন্তু চারিত্রিক মহত্বে তারা একান্তই দরিদ্র ছিল। প্রেমে একনিষ্ঠতা বা সত্যপরায়ণতার বিশেষ মূল্য তারা দিত না। এমন কি দেবতাদের মধ্যে ও নৈতিক গুণের কোনও পরিচয় মিলিতনা।

রামায়ণের প্রকৃতি কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের। তাতে বীর্যের পরিচয় আছে প্রচুর; কিন্তু বেশী আছে চরিত্রগুণের পরিচয়। তার মূল চরিত্রগুলি বহু মহৎগুণের দ্বারা চিহ্নিত। ঠিক বলতে কি

রামায়ণের কাহিনী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। সেকালের মানুষ বীর্যবান ছিল; কিন্তু তারা বেশী মূল্য দিত সুনীতি সম্মত আচরণের উপর। তারা বিশেষ ভাবে নীতি সচেতন ছিল। সেই কারণে রামায়ণের সাহিত্যিক উৎকর্ষ আমাদের যতখানি মুগ্ধ করে, তার থেকে বেশী মানব চরিত্রের মহত্বের পরিচয় দিয়ে আমাদের মনকে উন্নীত করে।

এবার 'ইনিয়াডের' আলোচনা করা যাক। এই কাব্যখানি ভার্জিল কর্তৃক লাতিন ভাষায় রচিত। তিনি প্রথম রোমান সম্রাট অক্টেভিয়াস সীজারের সমসাময়িক ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মানুষ।

তাঁর রচিত কাব্য 'ইনিয়ডের' কাহিনী ট্রয়ের যুদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত। ইলিয়ডের কাহিনীর যেখানে শেষ এই কাহিনীর সেখানে শুরু। এই কাহিনীর নায়ক ইনিয়াস ট্রয়বাসী ছিলেন। ট্রয়ের পতনের পর তিনি পলাতক হলেন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে স্থলে এবং জলপথে নানা দেশে ঘুরতে ঘুরতে জাহাজডুবী হাওয়ায় তিনি উত্তর আফ্রিকার কার্থেজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানকার রানী ডিডো তার প্রেমে পড়েন; কিন্তু ইনিয়স সে প্রেম প্রত্যাখান করে কার্থেজ ত্যাগ করেন। মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ডিডো আত্মহত্যা করেন। এদিকে ইট.লীর অন্তর্ভুক্ত লাটিয়াম রাজ্যে এসে রোমের রাজা লাটিনাসের কন্যা লাভিনিয়াকে বিবাহ করে রোমান নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পান। প্রতিবেশী রাজ্য ইট্রাস্কার সহিত যুদ্ধে তিনি রোমানদের সপক্ষে যুদ্ধ করেন। সেখানেই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান; তাঁর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাঁর বীরত্বের জন্য রোমানরা তাঁকে দেবতার মর্যাদায় উন্নীত করে তাঁর পূজা করতেন।

উভয় কাহিনীই যথাক্রমে গ্রীক ও লাতিন ভাষার প্রথম কাব্য হওয়ায় একটি বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। উভয় কাব্যের পরবর্তী-

কালের স্বদেশী সাহিত্যের উপর প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। বিশেষ করে ইনিয়ড প্রথম বিখ্যাত ইটালীয় কবি ডাণ্টের বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ ছিল; তিনি ভার্জিলকে তাঁর গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই পর্যন্তই। তার অতিরিক্ত ভাবে অন্য ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না। সম্ভবত তার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত প্রাচীন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির উপর পরবর্তীকালে ছেদ পড়ে গিয়েছিল। খৃষ্টধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে পেগান (Pagan) ধর্ম আশ্রিত এই সংস্কৃতি দুটি লোপ পেয়ে যায়। ফলে তার ধারাবাহিকতা ছিলনা। দ্বিতীয়ত দুটি গ্রন্থই কোনও মহৎ মানবিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়।

দেখা যাবে এক মাত্র মহাভারতের সঙ্গেই রামায়ণের তুলনা চলে। উভয়েই শুধু আদিকালের কাব্য নয়, মহৎ কাব্য। নানা বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। উভয়ের পরিবেশ একই। উভয়েই এক উচ্চ নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজের বিবরণ দিয়েছে। তাই সেখানে অনেকগুলি আদর্শ চরিত্র মিলবে। উভয়ের মধ্যে আর একটি বিষয়েও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কাহিনী দুটিতে যে দুটি প্রধান চরিত্র পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে এমন বহু মহৎ সমাবেশ হয়েছে যে পরবর্তীকালে সংযোজনের সাহায্যে তাঁদের অবতারের পদে উন্নীত করা হয়েছে। তাই তাদের প্রভাব ব্যাপক, স্থায়ী এবং বর্তমান কালেও ক্রিয়াশীল।

(২)

রামায়ণের প্রভাব

রামায়ণের প্রভাব তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়ঃ সাহিত্যে, লোকসংস্কৃতিতে এবং তৃতীয়তঃ নৈতিক চেতনার পরিস্ফূটণে। তিনটি ক্ষেত্রেই রামায়ণের প্রভাব বর্তমান কালেও সক্রিয় আছে।

প্রথমে সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব আলোচনা করা যেতে পারে। সে প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং এখনও ক্রিয়াশীল। তাই দেখি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন আঞ্চলিক ভাষা গড়ে উঠেছিল তখন তাদের আশ্রিত সাহিত্যের বিকাশে রামায়ণ বিশেষ সহায়তা করেছিল। এই কারণে তার সাহিত্যের উপরে প্রভাবের আলোচনা দুই ভাগে বিভক্ত করে নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একটির আলোচ্য বিষয় হবে সংস্কৃত সাহিত্যের উপর প্রভাব এবং অপরটির হবে আঞ্চলিক সাহিত্যের উপর প্রভাব।

সংস্কৃত-সাহিত্যে পরবর্তীকালে যে গ্রন্থগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধলাভ করেছে তাদের অনেকগুলির উপজীব্য এই রামায়ণের কাহিনী। এই প্রসঙ্গে কালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্য, ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিত' নাটক এবং 'ভট্টি কাব্যের' উল্লেখ করা যেতে পারে। 'রঘুবংশের' একটি বিরাট অংশ ব্যাপ্ত করে আছে রামের কাহিনী। রামের সময় যেন রঘুদের বংশ কীর্তির শিখরে উঠেছিল; তাই স্বভাবতই রামকাহিনীকে এতখানি প্রধান্য দেওয়া হয়েছিল। রঘুবংশে মোট উনিশটি সর্গ আছে। তাদের মধ্যে ছয়টি সর্গ রামের কাহিনী বর্ণনায় নিবেদিত।

ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। সেখানে সীতার বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসনের কাহিনীই মূল ঘটনা। করুণ রসের এমন পূর্ণাঙ্গ চিত্র অন্য কোনও গ্রন্থে দেখা যায় না। এ বিষয় বিশ্বসাহিত্যে এই নাটকটি অনন্য। মূল রামায়ণ কাহিনীতে সীতা ও রামের গভীর প্রেম এবং নানা কারণে সংঘঠিত বিরহজাত দুঃখ করুণ রসের উৎসস্বরূপ। তাই ভবভূতি তাঁর নাটকে তাকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছেন।

ভট্টিকাব্যের আলোচ্য বিষয় রামের জীবন কথা। যদিও তা সংস্কৃত-ব্যাকরণ শিক্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত, তা নীরস নয়;

তা কাব্যগুণে সমৃদ্ধ। রামের কাহিনীতে তার সকল উপাদান মেলে বলে কবি ভট্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

আঞ্চলিক সাহিত্যকে ও রামায়ণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ঠিক বলতে কি আঞ্চলিক সাহিত্যের শৈশবে রামায়ণ কাহিনীর আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তর তাদের উৎকর্ষসাধনে বিশেষ সহায়তা করেছিল। তিনটি আঞ্চলিক ভাষায় মধ্যযুগে তার রূপান্তর হয়েছিল ঃ তামিল, বাংলা ও হিন্দী ভাষা।

এদের মধ্যে তামিল ভাষায় রচিত রামায়ণ সব থেকে প্রাচীন। কবি কম্বন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তামিল ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তার জন্যই তাঁর খ্যাতি। বলা বাহুল্য তা তামিল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

বাংলা রামায়ণ রচনা করেন কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর জন্ম ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নয়, তা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। রামায়ণ-পাঠ ও রামায়ণশ্রবণ শত শত বৎসর ধরে বাঙালীকে মহৎ সাহিত্যের আস্বাদ দিয়ে চিত্তবিনোদন করে এসেছে।

মনে হয় তুলসীদাস রচিত হিন্দীরামায়ণের ভূমিকা আরও গৌরবময়। তুলসীদাসের জন্ম তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে; তবে বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁর জন্মতারিখ ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং তিনটি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত রামায়ণের মধ্যে তা সর্বাপেক্ষা নবীন। তাঁর রামায়ণের নাম 'রামচরিত মানস'। তা হিন্দী সাহিত্যের আদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সুতরাং একরকম বলা যায় তাকে ভিত্তি করেই হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এ বিষয় তার ভূমিকার সহিত ডান্টে রচিত 'ডিভাইন কমিডি' কাব্যের ইতালীয় সাহিত্যকে গড়ার ভূমিকার তুলনা চলে।

রামায়ণ কাহিনী লোকসংস্কৃতিকে চিরকাল পুষ্ট করে এসেছে।

রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীকে অবলম্বন করে পুতুলনাচ ও নৃত্য অভিনয় গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের প্রধান অবলম্বন। এই প্রসঙ্গে পুরুলিয়া অঞ্চলে বিকশিত ছৌ-নৃত্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তা লোকসংস্কৃতির একটি মূল্যবান সম্পদ। তাতে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনীর মুখোস পরে নৃত্যরূপ দেওয়া হয়। সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গীত থাকে। আমার ধারণা উদয়শঙ্কর উদ্ভাবিত রামায়ণ কাহিনীর মুখোসধারী শিল্পীর ছায়ানৃত্য ছৌ-নৃত্যের অনুসরণ করেছে।

রামায়ণের সবথেকে বড় কীর্তি হল তার সুনীতি প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা। দুই আদিকাব্যের মধ্যে যে চরিত্রটি সব থেকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তা রামের চরিত্র। রামের একটি বিশেষ জীবনদর্শন ছিল। তা গড়ে উঠেছিল মৌলিক একটি নীতি অবলম্বন করে। তাঁর আচরণে সেই নীতিই প্রতিফলিত। তিনি 'সত্য' শব্দটির যে ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তার সন্ধান মিলবে।

সাধারণত সত্যকে আমরা মিথ্যার বিপরীত বলে বুঝি ; অর্থাৎ তার প্রয়োগ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। রাম সত্যকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সত্য অর্থে শুধু জ্ঞান আহরণ করা নয়, তার নীতির ক্ষেত্রে ও প্রয়োগ আছে। সত্যভাষণ এবং সত্যপালন ও সূচিত করে। শুধু তাই নয়, সত্য অর্থে বুঝতে হবে এমন নীতিসম্মত কর্মসম্পাদন যা সর্বজনীন কল্যাণসাধন করে। তিনি তাই বলেছিলেন ঃ

সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বানি সত্যান্নাস্তি পরং পদমা। (১)

অর্থাৎ, সত্যই সংসারের মূল আশ্রয় ; ধর্ম সত্যে আশ্রিত ; সকল কল্যাণের মূল সত্য ; সত্য হতে মহত্তর সম্পদ কিছু নাই।

অযোধ্যাকাণ্ড। ১০৯। ১৩

রামের এই ব্যাখ্যার সারমর্ম পাওয়া যাবে মহাভারতে মার্কণ্ডেয় ঋষি সত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে। তিনি বলেছেন: 'যদ্ ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা' (২) অর্থাৎ, যা ঐকান্তিকভাবে জীবের কল্যাণসাধন করে তাই সত্য। রাম এবং তাঁর পার্শ্বচরিত্রগুলির বচনে এবং আচরণে সত্যের এই রূপ প্রকটিত হয়েছে বলে, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে নীতিজ্ঞান বিকশিত করতে সাহায্য করে। এইভাবে রামায়ণ পুরুষানুক্রমে আমাদের দেশে এক সফল এবং সার্থক ভূমিকা পালন করে এসেছে।

তাই দেখি আমাদের দেশের কথক সম্প্রদায় রামায়ণের কাহিনীকে এমন সাফল্যের সহিত ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। যেকালে না ছিল সংবাদপত্র, না আকাশবাণী, না দূরদর্শন, সেকালে তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত রামায়ণ কাহিনীকে অবলম্বন করে কথকতার সাহায্যে যুগপৎ সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদন এবং সমাজশিক্ষার সহজ ও সুলভ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁদের গল্প বলার, আবৃত্তি করার এবং গান করার সমান দক্ষতা তাঁদের শিল্পকে একটি মহৎ এবং সার্থক জনসংযোগের উপায় হিসাবে গড়ে তুলেছিল। দুঃখের বিষয় এমন সুন্দর শিল্পটি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে একরকম মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে।

২। মহাভারত। বনপর্ব। ২০৮।৪